আএলিতা

আলেক্সেই তলস্তয়

আলেক্সেই তলস্তয়
আএলিতা

সোভিয়েত সাহিত্যের গ্রন্থমালা

আলেক্সেই তলস্তয়

আএলিতা

বিদেশী ভাষায়
সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

АЭЛИТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

সূচী

বিচিত্র বিজ্ঞপ্তি

ক্রাস্নিয়ে জরি স্ট্রীটে বিচিত্র একটা বিজ্ঞপ্তি দেখা দিল। ছাইরঙা কাগজের টুকরোয় লেখা, একটা পোড়ো দালানের চূর্ণ বালি-খসা দেয়ালে পেরেক দিয়ে মারা। দালানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে আমেরিকান সাংবাদিক আর্চিবল্ড স্কাইল্স্-এর নজরে পড়ল একটি তরুণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞপ্তিটি পড়ছে ঠোঁট নেড়ে। পায়ে জুতো নেই মেয়েটির, পরনে ছাপা সুতীর ছিমছাম ফ্রক। ক্লান্ত মধুর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন নেই, নীল,

উদাসীন চোখে পাগলামির স্বল্প আভাস। এক গাছা কোঁকড়া চুল কানের পেছনে ঠেলে দিয়ে সবজির ঝুড়িটা তুলে রাস্তা পার হল মেয়েটি।

আরো মন দিয়ে দেখার মতো বটে বিজ্ঞপ্তিটি। কৌতূহল হওয়াতে স্কাইল্‌স্‌ পড়ল। আরো কাছে সরে গিয়ে চোখ রগড়াল একবার, আবার পড়ল।

'Twenty-three,' অবশেষে বেরোল তার মুখ থেকে। 'এই মেরেছে' — বলতে গেলে এ শব্দটি ব্যবহার করা তার মুদ্রাদোষ।

বিজ্ঞপ্তিতে লেখা:

'১৮ই অগস্ট যাঁরা মঙ্গলগ্রহে যেতে ইচ্ছুক তাঁরা অনুগ্রহ করে যেন ইঞ্জিনিয়ার ম. স. লসের সঙ্গে ছটা থেকে আটটার মধ্যে দেখা করেন। ঠিকানা: ১১ নং, জ্‌দানভ্‌স্কায়া বাঁধ।'

অবলীলাক্রমে লেখা, যে পেন্সিলের লেখা মোছে না সেই সাধারণ পেন্সিলে।

নিজের নাড়ী টিপে দেখল স্কাইল্‌স্‌। স্বাভাবিক। ঘড়ি দেখল। চারটে বেজে দশ। দিনটা ১৯২... র ১৭ই অগস্ট।

এ পাগল সহরে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল স্কাইল্‌স্‌। কিন্তু চূণ বালি-খসা দেয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা এই বিজ্ঞপ্তিটি, এটা দেখবে বলে আশা করেনি। দেখে হতভম্ব লাগল।

হুহু করে হাওয়া দিয়েছে ফাঁকা রাস্তায়। মনে হয় তক্তা-বসানো অথবা ভাঙা জানলাওয়ালা বড়ো বাড়িগুলোতে কেউ

নেই। কারোর চেহারা দেখা যায় না জানলা দিয়ে। রাস্তার ওপারে সেই কমবয়সী মেয়েটি ঝুড়ি নামিয়ে তাকিয়ে রইল স্কাইল্‌স্‌-এর দিকে। মধুর প্রশান্ত মুখে তার ক্লান্তির ছাপ।

ঠোঁট কামড়াল স্কাইল্‌স্‌। পুরনো একটা খাম বের করে ক্লাসের ঠিকানা টুকে নিল। সে লিখছে, একটি লম্বা, চওড়া কাঁধওয়ালা লোক এসে দাঁড়াল বিজ্ঞপ্তিটির সামনে। পোষাক দেখে মনে হয় সৈনিক, কোমরবন্ধহীন টিউনিক, পায়ে পট্টি। মাথায় টুপি নেই, হাতদুটো আলস্যভাবে পকেটে গোঁজা। পড়তে পড়তে শক্ত ঘাড়টা তার টান হয়ে গেল।

'বাহাদুর বটে, মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবার মতলব!' স্কাইল্‌স্‌-এর দিকে রোদে তামাটে প্রসন্ন মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, তারিফ না করে সে পারছে না। কপালে কাটার দাগ। ধূসর-বাদামি চোখে ফুটকি, সেই খালি-পা মেয়েটির যেমন। (অনেক দিন আগে রুশী চোখে এ ধরনের বিচিত্র ফুটকি স্কাইল্‌স্‌ লক্ষ্য করে। একবার একটি প্রবন্ধে সে এটার উল্লেখ পর্যন্ত করে: '... এদের চোখে কোনো স্থিরতা নেই, কখনো বিদ্রূপের আভাস, কখনো উগ্র সংকল্পের ছাপ, আর সবশেষে, শ্রেষ্ঠতাবোধের সেই হেঁয়ালি ভাব — যেটা দেখে ইউরোপীয়রা অত্যন্ত মর্মাহত বোধ করে।')

'বেজায় সখ হচ্ছে ওর সঙ্গে উড়ি, ব্যাপারটা এমন সহজ,' প্রসন্ন হাসি হেসে স্কাইল্‌স্‌-কে তাড়াতাড়ি আপাদমস্তক দেখে নিয়ে লোকটি বলল।

হঠাৎ চোখ কোঁচকাল সে। উবে গেল মুখের হাসি। নজরে পড়েছে মেয়েটিকে, রাস্তার ওপারে ঝুড়ির পাশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চিবুক নেড়ে বলল তাকে:

'কী করা হচ্ছে ওখানে, মাশা?' (মেয়েটির চোখ পিটপিট করতে লাগল ঘন ঘন।) 'বাড়ি চলে যাও।' (ধুলোভরা ছোট পা সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নামাল মেয়েটি।) 'বলছি যাও, আমি এখ্খুনি আসছি।'

ঝুড়ি তুলে নিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

'আমি সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দিয়েছি, বুঝলেন কিনা— জখম হয়েছিলাম, শেল-শক্। বিজ্ঞপ্তি পড়ে সময় কাটাই, ভীষণ একঘেয়ে লাগে,' সৈনিকটি বলল।

'আপনি কি ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন?' স্কাইল্স্ জিজ্ঞেস করল।

'আলবৎ।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আজগুবি নয়? শূন্য পথে পাঁচ কোটি কিলোমিটার যাওয়া ...'

'তা বটে। বেশ দূর।'

'লোকটা হয় ধাপ্পাবাজ নয় বদ্ধ পাগল।'

'সবকিছুই হতে পারে।'

সৈনিকটিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এবার চোখ কোঁচকাল স্কাইল্স্। ঠিক তাই, সেই বিদ্রূপের ছাপ, শ্রেষ্ঠত্বাবোধের সেই হেঁয়ালি ভাব। রেগে লাল হয়ে উঠে সে হন হন করে

চলল নেভা নদীর দিকে। বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গেল, লম্বা লম্বা পা ফেলে। পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পকেটে হাত চালিয়ে দিল, পাকা পাইপখোর আর করিৎকর্মা লোক, পকেটে তামাক থাকত। বুড়ো আঙুলের একটিমাত্র ঠেসায় পাইপে তামাক ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে পা ছড়িয়ে দিল।

মাথার ওপর ভরাট লাইম গাছের দীর্ঘশ্বাস। গরম, স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া। বালির স্তূপের ওপরে একটিমাত্র ছোট ছেলে বসে আছে। পরনে নোংরা ছোপছোপ সার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। দেখে মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে। থেকে থেকে শণরঙা নরম চুল হাওয়ায় ফুরফুর করছে। হাতের দড়িতে একটা উষ্ক-খুষ্ক পালকওয়ালা বুড়ো কাকের ঠ্যাং বাঁধা। কাকের মুখের ভাবটা বেজার ও বিরক্ত; ছেলেটির মতো সেও কটমট করে তাকাল স্কাইল্‌স্‌-এর দিকে।

হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য, শরীরটা আনচান করে উঠল স্কাইল্‌স্‌-এর। মাথা ঘুরতে লাগল। স্বপ্ন দেখছে না কি? এই ছোট ছেলেটি, এই কাক, এই সব শূন্য বাড়ি, ফাঁকা রাস্তা, লোকেদের অদ্ভুত চাউনি আর মঙ্গলগ্রহে যাত্রার আহ্বান জানানো সেই পেরেক দিয়ে আঁটা ছোট বিজ্ঞপ্তিটি — সব কি স্বপ্ন শুধু?

কড়া তামাকে বেশ লম্বা একটা টান দিয়ে স্কাইল্‌স্‌ পেত্রগ্রাদের মানচিত্রের ভাঁজ খুলে পাইপের বাঁট বুলিয়ে জ্‌দানভ্‌স্কায়া বাঁধের রাস্তাটা দেখে নিল।

ইঞ্জিনিয়ার লসের কামারশালা

একটা উঠোনে এসে পড়েছে স্কাইল্‌স্‌। চারিদিকে মরচে-ধরা লোহালক্কড় আর সিমেণ্টের ফাঁকা পিপে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তারের তালগোল পাকানো কুণ্ডলী, ভাঙা কলকব্জা, তার মধ্যে আবর্জনার স্তূপের ওপর ঘাসের রুগ্ন শীষ গজিয়েছে। উঠোনের একেবারে কোণে একটা উঁচু চালাঘরের ধূলোভরা জানলায় সূর্যাস্তের আলো প্রতিফলিত। ছোট দরজাটা একটু খোলা, দোরগোড়ায় বসে বালতিতে লাল সীসে ঘোঁট পাকাচ্ছে একটি মিস্ত্রি। ইঞ্জিনিয়ার লস কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করাতে মাথা ঝাঁকিয়ে চালাঘরের দিকে দেখিয়ে দিল। ভেতরে ঢুকল স্কাইল্‌স্‌।

চালাঘরে আলো কম। মোচার মতো টিনের ঢাকনা দেওয়া ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ টেবিলের ওপরে ঝোলানো। টেবিলে যন্ত্রপাতির নকসা আর বই-এর ছড়াছড়ি। চালাঘরের বেশ ভিতরে একটা ভারা ছাদ পর্যন্ত উঠেছে। গনগনে হাপরে হাওয়া দিচ্ছে একটি মিস্ত্রী। ভারার মধ্য দিয়ে স্কাইল্‌স্‌ দেখল গজাল-আঁটা চকচকে একটা গোলক। খোলা ফটকের বাইরে অস্তরবির রক্ত রেখা আর সমুদ্র থেকে ওঠা মেঘের কুণ্ডলী।

হাপরের মিস্ত্রীটি বলল, 'ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, আপনার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

ভারার পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটি লোক। চওড়া কাঁধ, লম্বায় মাঝারি। ঘন সাদা চুল, কমবয়সীর পরিষ্কার কামানো মুখ। ঠোঁটদুটো বড়ো ও সুন্দর, চোখজোড়া তীক্ষ্ণ, হালকা-কটা, দৃষ্টি নিষ্পলক। গায়ে বাড়িতে তৈরি গলা খোলা দাগধরা সার্ট, তালি দেওয়া পাতলুন গুন-দড়িতে বাঁধা। দাগলাগা একটা নকসা হাতে। স্কাইল্‌স্‌-এর কাছে আসতে আসতে সার্টের বোতাম লাগানোর জন্য গলার কাছটা বৃথায় হাতড়াল একবার।

'বিজ্ঞপ্তিটার জন্য এসেছেন? উড়তে চান না কি?' চাপা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল। ইলেকট্রিক বাল্‌বের নিচে একটা চেয়ারে স্কাইল্‌স্‌-কে বসতে বলে টেবিলের সামনে তার মুখোমুখি বসে নকসাটা রেখে পাইপটা ভরে নিতে লাগল। ইঞ্জিনিয়ার ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ লস স্বয়ং।

চোখ নামিয়ে দেশলাই জ্বালাল। নীচে থেকে আলো পড়ল শক্ত মুখে, ঠোঁটের কাছে তিক্ত দুটি রেখায়, চওড়া নাসারন্ধ্রে, দীর্ঘ কালো চোখের পল্লবে। স্কাইল্‌স্‌-এর ভালো লাগল মুখটা। সে বলল মঙ্গলগ্রহে যাবার কোনো মতলব নেই বটে, কিন্তু ক্রাস্নিয়ে জরি স্ট্রীটে বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে মনে হয়েছে যে, লসের গ্রহযাত্রার মতো অসাধারণ, তাজ্জব পরিকল্পনার কথা পাঠকদের না জানালে নয়।

নিষ্পলক হালকা রঙের চোখে তার দিকে তাকিয়ে সবটা শুনল লস।

'আমার সঙ্গে যাবেন না, দুঃখের কথা। বড়ো দুঃখের কথা!' মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা তুললেই লোকে আমার কাছ থেকে কেটে পড়ে, যেন আমি পাগল। চার দিন পর রওনা হবার ইচ্ছে, অথচ এখনো পর্যন্ত সঙ্গী জুটল না।' আর একবার পাইপ ধরিয়ে রাশিকৃত ধোঁয়া ছাড়ল মুখ থেকে। 'আপনি কী জানতে চান?'

'আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।'

'তাতে কারো আগ্রহ হবার কথা নয়,' লস বলল। 'অসাধারণ কিছু নয় সেটা। খুব কষ্টে স্কুলে পড়েছি, বারো বছর বয়স থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আমার যৌবনকাল, আমার পড়াশুনো, আমার কাজ — এ সবে আপনার পাঠকদের কৌতূহল হবার মতো কিছু নেই, একেবারে কিছু নেই, অবশ্য...' অকস্মাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল লসের, মুখের কাছের রেখা স্পষ্ট দেখা দিল। 'আচ্ছা, বেশ ...' ভারার দিকে পাইপ নেড়ে দেখাল, 'অনেক দিন লেগে আছি এই যন্ত্রটাকে নিয়ে। তৈরি করতে শুরু করি দু'বছর আগে। ব্যস আর কী!'

'এটাতে করে মঙ্গলগ্রহে যেতে ক' মাস লাগবে মনে হয়?' তার পেন্সিলের ডগার দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল স্কাইল্স্।

'ন' দশ ঘণ্টা মনে হয়। তার বেশী নয়।'

'তাই না কি!' স্কাইল্স্-এর মুখ লাল হয়ে উঠল। ঠোঁটের কোণটা কেঁপে উঠল। অতিশয় ভদ্রভাবে বলতে শুরু করল সে.

'যদি আমাকে আরো একটু বিশ্বাস করেন, ইণ্টারভিয়ুটাতে আরো একটু গুরুত্ব দেন তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব।'

টেবিলে কনুইদুটো রেখে ধোঁয়ার মেঘে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলল লস। আবছা ধোঁয়ার মধ্যে চিকচিক করতে লাগল চোখদুটো।

'১৮ই অগস্ট পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ চার কোটি কিলোমিটার দূরে থাকবে। আমাকে ততটা পাড়ি দিতে হবে। কী করে যেতে হবে? প্রথমে কাটাতে হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্তর, সেটা হল ৭৫ কিলোমিটার। তারপর দুটো গ্রহের মাঝখানকার মহাশূন্যের দূরত্ব — চার কোটি কিলোমিটার। তৃতীয়ত, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল — ৬৫ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের এই ১৪০ কিলোমিটার নিয়েই যা ঝামেলা।'

উঠে দাঁড়িয়ে পাতলুনের পকেটে হাতদুটো ঢুকিয়ে দিল লস। মাথাটা রইল ছায়াতে, ধোঁয়ায়। স্কাইল্‌স্‌-এর চোখে পড়ল শুধু ওর খোলা বুক আর জামার আস্তিন গুটোনো লোমশ হাত।

'ওড়া কথাটা সাধারণত প্রয়োগ করা হয় পাখি, পড়ন্ত পাতা বা উড়োজাহাজের বিষয়ে। কিন্তু ওরা ওড়ে না সত্যি সত্যি, ওরা হাওয়ায় ভাসে। একেবারে সঠিক অর্থে ওড়া ব্যাপারটা হল পড়া, কোনো ঠেলে-দেওয়া শক্তিতে চলা। যেমন ধরুন রকেট। মহাশূন্যে কোনো প্রতিরোধ, ওড়ায় বাধা দেবার মতো কোনো কিছু নেই বলে রকেটের বেগ ক্রমশ বেড়ে যায়।

বাধা দেবার মতো চুম্বক শক্তি কিছু না থাকলে খুব সম্ভব আমার বেগ আলোর গতির কাছাকাছি আসবে। যে রীতিতে রকেট চলে আমার যন্ত্রটা সে রীতিতে তৈরি। পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের ১৪০ কিলোমিটার বায়ুমণ্ডল আমাকে ভেদ করতে হবে। মাটি ছাড়া ও অবতরণের সময় ধরলে সবশুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। আরো এক ঘণ্টা যাবে পৃথিবীর টান পেরোতে। সেটা পার হয়ে মহাশূন্যে গিয়ে পড়লে যেমন খুশি বেগে যেতে পারব। শুধু দুটো বিপদের সম্ভাবনা: অতিরিক্ত ত্বরণের ফলে আমার রক্তবাহগুলো ফেটে যেতে পারে, এই, আর একটা হল, যন্ত্রটা হয়ত অত্যন্ত-বেশী বেগে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে গিয়ে ঘা দেবে। আঘাত করবে। বালির সঙ্গে ধাক্কা লাগার মতো ব্যাপার আর কি। তাহলে যন্ত্রটা আর যন্ত্রের মধ্যের সবকিছু গ্যাসে পরিণত হবে। কতো গ্রহের টুকরো, কতো অজাত বা বিনষ্ট জগতের টুকরো গ্রহ-আকাশে মহাবেগে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তারা। বায়ু হল প্রায় দুর্ভেদ্য বর্মের মতো জিনিস, যদিও আমাদের গ্রহে সেটা খুব সম্ভব একবার ছিন্ন হয়েছিল।'

পকেট থেকে হাত বের করে লস টেবিলে আলোর নিচে রেখে মুঠো পাকাল।

'সাইবেরিয়ায় চিরতুষারের মধ্যে ম্যামথদের খুঁড়ে বের করেছিলাম, পৃথিবীর ফাটলে তাদের বিনাশ ঘটে। তাদের দাঁতে দেখেছি ঘাসের টুকরো — তার মানে তারা এককালে চরে

বেড়িয়েছে এমন সব জায়গায় যেগুলো এখন বরফের দেশ। ওদের মাংস খেয়ে দেখেছি। জন্তুগুলো পচে যায়নি — কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা জমে গিয়ে বরফে ঢাকা পড়ে। এটা স্পষ্ট যে ভূমেরু রেখা হঠাৎ সরে যায় একবার। গ্রহ-আকাশ পথের কোনো দেহের সঙ্গে ধাক্কা লাগে পৃথিবীর, কিম্বা হয়ত চাঁদের চেয়ে ছোট দ্বিতীয় কোনো উপগ্রহ আমাদের পরিক্রমণ করত। পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে ধাক্কা খায় সেটা, তাতে ভূমেরু রেখা বিক্ষিপ্ত হয়। হয়ত এই ধাক্কার ফলেই আফ্রিকার পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগরের সেই মহাদেশটি লোপ পায়। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে মহাবেগে পৌঁছলে যন্ত্রটা গলে যাবে, তাই গতিবেগ কমাতে হবে। সেজন্য মহাশূন্য দিয়ে যাত্রার কাল ধরেছি ছ সাত ঘণ্টা। কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে যাত্রা ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে, এই ধরুন মস্কো থেকে নিউ-ইয়র্কে যাবার মতো সহজ।'

টেবিল থেকে সরে গিয়ে লস একটা সুইচ টিপল। ছাদের নিচে হিস হিস করে জ্বলে উঠল আর্কবাতি। স্কাইল্‌স্‌ দেখল কাঠের দেয়ালে যন্ত্রপাতির নকসা, ডায়াগ্রাম আর মানচিত্র; দর্শন ও আলোক এবং পরিমাপক যন্ত্রে ঠাসা তাক; মহাকাশযাত্রীর পোষাক, টিনের খাবারের গাদা, ফারের সাজ; কোণে মঞ্চের ওপর একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

ডিমের মতো দেখতে ধাতব জিনিসটা ঘিরে ভারাটা তৈরি, তার কাছে গেল লস ও স্কাইল্‌স্‌। স্কাইল্‌স্‌-এর হিসেবে

জিনিসটা মোটের ওপর সাড়ে ৮ মিটার উঁচু আর ব্যাসে ৬ মিটার। মাঝখান ঘিরে ইস্পাতের একটা চেপটা বেড় গিয়ে নিচের দিকে উদগত হয়ে আছে ছাতার মতো। এটা হল বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যাবার সময় যন্ত্রের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াবার পারাসুট ব্রেক। পারাসুটের নিচে তিনটে ছোট দরজা। ডিমের মতো দেখতে যন্ত্রটার নিম্নাংশ শেষ হয়েছে সরু গলায়, যেটাকে জড়িয়ে পাকিয়ে উঠেছে ভারি ইস্পাতের ডবল পেঁচের পাত। এটা হল নামার সময়কার ধাক্কা সামলাবার ফিকির।

গজাল দেওয়া খোলে পেন্সিলের টোকা দিতে দিতে লস তার গ্রহজাহাজের বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল। নমনীয় রিফ্রাকটরি ইস্পাতে তৈরি ভেতরে হালকা কাঠামো ও শলা থাকার ফলে শক্তি বেড়েছে। এটা হল বাইরের আবরণের কথা। ভেতরে রবার, ফেল্ট ও চামড়ার ছটা স্তর দিয়ে আর একটা আবরণ, তাতে আছে পর্যবেক্ষণের যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস, যেমন অক্সিজেনের ট্যাংক, আঙ্গারিক এ্যাসিড শোষক, আর যন্ত্রপাতি ও খাবার ইত্যাদি রাখার এমন আধার যা ধাক্কা সামলাতে পারে। বাইরের আবরণ থেকে বেরিয়ে আছে ঘুলঘুলি, সেগুলো ছোট ছোট ধাতুর টিউব আর ত্রিশির কাঁচের কলমে তৈরি।

চালন যন্ত্রের অবস্থান পাক-খাওয়া সেই সরু গলাটায়, যার ইস্পাত এ্যাসট্রনমিকাল ব্রোঞ্জের চেয়ে কঠিন।

লম্বালম্বিভাবে সেখানে নালী বসানো, মুখের দিকটায় চওড়া হয়ে পড়েছে বিস্ফোরণ ঘরে। প্রত্যেকটা বিস্ফোরণ ঘরে স্পার্ক প্লাগ আর ফিডার। মোটর-গাড়ির জন্য যেমন গ্যাসোলিন দরকার ঠিক তেমন আলট্রালিড্ডাইট সরবরাহ করা হয়েছে বিস্ফোরণ ঘরগুলিতে। সূক্ষ্ম এই গুঁড়োর বিস্ফোরণী ক্ষমতা অসাধারণ। জিনিসটা আবিষ্কৃত হয় পেত্রগ্রাদের একটা কারখানায়, লোকের জানা যে কোনো বিস্ফোরকের চেয়ে এর শক্তি বেশী। বিস্ফোরণের ফলে যে জেটের সৃষ্টি হয় তার আকার মোচার মতো, পাদদেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ। গলার লম্বালম্বি নালীর অংকের সঙ্গে যাতে জেটের অংকের সাযুজ্য থাকে তার জন্য বিস্ফোরণ ঘরে আলট্রালিড্ডাইট যায় একটি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে।

চালন যন্ত্রের মূল কথা হল এই। জিনিসটা রকেট। এর আলট্রালিড্ডাইট-এর খোরাক চলবে এক শ' ঘণ্টা। প্রতিমুহূর্তে বিস্ফোরণের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে যন্ত্রের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নিম্নাংশ ওপরের চেয়ে অনেক ভারি হওয়াতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দিকে গলা বাড়িয়ে ঘুরবে এটা।

'আপনার এই জিনিসটার জন্য টাকা পয়সা কে দিয়েছে?' স্কাইল্‌স্‌ জিজ্ঞেস করল।

লস অবাক হয়ে বলল, 'কেন, সরকার ...'

দুজনে টেবিলে ফিরে গেল। মুহূর্তখানেক চুপচাপ থেকে স্কাইল্‌স্‌ জিজ্ঞেস করল দ্বিধাভরে:

'মঙ্গলগ্রহে কোনো প্রাণীর হদিস পাবেন বলে মনে করেন?'

'সেটা শুক্রবার সকালে, ১৯ শে অগস্ট, জানতে পারব।'

'আপনি যাত্রার যে রোজনামচা রাখবেন তার লাইন পিছু দশ ডলার দিতে রাজী। ছটা প্রবন্ধ, প্রত্যেকটা দু'শ' লাইনের, অগ্রিম টাকা এখনি নিতে পারেন। চেকটা স্টকহোলমে ভাঙ্গানো যাবে। কী বলেন?'

হেসে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল লস। টেবিলের কিনারায় বসে চেকটা লিখতে লাগল স্কাইল্‌স্‌।

'আমার সঙ্গে আসছেন না, আফশোষের কথা। যাত্রাটা অল্পক্ষণের, সত্যি বলছি। বাস্তবিক, এখান থেকে স্টকহোলমে জোরে হেঁটে যেতে যতটা লাগে তার চেয়ে কম,' পাইপে টান দিতে দিতে বলল লস।

সহযাত্রী

ফটকের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লস। পাইপটা নিভে গেছে।

ফটক পেরিয়ে জ্‌দানভ্‌কার তীর পর্যন্ত ফাঁকা জমির টুকরো। নদীর ওপারে পেত্রভস্কি দ্বীপে গাছের আবছায়া মূর্তিগুলোয় সূর্যাস্তের বিষণ্ণ আলো। সূর্যাস্তের সোনা লাগা মেঘের ফালি সবুজ আকাশে দ্বীপের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

কয়েকটা মিটমিটে তারা দেখা দিয়েছে। পুরনো পৃথিবীর বুকে সবকিছু নিঝুম।

লাল সীসে যে মেশাচ্ছিল সেই কুজ্‌মিন মিস্ত্রী ধীরেসুস্থে এল ফটকের কাছে। অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো।

'দুনিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়,' মৃদু স্বরে বলল। 'ঘর ছাড়তেই কতো কষ্ট হয়। ইস্টিশানে যাবার সময় বারবার ফিরে ফিরে তাকায় লোকে। ঘরটা হয়ত খড়ে ছাওয়া, কিন্তু তাতে কী, আমারি তো সেটা, নিজের ঘরের মতো আর কী আছে। আর যদি দুনিয়া ছাড়ার কথা বলেন...'

'কেটলি টগবগাচ্ছে রে,' খখ্‌লভ মিস্ত্রী বলে উঠল। 'আয় কুজ্‌মিন, চা খেয়ে যা।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কুজ্‌মিন। 'হ্যাঁ, কহনের আর কী আছে,' বলে ফিরে গেল হাপরে। গোমড়ামুখ খখ্‌লভ আর কুজ্‌মিন দুটো ঝোড়ার ওপর বসে সন্তর্পণে রুটি ভেঙে রোদে-দেওয়া মাছের কাঁটা বেছে ধীরেসুস্থে চিবোতে লাগল। দাড়ি নেড়ে নিচু গলায় বলল কুজ্‌মিন:

'বুড়োর জন্য দুঃখু হয়। ওর মতো আদমী দুনিয়ায় কটা আছে।'

'আরে, ও এখুনি মরে গেছে নাকি?'

'একজন উড়োজাহাজ চালিয়ে আমাকে বলেছিল যে আট ভার্স্ট ওপরে উঠে—তাও গরমি কালে, বুঝলি কিনা—

পেট্রোল জমে যায়। আরো উঁচুতে কী কাণ্ড ভাবতে পারিস? নিশ্চয় বরফের মতো ঠাণ্ডা আর ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

'আমি বলছি কী, মড়াকান্না থামা,' বেজার মুখে বলল খখ্লভ।

'ওর সঙ্গে যেতে চায় না কেউ। কেউ ওর কথায় বিশ্বাস করে না। নোটিসটা এক হপ্তার বেশী দেয়ালে মিছিমিছি লটকানো রয়েছে।'

'আমি তো বিশ্বাস করি।'

'তোর মনে হয় ও পেঁছিতে পারবে?'

'পারবে। তখন সবাই চোখ রগড়াবে, হুঁশ হবে ইউরোপের।'

'কে চোখ রগড়াবে?'

'ওরা আর কি, কে আবার, তখন মুখ বেজার—মঙ্গলগ্রহ কার?—সোভিয়েতের।'

'তা সত্যি, বেশ হবে সেটা।' কুজ্মিন ঝোড়ার ওপর বসার জায়গা করে দিল লসকে। ইঞ্জিনিয়ার বসে ধূমায়িত চায়ের মগ একটা তুলে নিল। মগটা টিনের।

'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে যেতে রাজী নও, খখ্লভ?'

'না, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ,' খখ্লভ বলল। 'ডর লাগে।'

মৃদু হেসে লস চায়ে এক চুমুক দিয়ে কুজ্মিনের দিকে ফিরল।

'আর তুমি, দোস্ত?'

'ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, খুশিতে যেতাম, কিন্তু বউটা অসুস্থ, তাছাড়া কাচ্চাবাচ্চা আছে তো। ওদের ছেড়ে কী করে যাই বলুন?'

'মনে হচ্ছে একলা পাড়ি দিতে হবে শেষমেষ,' খালি মগটা নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল লস। 'দুনিয়া ছাড়বার ইচ্ছা খুব কম লোকের,' একটু হেসে মাথা নাড়ল সে। 'কাল একটি মেয়ে এসেছিল এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে। এসে বলল, "আপনার সঙ্গে যাব। আমার বয়স ঊনিশ, নাচতে গাইতে পারি, গিটার বাজাতে পারি, পৃথিবীতে থাকার সাধ নেই, বিপ্লবটিপ্লবে ঘেন্না ধরে গেছে। বাইরে যাবার ছাড়পত্র কি লাগবে?" অল্পক্ষণ আলোচনার পর বসে পড়ে কান্না শুরু হল তার। কেঁদে বলল, "আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন, ভেবেছিলাম জায়গাটা আরো অনেক কাছে।" হ্যাঁ, তারপর একটি তরুণ এসে হাজির। বাজখাঁই গলা, হাতদুটো চটচটে। "আমাকে গর্দভ ভেবেছেন নাকি?" মোটা গলায় বলল। "মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। কী সাহসে এ ধরনের নোটিস্ লটকান?" অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করলাম।'

হাঁটুতে কনুই রেখে জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে রইল লস। সে মুহূর্তে ওর মুখ দেখে মনে হল ক্লান্ত, কেমন যেন বসে গেছে। অনেক ধকলের পর যেন জিরিয়ে নিচ্ছে।

তামাক আনতে গেল কুজ্‌মিন। গলা খাঁকারি দিয়ে খখ্‌লভ বলল :

'ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, আপনার একটুও ভয় লাগছে না?'

গনগনে কয়লায় উত্তপ্ত চোখ তার দিকে ফেরাল লস।

'না, লাগছে না। পারব বলে আমার বিশ্বাস। আর যদি না পারি, তাহলে সব এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে যে কষ্ট পাবার সময় থাকবে না। অস্বস্তি লাগছে অন্য জিনিসে। ধরো, যদি হিসেবের ভুল হয়, যদি মঙ্গলগ্রহের মহাকর্ষের মধ্যে গিয়ে না পড়ি। সঙ্গে অবশ্য পেট্রোল, অক্সিজেন ও খাবারের রসদ থাকবে অনেক দিন। আর অন্ধকারে চলবে আমার যাত্রা, সামনে জ্বলতে থাকবে একটা তারা। হাজার বছর পরে আমার জমাট দেহ তার অগ্নি সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। মহাশূন্যে আমার মৃতদেহ হাজার বছর ধরে চলেছে তো চলেছে, কথাটা ভেব দেখ একবার! কিন্তু বেঁচে যতদিন থাকব ততদিন দীর্ঘ যন্ত্রণা, যন্ত্রটার মধ্যে কতদিন তো বেঁচে থাকব — মহাশূন্যে একেবারে একা! মৃত্যুকে ডরাই না, ডরাই শুধু সেই অনন্ত অন্ধকারের নিঃসঙ্গতা, আশাহীন নিঃসঙ্গতা। অবস্থাটা ভয়াবহ। একা যেতে তাই আমার এত অনিচ্ছে।'

চোখ কুঁচকে চুল্লির কয়লার দিকে তাকিয়ে রইল লস, মুখটা চাপা।

দোরগোড়ায় দেখা গেল কুজ্‌মিনকে, মৃদু কণ্ঠে ডেকে বলল:

'আপনার কাছে কে একজন এসেছেন।'

'কে?' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল লস।

'লাল ফৌজের একটি লোক আপনার কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

কুজ্‌মিনের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল সেই বেল্টবিহীন টিউনিক পরিহিত লোকটি যে ক্রাস্নিয়ে জরি স্ট্রীটে নোটিস পড়ছিল। মাথা নেড়ে লসকে অভিবাদন জানিয়ে তাকাল চারাটার দিকে, টেবিলের কাছে এল।

'পথের সঙ্গী চান?'

লোকটির দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে সামনে বসল লস।

'হ্যাঁ, পথের সঙ্গী দরকার। মঙ্গলগ্রহে যাচ্ছি কিনা।'

'জানি, নোটিসটা দেখেছি। একজনকে দিয়ে গ্রহটি দেখে নিয়েছি। অনেক দূর, সন্দেহ নেই। কী সর্ত আপনার— মাইনে, খাইখরচ?'

'আপনার পরিবার আছে?'

'আমি বিবাহিত, কিন্তু ছেলেপুলে নেই।'

আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা মারতে মারতে লোকটি চালাঘরটি খুঁটিয়ে দেখে নিল সকৌতূহলে। আকাশযাত্রার কথা সংক্ষেপে সেরে লস ঝুঁকির কথা বলল। স্ত্রীর খরচা

দেখায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানাল যে তার মাইনে অগ্রিম দেবে, টাকা এবং খোরাকি। অন্যমনস্কভাবে শুনে মাথা নাড়ল লাল ফৌজের লোকটি।

'ওখানে কার সাক্ষাৎ মিলবে জানেন না কি? মানুষের না ভয়ানক জীবজন্তুর?' জিজ্ঞেস করল।

মাথার পেছন দিকটা জোরে চুলকে নিয়ে হেসে উঠল লস।

'মনে তো হয় মানুষ আছে, অনেকটা আমাদেরি মতো। গিয়ে দেখা যাবে। ব্যাপারটা কী জানেন—কয়েক বছর ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বেতার কেন্দ্রে এমন সব সিগন্যাল ধরা পড়ছে যার মানে বোঝা অসম্ভব। গোড়াতে লোকে ভেবেছিল ওগুলো চুম্বক ঝড়ের ফল। কিন্তু দেখা গেল বর্ণলিপির সিগন্যালের সঙ্গে ওদের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। কারা যেন বার বার চাইছে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। কোথা থেকে? এখন পর্যন্ত যা জানা, তাতে মঙ্গল ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী নেই। সিগন্যাল আসতে পারে কেবল মঙ্গলগ্রহ থেকে। ম্যাপটা একবার দেখুন—জায়গাটায় নানা খালের ছড়াছড়ি (দেয়ালে আটকানো মঙ্গলগ্রহের একটি নকসা সে দেখাল)। মনে হয় ওখানে একটা খুব শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র আছে। পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলতে চায় মঙ্গলগ্রহ। এখনো সে সিগন্যালের জবাব আমরা দিতে পারি না। কিন্তু উড়ে যেতে পারি। মঙ্গলগ্রহের বেতার কেন্দ্রগুলো যারা

বানিয়েছে তারা আমাদের মতো জীব নয়, অদ্ভুত কোনো জন্তু, সেটা সম্ভব নয় মোটে। পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ, দুটি ছোট গোলক খুব কাছাকাছি পাক খায়। একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন দুটি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রাণের ধূলিকণা বিক্ষিপ্ত। সে কণা পড়ে পৃথিবীতে, মঙ্গলগ্রহে, শীতে জমাট অগণিত নক্ষত্রে। জীবন দেখা দেয় সব জায়গায়, আর সবখানে সে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মতো জীব। মানুষের চেয়ে নিখুঁত প্রাণী গঠন করা তো অসম্ভব।'

মনস্থির করে লাল ফৌজের লোকটি বলল, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে। জিনিসপত্র কখন নিয়ে আসব?'

'কাল। আপনাকে যন্ত্রপাতি **ভালো করে দেখিয়ে দিতে** হবে। আপনার নাম, পদবী?'

'আলেক্সেই ইভানভিচ গুসেভ।'

'পেশা?'

অন্যমনস্কভাবে লসের দিকে তাকিয়ে গুসেভ চোখ নামাল টেবিলে টোকা দেওয়া নিজের আঙুলের দিকে। বলল:

'স্কুলের পড়া শেষ করেছি। মোটর-গাড়ির বিষয়ে কিছু কিছু জানি। পরিদর্শক হিসেবে বিমানে গিয়েছি। আর আঠারো বছর বয়স থেকে যুদ্ধে ছিলাম। সংক্ষেপে এই হল আমার পেশা। কয়েকবার আহত হয়েছি, এখন রিজার্ভ সৈন্যদলে আছি।' হঠাৎ ব্রহ্মতালু বেশ জোরে একবার ঘষে নিয়ে গুসেভ হেসে উঠল। 'এ সাত বছর যা ধকল সইতে

হয়েছে, সত্যি বলতে, এত দিনে একটা রেজিমেণ্টের ভার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লোকটা আমি অত্যন্ত রগচটা! যুদ্ধ ঢিমিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতাম না, আবার যুদ্ধ শুরু হবার তর সইত না। বলতাম আমাকে কোনো একটা কাজে পাঠানো হোক, কিম্বা সটান কেটে পড়তাম।' (মাথা আবার ঘষে মুখ বেঁকিয়ে হাসল।) চার চারটে প্রজাতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছি—সহরগুলোর নাম মনে নেই এখন। একবার প্রায় তিনশ' লোক জুটিয়েছিলাম ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। ইচ্ছে ছিল সেখানে পেঁছিবার। কিন্তু পাহাড়ে পথ হারিয়ে গেল, ঝড়ের মুখে পড়লাম, পাহাড়ে ধ্বস নামল, ঘোড়াগুলোর দফা রফা। সেখান থেকে আমরা ফিরলাম মাত্র কয়েকজন। তারপর দু মাস কাটালাম মাখ্নোর সাথে—একটু হুল্লোড় করার সাধ হয়েছিল। কিন্তু ডাকাতগুলোর সঙ্গে থাকা ভার — লাল ফৌজে যোগ দিলাম। বুদিওন্নি অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে কিয়েভ থেকে ওয়ারস পর্যন্ত পোলাণ্ডের সৈন্যদের পিছু তাড়া করেছি। পেরেকপ আক্রমণের সময় শেষবার জখম হলাম, শুয়ে থাকতে হল বছরখানেক। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে কী করি ভেবে পেলাম না। তখন দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে, বিয়ে করে ফেললাম। আমার স্ত্রী বেশ লোক, ওর জন্য দুঃখু হয়, কিন্তু বাড়িতে থাকা আমার ধাতে নেই। গ্রামে গিয়ে কী লাভ? মা-বাবা মারা গেছেন, ভাইরা তো হত হয়েছে, জমির

অবস্থা কাহিল। যুদ্ধ টুদ্ধ নেই, হবে বলে মনে হয় না। মুস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, আমাকে সঙ্গে নিন। মঙ্গলগ্রহে আমাকে কাজে লাগবে।'

'বেশ, বেশ, খুব খুশি হলাম,' ওর হাতে হাত মিলিয়ে বলল লস। 'কাল দেখা হবে।'

বিনিদ্র রাত্রি

যাত্রার তোড়জোড় শেষ। কিন্তু পরের দুদিন দুজনের চোখে ঘুম নেই: অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস গ্রহজাহাজের আধারগুলোতে ভরা, যন্ত্রপাতি পরখ করা, ভারাটা খোলা; ছাদের কিছুটা খুলে রাখা হল চালাঘরে।

লস চালন যন্ত্র ও অন্যান্য জরুরী যন্ত্রপাতি চিনিয়ে দিল গুসেভকে। মনে হল সঙ্গীটি বেশ বুদ্ধিমান, সেয়ানা।

ঠিক করা হল পরের দিন সন্ধ্যে ছটার সময় যাত্রা শুরু করা হবে।

অনেক রাত্রে লস গুসেভ ও মিস্ত্রীদের বিদায় দিয়ে টেবিলের ওপরকার বাতিটা ছাড়া আর সব আলো নিভিয়ে জামাকাপড় না ছেড়ে শুয়ে পড়ল লোহার খাটে, কোণের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পেছনে খাটটা।

তারা জ্বলা প্রশান্ত রাত্রি। ঘুম এল না লসের চোখে। মাথার পেছনে হাত মুঠো করে চেয়ে রইল অন্ধকারে। অনেক

দিন জিরোবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এই শেষ রজনীতে লস নিজের হৃদয় খুলে দিল: আসুক কান্না, চলুক নিজেকে ব্যথা দেওয়া।

মনে পড়ল আধো অন্ধকার একটি ঘর। মোমবাতির আলো আড়াল করে রেখেছে একটি বই। ওষুধের গুমোট গন্ধ। বিছানার পাশে কম্বলের ওপর একটা বেসিন। উঠে যতবার সেটা পেরিয়ে যাচ্ছে ততবার নিরানন্দ দেয়ালে অস্পষ্ট ছায়ার সঞ্চরণ। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল লসের! বিছানায় শুয়ে আছে কাতিয়া, তার স্ত্রী, তার জীবনের মণি—ছোট ছোট নিশ্বাস পড়ছে শান্তভাবে। ঘন এলোমেলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে বালিশে, লেপের নিচে হাঁটু দুটি তোলা। তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাতিয়া। শান্ত মুখের ভাব বদলে গেল। মুখটা রক্তিম, অস্থির। লেপের ভেতর থেকে হাত বের করে পাড়ে টান দিচ্ছে। লস বার বার হাতটা ধরে লেপের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

'চোখ খোলো, মণি, তাকাও আমার দিকে।' করুণ সুরে বিড়বিড় করল কাতিয়া, ফিসফিসানির মতো সে কণ্ঠস্বর, 'জান্-জান্-টা'। শিশুর মতো, প্রায় শোনা যায় না এমন করুণ সুরে বলতে চাইছে—'জানলাটা খোলো।' সে কণ্ঠস্বরে কী গভীর মমতা জাগল লসের, ভয়ের চেয়ে ভীষণ সে মমতা। 'কাতিয়া, কাতিয়া, আমার দিকে তাকাও।' চুমু খেল তার গালে, কপালে, নিমীলিত চোখে। ওর গলাটা কেঁপে উঠল, বেড়ে গেল অস্থির বুকের ওঠাপড়া, আঙুল দিয়ে

আঁকড়ে ধরল লেপের পাড়। 'কাতিয়া, কী চাই, কাতিয়া?' কোনো জবাব নেই। ও চলে যাচ্ছে... কনুই-এ ভর দিয়ে উঠল, বুকটা যন্ত্রণায় বেঁকে গেল, কে যেন ধাক্কা দিয়েছে ওকে। মাথা হেলে পড়ল। পড়ে গেল বিছানার মাঝখানটায়। ঝুলে পড়ল চোয়াল। বিচলিত লস ওকে জড়িয়ে জাপটে রইল।

...না, না, না, মৃত্যুকে সে মেনে নেবে না...

খাট থেকে উঠে লস এক প্যাকেট সিগারেট টেবিল থেকে নিয়ে একটা ধরিয়ে অন্ধকার চালাঘরে পায়চারি করতে লাগল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চে উঠে ফেরাল মঙ্গলগ্রহের দিকে। পেত্রগ্রাদের অনেক উঁচুতে তখন মঙ্গলগ্রহ। লস অনেকক্ষণ চেয়ে রইল উজ্জ্বল, দীপ্ত ছোট গোলকটির দিকে। লেন্সে তার ঝিকিমিকি।

...আবার শুয়ে পড়ল লস। মানসপটে দেখা দিল আর একটি ছবি। ঢিবির ওপর ঘাসে বসে আছে কাতিয়া। তরঙ্গিত ক্ষেতের ওদিকে জ্‌ভেনিগরদের সোনালি গম্বুজের ঝিকিমিকি। শস্য ও বাকহুইটের ওপর গ্রীষ্মের উত্তাপে চিল ভেসে চলেছে। বেজায় গরম, আলসে লাগছে কাতিয়ার। পাশে বসে ঘাসের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে তার সোনালি চুল, রোদে তামাটে কাঁধ, আর পোষাকের ফাঁকে সাদা ত্বকের ফালিটা দেখছে লস। কাতিয়ার ধূসর চোখ নিরুদ্বেগ, সুন্দর। সেখানেও ভেসে চলেছে চিল। বয়স তার আঠারো। চুপ করে

বসে আছে সে। লস ভাবল, 'না, প্রিয়ে, এখানে বসে বসে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে জরুরী কাজ আমার আছে। গাঁথা আমি পড়ছি না। তোমাকে দেখতে এ পাড়া আর মারাচ্ছি না।'

হায় ভগবান! কী বোকার মতো সে সব উত্তপ্ত গ্রীষ্মের দিন বৃথায় চলে যেতে দিয়েছে! সময় যদি থমকে দাঁড়াত তখন! না, সময় বয়ে গেছে, ফিরবে না কখনো, কখনো ফিরবে না!..

আবার উঠে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল লস, আবার শুরু হল পায়চারি। কিন্তু দেয়ালের পাশে পিঞ্জরাবদ্ধ জানোয়ারের মতো আসা আর যাওয়া আরো খারাপ।

দরজা খুলে মঙ্গলগ্রহ কোথায় দেখার জন্য আকাশে তাকাল — তখনি উচ্চতম সীমায় পৌঁছেছে গ্রহটি।

'ওখানেও নিজের থেকে রেহাই পাব না, পৃথিবীর সীমারেখা পেরিয়ে, মৃত্যুর ওপারে গিয়েও নয়। প্রেমের বিষ কেন খেয়েছিলাম? অসাড় থাকলে আরো ভালো হত। প্রাণের হিমজমাট বীজ, ইথরে ভাসমান সব স্ফটিক বিন্দু, তারা কি গভীর নিদ্রায় মগ্ন নয়? কিন্তু আমাকে ধরণীতলে পড়তে হল, অঙ্কুরিত হতে হল — জানা যে চাই প্রেমের সেই ভয়ংকর তৃষ্ণার অর্থ কী, অন্যতে বিলীন হওয়ার, নিজেকে হারানোর, নিঃসঙ্গ বীজ হয়ে না থাকার মানেটা কী। আর সবকিছু কীসের জন্য? ভঙ্গুর এই স্বপ্নের পর আবার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি

হওয়া, আবার বিচ্ছেদ, আবার সেই শূন্যে ভাসা হিম কঠিন স্ফটিক।'

অনেকক্ষণ ফটকে দাঁড়িয়ে রইল লস। ঘুমন্ত পেত্রগ্রাদের অনেক ওপরে মঙ্গলগ্রহ ঝলকাচ্ছে, কখনো সিঁদুর-লাল, কখনো নীল। 'বিচিত্র নতুন এক জগৎ,' ভাবল লস, 'হয়ত অনেক দিন বিগতপ্রাণ, হয়ত বা অদ্ভুত পরিপূর্ণ নিখুঁত ... ওখানে একদিন রাত্রে ঠিক এখনকার মতো দাঁড়িয়ে নক্ষত্রের মধ্যে নিজের গ্রহকে দেখব... মনে পড়বে সেই ঢিবিটার কথা, সেই চিলগুলো আর কাতিয়ার কবরের কথা ... তখন দুঃখের ভার কমে যাবে ...'

শেষ রাতে বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল লস। ঘুম ভাঙল বাঁধের ওপর গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজে। গাল ঘষে, ঘুমভরা চোখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেয়ালে ম্যাপ আর গ্রহজাহাজের আকাররেখার দিকে। ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে এবার, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতমুখ ধোবার বেসিনে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে নিল। তারপর কোট চাপিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে গেল নিজের ফ্ল্যাটে। ছ'মাস আগে কাতিয়া মারা যায় এখানে।

এখানে মুখ ধুয়ে দাঁড়ি কামাল, পরিষ্কার আণ্ডারউইয়ার আর অন্য জামাকাপড় পরে জানলাগুলো একবার ভালো করে দেখে নিল। বন্ধ আছে। ফ্ল্যাটে কেউ থাকত না। আসবাবপত্রে ধুলোর স্তর জমেছে। শোবার ঘরের দরজা খুলল, কাতিয়ার

মৃত্যুর পর সেখানে ও আর শোয়নি। পর্দাগুলো টানা, প্রায় অন্ধকার। শুধু কাতিয়ার জামাকাপড়ের আলমারির দরজায় আয়নাটার অস্পষ্ট চিকচিকে আভাস। দরজাটা আধ-খোলা। লস পা টিপে গিয়ে সেটা বন্ধ করল, তারপর শোবার ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজায় চাবি দিল। চাবিটা রাখল কুর্তার পকেটে।

এবার যাওয়া চলে, সব তৈরি।

সেই রাত্রে

সে রাত্রে স্বামীর জন্য অনেকক্ষণ বসে রইল মাশা। প্রাইমাস স্টোভে চায়ের কেটলি গরম করল কয়েকবার। ওক কাঠের উঁচু দরজার বাইরে ভয়াল স্তব্ধতা।

একটি ঘরে থাকত গুসেভ ও মাশা। বাড়িটা এককালে ছিল এলাহি। বিপ্লবের সময় মালিকেরা চলে যায়। তারপর চার বছরে বৃষ্টি ও তুষার ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে বাড়িটার।

বেশ চওড়া ঘর। ছাতে সোনালি কারুকার্য ও মেঘের মধ্যে একটি গোলগাল, হাসিখুশি স্ত্রীলোকের ছবি, চারপাশে ডানাওয়ালা দেবশিশুরা ক্রীড়ারত।

ছাদের দিকে দেখিয়ে প্রায় বলত গুসেভ, 'দেখেছ, মাশা, মেয়েটি কেমন গোলগাল আর হাসিখুশি! ছ ছটা বাচ্চা। মেয়ের মতন মেয়ে বটে!'

সিংহের থাবার মতো পায়াওয়ালা সোনালি কাজ-করা খাটের ওপর একটি ঠোঁট-চাপা বৃদ্ধের ছবি, মাথায় পাউডার দেওয়া পরচুলা, কোটে তারকা-চিহ্ন। গুসেভ তার নাম রেখেছিল 'জেনারেল বুট'। বলত, 'এঁর হাতে রেহাই নেই বাবা, চটিয়েছ কি, লাথি কষাবেন বুট দিয়ে।' ছবিটার দিকে তাকাতে ভয় হত মাশার। লোহার ছোট একটা স্টোভ থেকে ধোঁয়াটে নল গিয়েছে ঘরের মাঝখান দিয়ে, তার ফলে দেয়ালে কালি ঝুলের দাগ। যে সব তাকে ও টেবিলে নিজেদের যৎসামান্য খাবার তৈরি করত মাশা সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

খোদাই-করা ওক কাঠের দরজা খুললে একটি বড়ো ঘর, দু'ধারে জানলার সারি। ভাঙা শার্সিতে তক্তা লাগানো, ছাদে চিড় ধরেছে কয়েকটা জায়গায়। হাওয়ার রাতে ঘরে হাওয়া ঢুকত স্বচ্ছন্দে, মেঝের ওপর তড়বড়িয়ে দৌড়ত ইঁদুর।

টেবিলের পাশে বসেছিল মাশা। প্রাইমাস স্টোভের চড় চড় শব্দ। দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে এল ঘড়ির বিষণ্ন ঘণ্টাধ্বনি। দুটোর ঘণ্টা। গুসেভ তখনো আসেনি।

মাশা ভাবল, 'কী চায় ও? কিসের অভাব ওর? কখনো ওর সন্তোষ নেই, সর্বদা ছটফটে। আলিওশা, আলিওশা লক্ষ্মীটি; একবার যদি চোখ বুজে আমার কোলে মাথা রাখতে! খুঁজে বেড়িয়ে কী লাভ, আমার ভালোবাসার চেয়ে বড়ো কিছু কখনো পাবে না।'

মাশার চোখে জল এসে গেল। আস্তে আস্তে চোখ মুছে করতলে গাল রাখল। মাথার ওপর হুল্লোড়ে দেবশিশুদের সঙ্গে নিয়ে উড়ন্ত সেই স্ত্রীলোকটি, যেন ভেসে চলে যেতে পারছে না। 'ওর মতো হলে ও কখনো আমাকে ছেড়ে যেত না,' মনে হল মাশার।

গুসেভ বলেছিল অনেক দূরে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে মাশা জানত না, ভয় হত জিজ্ঞেস করতে। মাশা জানত এই অদ্ভুত ঘরে, এই স্তব্ধতায়, নিজের আগেকার স্বাধীনতা ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে না গুসেভ। সেটা ওর সহ্যশক্তির বাইরে। রাত্রে নানা দুঃস্বপ্ন সে দেখত—হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে বিড়বিড়িয়ে উঠে বসে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলত, মুখ আর বুক যেত ঘামে ভরে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ত। সকাল উঠে মনমরা, অস্থির ভাব।

গুসেভের সঙ্গে মাশার ব্যবহার মধুর, মায়ের চেয়ে বুদ্ধিমতী সে। সে জন্য ওকে ভালোবাসে গুসেভ, কিন্তু সকাল হলেই আবার পথে বেরিয়ে যাবার জন্য সেই ছটফটানি।

মাশা চাকরী করে। বাড়িতে আনে রেশনের খাবার। মাঝে মাঝে ওদের হাতে কানা-কড়ি পর্যন্ত থাকে না। কয়েকটা কাজ জুটিয়ে নিত বটে গুসেভ, কিন্তু কোনো কাজে বেশী দিন টিকত না। মাঝে মাঝে বলত, 'বুড়োরা বলে চীনে একটা সোনার জমি আছে। এ রকম জমি কিছু নেই অবশ্য, তবু ও

তল্লাটের সব তো আমাদের জানা নেই। চীনে চলে যাব, মাশা, গিয়ে দেখব দেশটা কী রকম।'

ওকে ছেড়ে চলে যাবে গুসেভ, সেই মুহূর্তটিকে মাশা ভয় পায় যমের মতো। গুসেভ ছাড়া পৃথিবীতে ওর কেউ নেই। পোনেরো বছর বয়স থেকে দোকানে কাজ করেছে, আর নেভা নদীর ছোট ছোট স্টীমারে টিকিট বেচার কাজ। নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ সে জীবন।

এক বছর আগে পার্কের বেঞ্চিতে আলাপ হয় গুসেভের সঙ্গে। গুসেভ বলে, 'দেখছি আপনি একলা। একসঙ্গে সময় কাটালে ভালো হয় না? একা থাকা বড়ো বিরস ব্যাপার।' ভালো করে চেয়ে দেখল মাশা—মুখটি বেশ, হাসিখুশি, মমতাভরা চোখ—নেশা করেনি। 'আপত্তি নেই,' শুধু বলল মাশা। রাত্রি আসা না পর্যন্ত পার্কে দুজনে ঘুরে বেড়াল। যুদ্ধ, হামলা, নানা ওলটপালটের কথা বলল গুসেভ, সে রকম কথা বই-এ থাকে না। বাড়ি পর্যন্ত মাশাকে এগিয়ে দিল। সে দিন থেকে তার কাছে আসত। সহজে, শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করল মাশা। তার প্রেমে পড়ে গেল হঠাৎ, ভালোবাসল সমস্ত সত্তা দিয়ে, মনে হল কত না আপন জন। আর তখন থেকে শুরু হল তার মানসিক যন্ত্রণা...

চায়ের কেটলি থেকে জল উপছে পড়ছে। কেটলিটা নামিয়ে আবার প্রহর গোণা শুরু হল তার। কিছুক্ষণ আগে দরজার

ওপারে ফাঁকা হলে একটা চাপা আওয়াজ শুনেছিল সে, কিন্তু এত নিঃসঙ্গ একা লাগছিল যে কান দেয়নি। আবার শোনা গেল শব্দটা, কার যেন পায়ের আওয়াজ।

হাট করে দরজা খুলে হলে তাকাল মাশা। একটা জানলা থেকে আসা বাতির আলোয় অস্পষ্ট চোখে পড়ে কয়েকটা নিচু থাম। থামের মাঝখানে দেখল একটি পাকাচুল বৃদ্ধ। মাথায় টুপি নেই, গায়ে লম্বা ঝুল কোট। ভুরু কুঁচকে গলা বাড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মাশার হাঁটুদুটো থর থর করে কেঁপে উঠল।

অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী চাই আপনার?'

গলা বাড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ। শাসানোর ভঙ্গিতে একটা আঙুল হেলাল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল মাশা, বুকে হাতুড়ির ঘা। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ফিরে-যাওয়া বৃদ্ধের পায়ের আওয়াজ। মনে হল সামনের সিঁড়ি হয়ে সে চলে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির অন্যদিক থেকে কানে এল স্বামীর দ্রুত বলিষ্ঠ পদধ্বনি। হাসিখুশি মুখে, গায়ে ঝুলকালির দাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল গুসেভ।

কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'হাতমুখ ধুতে দাও তো। কাল চলে যাচ্ছি। কেটলিটা গরম আছে? চমৎকার!' মুখ, পেশল ঘাড় ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল স্ত্রীর দিকে।

'অধীর হয়ো না, কিসস্যু হবে না আমার, ফিরে আসব। সাত বছর গোলাগুলির মধ্যে স্বশরীরে কাটিয়েছি, কিছু হয়নি। মরার সময় এখনো আসেনি। অস্থির হয়ো না। আর মরতেই যদি হয়, কপালের লেখা খণ্ডাবে কে। তাহলে তো মশার কামড়ে পটল তুলব।'

টেবিলে বসে সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়িয়ে দু' টুকরো করে নুনে ডুবিয়ে নিল গুসেভ।

'কালকে কিছু পরিষ্কার জামাকাপড় চাই—দুটো সার্ট, দু'সেট্ আণ্ডারউইয়ার আর পায়ের পট্টি। সাবানের কথা ভুলো না। আর ছুঁচ সুতো। আবার কাঁদছিলে বুঝি?'

মুখ ফিরিয়ে মাশা বলল, 'ভয় পেয়েছিলাম। বাড়িতে একটা বুড়ো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আঙুল তুলে আমাকে শাসাল। আলিওশা, তুমি যেও না।'

'কে একটা বুড়ো আঙুল তুলে ভয় দেখাচ্ছিল বলে যাব না?'

'ওটা অলক্ষণ।'

'যেতে হবে, বড়ো খারাপ। নইলে বুড়োর সঙ্গে একটা মোকাবিলা করে নিতাম। হয়ত এখানে যারা থাকত তাদের একজন, রাত্রে ফিসফিস করে ঘুড়ে বেড়ায়, আমাদের ভূত ভাগাবার চেষ্টা করে।'

'আলিওশা, তুমি ফিরে আসবে তো আমার কাছে?'

'বলেছি তো ফিরব। নিশ্চয় ফিরব। ছি, অস্থির হয়ো না।'

'অনেক দূর যাচ্ছ?'

শিস দিয়ে গুসেভ ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল। প্লেটে গরম চা ঢালার সময় চোখদুটো নেচে উঠল।

'মেঘের ওপারে, মাশা, এই ছুঁড়িটার মতো উড়ে যাব।'

মাশা মুখ নিচু করল শুধু। হাই তুলে গুসেভ কাপড়চোপড় ছাড়তে লাগল। নিঃশব্দে প্লেটডিশ সাফ করে মোজা রিপু করতে বসল মাশা। চোখ তুলে আর চাইল না। জামাকাপড় ছেড়ে যখন মাশা শুতে গেল বিছানায় গুসেভ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, হাতদুটো বুকে রেখে, শান্তভাবে চোখের পাতা বন্ধ করে। পাশে শুয়ে তার দিকে চেয়ে রইল মাশা। গাল বেয়ে জলের ধারা নামল: কত না প্রিয় গুসেভ তার কাছে, ওর অশান্ত হৃদয়ের জন্য তার কী ব্যাকুলতা। কোথায় যাচ্ছে, কীসের সন্ধানে?

ভোরে জেগে উঠে মাশা স্বামীর কাপড়চোপড় ব্রাশ করে পরিষ্কার আন্ডারউইয়ার ঠিক করে রাখল। ঘুম ভেঙে গুসেভ চা খেল, ইয়ার্কি করল, মাশার গালে টোকা মারল। বড়ো এক তাড়া নোট টেবিলে রেখে ঝোলাটা কাঁধে চাপিয়ে দোরগোড়ায় মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে মাশাকে চুমু খেল।

গুসেভ কোথায় গেল তার সন্ধান পায়নি মাশা।

যাত্রাক্ষণ

লসের কামারশালার বাইরের জমিতে ভিড় জমে গেছে ছোট ছোট দলের। বাঁধ আর পেত্রভস্কি দ্বীপ থেকে তারা একে একে এসে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বারবার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, নিম্নবিহারী সূর্যের চওড়া রেখা দেখা যাচ্ছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। কথাবার্তা চলেছে:

'কী হল? কেউ খুন হয়েছে না কি?'

'ওরা এক্ষুণি রওনা দেবে মঙ্গলগ্রহে।'

'ওরে বাবা! এ-রকম কান্ড তো শুনিনি কখনো!'

'কী বলছ? কে যাচ্ছে?'

'দুজন দাগী আসামীকে ইস্পাতের গোলার মধ্যে পুরে মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুঁড়ে দেবে। পরখ করে দেখবে।'

'মস্করা করা হচ্ছে বুঝি?'

'জানোয়ার সব — মানুষের দাম নেই ওদের কাছে!..'

'"ওরা" কারা জানতে পারি?'

'তাতে আপনার কী শুনি?'

'সত্যি, অমানুষিক বটে।'

'হে ভগবান, লোকগুলো কী মুখ্যু!'

'মুখ্যু, বটে! ইনি আবার কোথা থেকে জুটলেন!'

'শূন্যে পাঠানো উচিত আপনাকে!'

'রাখুন মশাই। সত্যি সত্যি একটা ঐতিহাসিক

ঘটনা ঘটতে চলেছে আর আপনারা কিনা মিছে বকবক করছেন।'

'মঙ্গলগ্রহে যাবার উদ্দেশ্যটা কী?'

'মাপ করুন, এইমাত্র তো একজন বলল, ওরা দশ মণ প্রচারপত্র নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে।'

'এটা একটা অভিযান।'

'কীসের?'

'সোনার জন্য।'

'হক কথা, আমাদের সোনার তহবিল পরিপূরণ করা তো চাই।'

'অনেক সোনা নিয়ে আসবে না কি?'

'যত খুশি তত।'

'ও মশাইরা, আর কতক্ষণ সবুর করতে হবে বলুন তো?'

'ওরা ছাড়বে সূর্যাস্তের সময় ...'

গোধূলি পর্যন্ত জটলা চলল। অসাধারণ ঘটনাটির প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে রকমারি জল্পনা কল্পনা। তর্কবিতর্ক বচসা, কিন্তু কেউ স্থান ত্যাগ করছে না।

অস্তরবির সিঁদুরে অর্ধেক আকাশ আরক্তিম। কিছুক্ষণ পর গুবের্নিয়ার কার্যনির্বাহ সমিতির একটি বড়ো গাড়ি ভিড় ভেদ করে আস্তে আস্তে এল। কামারশালার জানলায় আলো জ্বলে উঠল। কথাবার্তা থামিয়ে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গেল জনতা।

চালাঘরের মাঝখানে একটু নিচের দিকে হেলানো সিমেণ্টের প্ল্যাটফর্মে ডিম্বাকৃতি গ্রহজাহাজটি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক খোলা, সারি সারি ঝকঝকে গজাল। খোলা পোর্টহোল দিয়ে চোখে পড়ে হলদে চামড়ার তৈরি উজ্জ্বল ভেতর দিকটা।

লস ও গুসেভ চাপিয়েছে ভেড়ার চামড়ার কুর্তা, ফেল্টের বুট আর চামড়ার হেলমেট। গ্রহজাহাজ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কার্যনির্বাহ সমিতির সদস্যরা, আকাদেমী সভ্য, ইঞ্জিনিয়ার ও সাংবাদিকের দল। বিদায় বক্তৃতার পালা সাঙ্গ, ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়ে গেছে। যাঁরা বিদায় দিতে এসেছেন তাঁদের অল্প কথায় ধন্যবাদ জানাল লস। মুখ তার বিবর্ণ, চোখদুটো কাঁচের মতো। খখ্‌লভ ও কুজ্‌মিনকে আলিঙ্গন করে ঘড়ির দিকে তাকাল।

'ছাড়ার সময় হল!'

জনতা চুপচাপ। ভুরু কুঁচকে পোর্টহোলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে গুসেভ গ্রহজাহাজে ঢুকল। ভেতরে চামড়ার আসনে বসে হেলমেট ঠিক করে কুর্তাটায় হাত বুলিয়ে নিল।

'আমার বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে ভুল না যেন,' হেঁকে বলল খখ্‌লভকে, ভুরু বেজায় কুঁচকিয়ে।

পায়ের দিকে তাকিয়ে গ্রহজাহাজের পোর্টহোলের কাছে গড়িমসি করছিল লস। হঠাৎ মাথা তুলে ফাঁপা, কাঁপা গলায় বলল:

'মনে হচ্ছে আমি সফল হব, পেঁাছব মঙ্গলগ্রহে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে বছর কয়েকের মধ্যে শত শত গ্রহজাহাজ মহাশূন্যে পাড়ি দেবে। অন্বেষণের স্পৃহা বরাবর চালাবে আমাদের, বরাবর। কিন্তু প্রথমেই আমাকে কেন পাড়ি দিতে হবে? কেন মহাকাশের রহস্য আমাকেই উদ্ঘাটন করতে হবে প্রথমে? কী পাবো সেখানে? নিজেকে ভুলে যাওয়া ... আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে এটাই সবচেয়ে বেশী বিচলিত করছে আমাকে ... বন্ধুগণ, আমার নির্মাণ প্রতিভা নেই, আমি সাহসী নই, নই স্বপ্নদ্রষ্টা। আমি ভীরু, পলাতক আমি ...'

হঠাৎ থেমে লস আশেপাশের ভিড়ের দিকে তাকাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। সবাই হতভম্ব। চোখের ওপর হেলমেট টেনে নিল লস।

'কথাটা অপ্রাসঙ্গিক, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথাটা ... সেটাকে ফেলে যাচ্ছি চালাঘরের ওই একলা বিছানায় ... বিদায়, বন্ধুগণ। অনুগ্রহ করে গ্রহজাহাজ থেকে যতটা দূরে পারেন সরে দাঁড়ান।'

ক্যাবিনের ভেতর থেকে এবার গুসেভ হাঁকল:

'বন্ধুগণ, মঙ্গলগ্রহে যারাই থাকুক না কেন তাদের জানাব সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাদর সম্ভাষণ। কী বলেন?'

জনতার মধ্যে উঠল গুঞ্জরন। হাততালি।

ফিরে লস গ্রহজাহাজের পোর্টহোলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে দড়াম করে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। ঠেলাঠেলি করে,

উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে লোকজন চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জমিটাতে যারা ছিল তাদের সঙ্গে ভিড়ল। কে যেন সাবধান করে হাঁকল:

'পিছু হটে শুয়ে পড়ুন, হুঁশিয়ার!'

হাজার হাজার লোক নিঃশব্দে চেয়ে আছে কামারশালার আলোকিত চৌকোণ জানলাগুলোর দিকে। ভেতরে কোনো শব্দ নেই। বাইরেও নয়। এভাবে কাটল কয়েক মিনিট। অনেকে মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে। দূরে হ্রেষাধ্বনি। কে যেন ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠল:

'চুপ!'

ঠিক সে মুহূর্তে কর্ণবধির করা ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠল চালাঘর, তারপর একটার পর একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। মাটি কাঁপছে। ছাদের খোলা জায়গা থেকে ধোঁয়া আর ধূলোর মেঘে উঠল গ্রহজাহাজের ভোঁতা ধাতব নাক। জাহাজটা দুলতে দুলতে শূন্যে উঠল, স্থির হয়ে রইল সেখানে, যেন লক্ষ্য ঠিক করে নিচ্ছে। তারপর বজ্র হুঙ্কারে আট মিটারের গোলকটি তীরবেগে জনতার ওপর দিয়ে পশ্চিমমুখো গিয়ে দূরে লালচে ধূলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন সাড়া ফিরে এল জনতার। লোকে টুপি ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ভিড় করে দাঁড়াল চালাঘর ঘিরে।

অন্ধকার আকাশে

পোর্টহোলের ঢাকনা স্ক্রু দিয়ে আটকে লস বসে পড়ল, তাকাল গুসেভের চোখে। ফাঁদে-পড়া পাখির মতো তীক্ষ্ন, ধারালো চোখ।

'ছাড়ব না কি, আলেক্সেই ইভানভিচ?'

'ছাড়া যাক।'

বিদ্যুত চলাচল নিয়ন্ত্রণের কলের লেভার চেপে অল্প টান দেওয়াতে বিস্ফোরণের ভারি শব্দ — যে শব্দে বাইরের জনতা চমকে উঠেছিল। সেরকম দ্বিতীয় একটি কল টানল লস। পায়ের তলায় গুরুগুরু গম্ভীর আওয়াজ, গ্রহজাহাজ ধক্‌ধকিয়ে এত ভীষণ কাঁপতে লাগল যে আসন আঁকড়ে ধরল গুসেভ। চোখ ঘুরতে লাগল পাগলের মতো। দুটো কলই চালু করে দিল লস। তীরের মতো উঠল গ্রহজাহাজ, ধক্‌ধকানি বন্ধ। চিৎকার করে উঠল লস:

'ছেড়েছি।'

মুখের ঘাম মুছল গুসেভ। গরম লাগছে। বেগমাপ যন্ত্রে দেখা গেল প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ মিটার চলেছে গ্রহজাহাজ। যন্ত্রের কাঁটা আরো ওপরে উঠছে।

পৃথিবীর আবর্তনের বিপরীত মুখে ট্যানজেণ্ট রেখায় ছুটেছে গ্রহজাহাজ। কেন্দ্রাতিগ শক্তি টানছে পূব দিকে।

লসের হিসেব মতো একশ' কিলোমিটার উর্ধ্বে জাহাজটা সোজা হয়ে কোণাকুণি ছুটবে।

মোটরের ক্রিয়া মসৃণ, কোনো গড়বড় নেই। ফারের আস্তর দেওয়া কুর্তার বোতাম খুলে লস ও গুসেভ হেলমেট হেলিয়ে দিল পিছনে। বিজলি বাতি জ্বালাল না। ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে গোধূলির ম্লান আলো এল ভেতরে।

কেমন যেন দুর্বল লাগছে, মাথা ঘুরছে। সেটা কাটাবার চেষ্টা করে লস হাঁটু গেড়ে বসে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। নীল-ধূসর প্রকান্ড একটি অবতল গোল পেয়ালার মতো নিচে ছড়িয়ে আছে পৃথিবী। গায়ে এখানে সেখানে দ্বীপের মতো ধোঁয়াটে মেঘের সারি। অতলান্তিক মহাসাগর।

ক্রমশ গোল পেয়ালাটি ছোট হয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। ডান কিনারায় রুপোলি আভা, অন্যদিক অন্ধকারে দেখা যায় না। অতল গহ্বরে পড়ন্ত বলের মতো দেখাচ্ছে এখন।

অন্য একটি ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে বসেছিল গুসেভ, সে বলল:

'তাহলে চললাম, মাগো। অনেক দিন ছিলাম একসঙ্গে — এবার বিদায়ের পালা।'

ওঠার চেষ্টা করাতে কাৎ হয়ে নিজের আসনে পড়ে গেল গুসেভ। কলার টেনে বলল:

'দম বন্ধ হয়ে আসছে, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

লসের মনে হল হৃৎস্পন্দন ক্রমশ বেড়ে গিয়ে হাতুড়ির মতো পিটছে। রক্ত উঠছে মাথায়। চোখে সর্ষেফুল দেখছে।

গুড়ি মেরে গেল বেগমাপ যন্ত্রের কাছে। কাঁটাটা দ্রুত উঠছে, অবিশ্বাস্য বেগের হদিস তাতে। হাওয়া পাতলা হয়ে আসছে। মহাকর্ষ কমে এল। কম্পাসে বোঝা গেল ঠিক একেবারে নিচে পৃথিবী। প্রত্যেকটি মুহূর্তে তখনো বেগ সঞ্চয় করে গ্রহজাহাজ তীরবেগে যাচ্ছে হিম মহাকাশে।

কলার খুলতে গিয়ে নখ ভেঙে গেল লসের। থেমে গেল হৃৎস্পন্দন।

লসের জানা ছিল গ্রহজাহাজের গতিবেগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায়, রক্ত সংবহনে ও দেহের সমগ্র ছন্দে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেবে। জানা ছিল বলে আবর্তনগতির নিয়ম প্রদর্শক একটি যন্ত্র (সে রকম যন্ত্র ছিল দুটি) তার দিয়ে বেঁধেছিল একটি আধারের সঙ্গে, যা থেকে সংকট মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন ও এ্যামোনিয়া উৎসারিত হবে।

সম্বিৎ প্রথমে ফিরে এল লসের। বুকে ব্যথা, মাথা ঘুরছে, লাট্টুর মতো গুনগুন শব্দ হৃৎপিণ্ডে। মাথায় নানা কথার ঝড়, বিচিত্র নানা কথা — ক্ষিপ্র, পরিষ্কার। অঙ্গসঞ্চালন লঘু, নির্ভুল।

এমারজেন্সি অক্সিজেনের কল টিপে বেগমাপ যন্ত্রের দিকে তাকাল লস। সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ শ' কিলোমিটার বেগে

চলেছে গ্রহজাহাজ। আলো হয়ে উঠল। একটা ঘুলঘুলি থেকে ঝকঝকে সূর্যরশ্মি পড়ল গুসেভের ওপর। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, দাঁত চেপে বীভৎস মুখ বিকৃতি করে, কাঁচের মতো চকচকে চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

লস এক টিপ স্মেলিং সল্ট ধরল তার নাকের কাছে। গভীর নিশ্বাস নিল গুসেভ, চোখের পাতা কেঁপে উঠল। বগলের নিচে জোরে চেপে তাকে তুলল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সাবানের বুদবুদের মতো হালকা হয়ে ঝুলে রইল তার দেহ। ছেড়ে দিতে ধীরে ধীরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল গুসেভ, পাদুটো ছড়িয়ে, কনুই তুলে, যেন জলে বসে আছে। হতভম্ব হয়ে তাকাল চারদিকে। হাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল সে:

'আমার কি নেশা হয়েছে?'

লস তাকে বলল ওপরে যে ঘুলঘুলিটা সেখানে গিয়ে বাইরে তাকাতে। টলতে টলতে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে গুসেভ মাছির মতো ক্যাবিনের খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠল, চামড়ার সেলাই-এর জোড়ে শক্ত করে হাত রেখে। ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে বলল:

'ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

সূর্যের দিকে মুখ করা লেন্স-এ একটা ধোঁয়াটে কাঁচের খণ্ড লস লাগিয়ে দিল। নিরালম্ব সূর্য, চারিপাশের শূন্য অন্ধকারের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠা বিরাট ঝাঁকড়া একটি গোলক। এক জোড়া ডানার মতো দুধারে ভাসমান কুয়াশার উজ্জ্বল

আবরণ। ঘন পিণ্ড থেকে একটি ফোয়ারা উৎসারিত হয়ে ছত্রকের আকার নিচ্ছে। সূর্য কলঙ্কের সময় সেটা। উজ্জ্বল গোলকটি থেকে কিছু দূরে আগুনের জ্বলন্ত সমুদ্র। সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করা এদের বর্ণ রাশিচক্রের ডানার চেয়ে ফিকে।

এই অপরূপ দৃশ্য থেকে অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে নিল লস — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সঞ্জীবনী অগ্নি থেকে। দেখার যন্ত্রে ফের ঢাকনা বসাল। আবার অন্ধকার। ক্যাবিনের অন্য দিকে ঘুলঘুলির কাছে গিয়ে ফোকাস ঠিক করে নিল। সেখানে অন্ধকার। চোখে বিঁধল একটি নক্ষত্রের সবুজাভ রেখা। অল্পক্ষণের মধ্যে তার বদলে দেখা গেল নীল একটি রেখা। এটি হল সিরিয়াস, সৌরজগতের হীরক, উত্তর মহাকাশের প্রথম নক্ষত্র।

তৃতীয় ঘুলঘুলির দিকে হামাগুড়ি দিয়ে গেল লস। সেটি ঠিক করে নিয়ে চোখ লাগিয়েই রুমাল দিয়ে মুছে আবার দেখল। বুকটা যেন জমে গেছে। মনে হল চুলের ডগা পর্যন্ত কাঁপছে।

অন্ধকারে তাদের পেরিয়ে ভেসে চলেছে অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন কয়েকটি বিন্দু।

‘আমাদের কাছাকাছি কী যেন চলেছে!’ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল গুসেভ।

আস্তে আস্তে নিচের দিকে ভেসে গেল বিন্দুগুলি, সরে

যেতে যেতে আরো স্পষ্ট আর দীপ্ত হয়ে উঠল। টুকরো টুকরো রূপোলি রেখা আর সূত্র, তারপর একটি শৈলশিরার স্পষ্ট, এবড়ো খেবড়ো প্রান্তদেশ। স্পষ্ট বোঝা গেল সৌরজগতের কোনো একটা দেহের কাছে এসে তার মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে গ্রহজাহাজ, আর এখন চারিদিকে উপগ্রহের মতো পাক দিতে শুরু করেছে।

কাঁপা হাতে হাতড়ে লস বিদ্যুৎ চলাচল নিয়ন্ত্রণের কলের লেভার যতখানি পারে টানল। গ্রহজাহাজ ফেটে পড়ার সম্ভাবনা আছে। নিচে এঞ্জিন কেঁপে গর্জিয়ে উঠল। দ্রুত সরে গেল বিন্দুগুলি আর পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো খাড়া পাড়। কিন্তু আরো কাছে এগিয়ে এল চিকচিকে পৃষ্ঠদেশ, স্পষ্ট দেখা গেল রিক্ত প্রাণহীন সমভূমিতে প্রসারিত সেই খাড়া পাহাড়গুলির তীক্ষ্ণ দীর্ঘ ছায়া।

পাহাড়ের দিকে চলেছে গ্রহজাহাজ। একদিকে সূর্যের আলো পড়াতে মনে হল পাহাড়গুলো একেবারে কাছে। লস ভাবল (ধীর স্থির তার মন), 'এক্ষুনি জাহাজটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবে, গলা ঘুরিয়ে মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আসার সময় থাকবে না। সব শেষ এবার।'

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে তার চোখে পড়ল খাড়া পাহাড়ের মাঝে মৃত সমভূমিতে ধাপে ধাপে মিনারের ধ্বংসাবশেষ... দাঁতালো পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে ভেসে পার হয়ে গেল জাহাজটা ... কিন্তু ওখানে ওদিকে নিচে অতল শূন্য কালো

খাদ, অজানার অন্ধকার। একটা এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ের গায়ে ধাতব শিরার দীপ্তি। তারপর অনেক পিছিয়ে পড়ে থেকে চূর্ণ-পিণ্ট অজানা গ্রহটির অনন্ত যাত্রা চলল। আবার ধূধূ কালো আকাশে গ্রহজাহাজ বেগে ধাবমান।

হঠাৎ চমকে উঠে গুসেভ বলল:

'সামনে ওটা চাঁদ না কি?'

ঘুরে তাকাতে দেয়ালের অবলম্বন আর রইল না, শূন্যে ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে, দিব্যি গালতে গালতে ভেসে রইল সে, দেয়ালে ফিরে যাবার চেণ্টা তার। পায়ের তলা থেকে মেঝে সরে যাওয়াতে লসের মনে হল সে ভাসছে। দেখবার টিউব আঁকড়ে সে চেয়ে রইল মঙ্গলগ্রহের ঝকঝকে রূপোলি আলোটার দিকে।

অবতরণ

মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা মঙ্গলগ্রহের রূপোলি থালা ক্রমশ বড়ো হয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ মেরুতে চোখ ঝলসানো বরফের ছোপ। তার নিচে কুয়াশার বক্র রেখা পূবে নিরক্ষরেখা পর্যন্ত প্রসারিত, মূল মধ্যরেখার কাছাকাছি ওপরে উঠেছে, একটা লঘুতর উপরিদেশ ঘিরে; গ্রহের পশ্চিম পাড়ে দুভাগ হয়ে গড়েছে একটা অন্তরীপ।

নিরক্ষরেখার কাছে পাঁচটা স্পষ্ট কালো বিন্দু; সরল রেখায় তারা যুক্ত। সরল রেখাগুলি দুটো সমবাহু ত্রিভুজ

ও আর একটি লম্বাটে ত্রিভুজের আকার নিয়েছে। পূবের ত্রিভুজের নিচে একটি সঠিক আকারের বৃত্তখণ্ড। বৃত্তখণ্ডটির মধ্য ভাগ থেকে পশ্চিমের উপান্ত পর্যন্ত দ্বিতীয় একটি অর্ধবৃত্ত। নিরক্ষরেখা গোষ্ঠির পূবে ও পশ্চিমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি লাইন, বিন্দু ও অর্ধবৃত্ত। উত্তর মেরু তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

লাইনগুলির দিকে লোভীর মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল লস। এই হল সেই বহুরূপী, ঋজুরেখা মঙ্গলগ্রহের খাল যা দেখে জ্যোতির্বিদদের বিভ্রান্তি ঘটে। লাইনগুলোর প্রথম গোষ্ঠি অত্যন্ত স্পষ্ট, তার মধ্যে প্রায় দুর্লক্ষ্য আর একটি অস্পষ্ট গোষ্ঠি ধরা পড়ল লসের চোখে।

লাইনগুলোর নকসা নোটবুকে আঁকতে শুরু করল লস। হঠাৎ মঙ্গলগ্রহের মণ্ডল ভীষণ জোরে নেমে এসে লেন্সের পাশ দিয়ে ভেসে চলল। বিদ্যুৎ চলাচল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কাছে এক লাফে গিয়ে পড়ল লস:

'এসে পড়েছি, আলেক্সেই ইভানভিচ! আমাদের টানছে, পড়ে যাচ্ছি আমরা!'

গ্রহের দিকে সটান মুখ ফেরাল গ্রহজাহাজ। মোটরের বেগ কমিয়ে তারপর বন্ধ করে দিল লস। গতির পরিবর্তন এখন ততটা যন্ত্রণাকর নয়, কিন্তু যে স্তব্ধতা শুরু হল সেটা এত ভয়ংকর যে মাথা আঁকড়ে গুসেভ কানে হাত চাপা দিল।

মেঝেতে শুয়ে পড়ে লস দেখতে লাগল রূপোলি থালাটা

ক্রমশ বড়ো আর গোল হয়ে আসছে। মনে হল অন্ধকার মহাশূন্য থেকে তীরবেগে তাদের দিকে সেটা ধেয়ে আসছে।

বিদ্যুৎ চলাচল নিয়ন্ত্রণের কল আবার চালিয়ে দিল লস। ধক্‌ধক্‌ করে কেঁপে উঠল গ্রহজাহাজ, মঙ্গলগ্রহের মহাকর্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চলেছে। পতনের বেগ কমে এল। আকাশ আড়াল করে দিয়ে অস্পষ্টতর হয়ে গেল মঙ্গলগ্রহ, পেয়ালার মতো কিনারাগুলো বেঁকে গেছে।

শেষের কয়েকটি মুহূর্ত ভয়াবহ। পতনের বেগে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আকাশ ঢাকা পড়ে গেল মঙ্গলগ্রহে। হঠাৎ লেন্সগুলো বাস্পে ঝাপসা। কুয়াশায় অস্পষ্ট একটি সমভূমি, তার ওপর মেঘ কেটে নামছে গ্রহজাহাজ। কাঁপুনি আর গর্জন, বেগ কমে এল ক্রমশ।

'নামছি!' চেঁচিয়ে লস মোটর বন্ধ করে দিল। পর মুহূর্তে এক ঝটকায় ডিগবাজী খেয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে। মাটিতে বেশ ঠোক্কর খেয়ে গ্রহজাহাজ একপাশে কাৎ হয়ে পড়েছে।

. . . .

হাঁটু আর হাত কাঁপছে, বুকে হাতুড়ির ঘা। তাড়াতাড়ি, নিঃশব্দে ক্যাবিনটা গুছিয়ে লস ও গুসেভ পৃথিবী থেকে আনা আধমরা ইঁদুরটাকে একটা ঘুলঘুলি থেকে বাড়িয়ে ধরল। ক্রমশ প্রাণ এল ইঁদুরটার, নাক তুলে গোঁফ নেড়ে গা ভিজিয়ে ফেলল। বাইরের হাওয়ায় তাহলে প্রাণী বাঁচতে পারে।

তখন পোর্টহোলের ঢাকনাটা আলগা করল তারা। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ফাঁপা গলায় বলল লস:

'এসে পড়েছি তাহলে, আলেক্সেই ইভানভিচ! বাইরে যাওয়া যাক।'

ফেল্টের বুট আর ফারের আস্তর-দেওয়া জ্যাকেট খুলে ফেলল। গুসেভ বেল্টে রিভলভারটা এঁটে নিয়ে (সাবধানের মার নেই) একটু হেসে ঢাকনাটা হট করে সরিয়ে দিল।

মঙ্গলগ্রহ

গ্রহজাহাজ থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এসে প্রথমে তাদের চোখে পড়ল চোখ ধাঁধানো অতল আকাশ ঝড়ের সময় সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল।

মঙ্গলগ্রহের ঊর্ধ্বে সূর্যের বিরাট ঝাঁকড়া অগ্নিগোলক। অপূর্ব স্পষ্ট দিগন্ত থেকে উচ্চতম সীমা পর্যন্ত স্ফটিক-নীল আলোর শীতল ও স্বচ্ছ ধারা।

'এদের সূর্য দেখছি বেশ ফূর্তিবাজ,' বলেই হেঁচে উঠল গুসেভ, গভীর নীল ঊর্ধ্বলোক এত দীপ্ত, ঝকঝকে। বুকের মধ্যে কেমন যেন আড়ষ্টভাব, রগের দপদপানি, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজ। হাওয়া পাতলা, শুকনো।

নারাঙ্গি রঙের চেপটা সমভূমিতে গ্রহজাহাজ পড়ে আছে। দিগন্তরেখা অত্যন্ত কাছে — প্রায় নাগালের মধ্যে। মাটিতে

বড়ো বড়ো ফাটল। শাখাওয়ালা মোমবাতির মতো দীর্ঘ ফনিমনসার দঙ্গল, তা থেকে জোরালো লাল-বেগুনি ছায়া পড়েছে মাটিতে। খরখরে হাওয়া।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে লস ও গুসেভ চলল সমভূমি হয়ে। ঝুরঝুরে মাটিতে গাঁট পর্যন্ত পা বসে যাচ্ছে, তবু হাঁটা অস্বাভাবিক সহজ। উঁচু ভরাট একটা ফনিমনসা ঘুরে যেতে যেতে তাতে হাত দিল লস। থরথর করে কেঁপে উঠল সেটা, যেন দমকা হাওয়ায় আর বাদামি রসালো দাঁড়া বাড়িয়ে দিল লসের হাতের দিকে। গুসেভ শিকড়ে লাথি মারল, কুৎসিত জিনিসটা উলটে পড়ে গেল বালিতে কাঁটা গেঁথে।

প্রায় আধ ঘণ্টা দুজনে হাঁটল। সামনে সেই নারাঙ্গি রঙের সমভূমি — ফনিমনসা, লাল-বেগুনি ছায়া, মাটির ফাটল। সূর্যকে সমকোণে রেখে দক্ষিণে লস ঘুরেছে, হঠাৎ চোখ পড়ল মাটিতে। থমকে দাঁড়িয়ে, বসে হাঁটুতে এক থাপড় মারল।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, এতো চষা জমি।'

'তার মানে?'

ভালো করে দেখাতে সত্যি নজরে এল বেশ চওড়া, ঝুরঝুরে শিরালা আর ফনিমনসার সোজা সারি। কয়েক পা এগিয়ে পাথরের একটা ফলকে হোঁচট খেল লস। ফলকের গায়ে ব্রোঞ্জের বড়ো একটা আংটি, এক টুকরো দড়ি লাগানো

তাতে। চিবুকে হাত বুলিয়ে নিল লস, চকচক করে উঠল চোখদুটো।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, আপনার মাথায় কিছু ঢুকল?'

'দেখছিই তো, মাঠে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আংটিটার মানে কী?'

'পাথরে আংটি কেন লাগিয়েছে সেটা শুধু শয়তান জানে।'

'বয়া লাগাবার জন্য। ঝিনুকগুলো দেখেছেন? আমরা এখন একটা মরা খালের গর্ভে।'

গুসেভ বলল, 'তাই তো! কিন্তু এখানে জল তো বিশেষ নেই মনে হচ্ছে।'

পশ্চিম দিকে ঘুরে দুজনে চলল শিরালার ওপর দিয়ে। দূরে মাঠের ওপরে উড়ে এল একটি বড়ো পাখি কেঁপে কেঁপে ডানা ঝাপটিয়ে। দেহটা ভোমরার মতো। দাঁড়িয়ে পড়ে রিভলভারে হাত দিল গুসেভ, কিন্তু পাখিটা উপরে উঠে আকাশের ঘোর নীলিমায় পৌঁছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিকট দিগন্তের ওপারে।

ফনিমনসাগুলো এখন আগের চেয়ে উঁচু, ঘন আর রসালো। কম্পমান কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে সাবধানে পথ করে চলতে হচ্ছে। পায়ের নিচ দিয়ে সড়সড়িয়ে চলে যাচ্ছে গিরগিটির মতো জীব, টকটকে নারাঙ্গি রঙ, পিঠে আঁশ। অদ্ভুত চেহারার কাঁটা-গা গোল গোল জিনিস থপথপ করে

পাশে সরে সরে লাফিয়ে পড়ছে জট-পাকানো ঝোপঝাড়ে। অত্যন্ত সাবধানে চলেছে লস ও গুসেভ।

খড়ির মতো সাদা খাড়া একটা পাড়ে ফনিমনসার শেষ। পাড়টা স্পষ্টত প্রাচীন টালি পাথরে বাঁধানো। ফুটো ফাটলে শুকনো শেওলা। একটা পাথরের ফলকে পাকিয়ে আংটি বসানো, মাঠের আংটিটার মতো। খোশমেজাজে রোদ পোহাচ্ছে আঁশওয়ালা গিরগিটির দল।

পাড়ে উঠল লস ও গুসেভ। সেখান থেকে চোখে পড়ে বন্ধুর মাঠ। সেই নারাঙ্গি রঙ, কিন্তু একটু গাঢ়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খর্ব গাছ, পাহাড়ে পাইনের মতো অনেকটা, সাদা পাথরের স্তূপ আর ধ্বংসাবশেষ। উত্তর-পশ্চিমে উদ্যত পর্বতমালা, আগুনের জমাট শিখার মতো ধারালো, এবড়ো খেবড়ো। চূড়ায় ঝকঝকে বরফ।

'ফিরে গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিলে হয়,' গুসেভ বলল। 'ধকল সইবে না তাহলে। এখানে তো জ্যান্ত প্রাণীর কোনো লক্ষণ দেখছি না।'

পাড়ে কিছুক্ষণ রইল দুজন। সমভূমিটি কী মর্মান্তিক নিঃসঙ্গ ও নিরালা।

'কোথায় যে এসে পড়লাম,' গুসেভ খেদ করল।

পাড় থেকে নেমে গ্রহজাহাজের দিকে দুজনে চলল। ফনিমনসার মধ্যে সেটাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগল কিছু।

হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠল গুসেভ:

'দেখেছেন!'

পাকা হাতে ঝট করে রিভলভারটা বের করে নিল সে, তারপর হাঁকল:

'কে হে তুমি গ্রহজাহাজের কাছে? গুলি চালাব এক্ষুনি!'

'কাকে লক্ষ্য করে চেঁচাচ্ছেন?'

'দেখুন না, গ্রহজাহাজটা দেখছেন তো?'

'হ্যাঁ, চোখে পড়েছে বটে।'

'ডান দিকে কে একটা বসে আছে ওই তো!'

শেষটায় লসের চোখে পড়াতে দুজনে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ল গ্রহজাহাজের দিকে। কাছ থেকে জীবটা সরে গেল, এক পায়ে লাফাতে লাফাতে ফনিমনসার মধ্যে গিয়ে তড়াক করে উঠে দীর্ঘ ডানা বিস্তার করে চড়চড় শব্দে তীরবেগে আকাশে উঠল, ওদের মাথার ওপর একবার পাক খেয়ে চলে গেল নীল শূন্যে। এটি হল সেই যাকে প্রথমে ওরা পাখি ভেবেছিল। গুসেভ রিভলভার তুলে তার দিকে টিপ করাতে এক ঝটকায় সেটা ফেলে দিল লস।

'পাগল হয়ে গেছেন না কি? ওটা তো মঙ্গলগ্রহের লোক!..'

গহন নীল আকাশে তাদের ওপরে পাক খাওয়া অদ্ভুত জীবটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গুসেভ। রুমাল বের করে নাড়তে লাগল লস।

'সাবধান,' গুসেভ বলে উঠল, 'ওখান থেকে আবার আমাদের উপর হামলা না করে।'

'রিভলভার সরিয়ে রাখুন আপনি, কথা শুনুন।'

নেমে আসছে বড়ো সেই পাখিটা। এবার স্পষ্ট দেখা গেল ওটা মানুষের মতো জীব, একটা ওড়বার যন্ত্রের সীটে বসে আছে। কাঁধ বরাবর দুটো বাঁকা ডানা দু'পাশে। ডানাগুলোর একটু নিচে ঘরঘর করছে ছোট একটা চাকা খুব সম্ভব প্রপেলার। সীটের পিছে বেরিয়ে আছে লেভার-দেওয়া একটা লেজ। যন্ত্রটার গঠন ও গতি জীবন্ত প্রাণীর মতো অনায়াস, স্বচ্ছন্দ।

ছোঁ মেরে নেমে মঙ্গলগ্রহবাসীটি একটা পাখা নামিয়ে, অন্যটা তুলে ভেসে গেল মাঠের ওপর দিয়ে। লম্বা কানাত, ডিমের আকার হেলমেট-পরা মাথা দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। চোখে গগল্‌স্‌, লম্বাটে চিমড়ে পড়া লালচে মুখ, খাড়া নাক। বড়ো হাঁ করে কিচমিচ করে কী একটা বলল। তারপর দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে মাটিতে নেমে, কয়েক পা দৌড়িয়ে সীট ছেড়ে লাফিয়ে নামল ওদের থেকে প্রায় তিরিশ পা দূরে।

মঙ্গলগ্রহবাসীকে দেখতে মাঝারি দৈর্ঘ্যের মানুষের মতো। পরনে হলদে রঙের ঢিলে কুর্তা, লিকলিকে সরু পা দুটো হাঁটুর কাছে শক্ত করে বাঁধা। পতিত ফনিমনসাগুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে দেখাল সে, কিন্তু লস ও গুসেভ পা বাড়াতেই সে একলাফে সীটে চেপে ওদের উদ্দেশ্য করে লম্বা

আঙুল নাড়িয়ে প্রায় সোজা উপরে উঠল, কিন্তু তারপরই আবার নেমে সরু, কিঁচকিঁচে গলায় চেঁচাতে লাগল, ভাঙা গাছগুলোকে দেখিয়ে।

'বেকুবটা চটেছে দেখছি,' গুসেভ বলল। মঙ্গলগ্রহবাসীকে হেঁকে বলল, 'কিঁচকিঁচানি তোর থামা বলছি, কুষ্মাণ্ড কোথাকার! এদিকে আয়, তোকে খেয়ে ফেলব না!..'

'রেগে কী লাভ, আলেক্সেই ইভানভিচ। রুশী ও বোঝে না। বসুন, নইলে ও কাছে ঘেঁষবে না।'

রোদে-পোড়া জমিতে বসে পড়ল লস আর গুসেভ। লস ইসারা করে বোঝাবার চেষ্টা করল জল ও খাবার চায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে গুসেভ থুথু ফেলল। কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল মঙ্গলগ্রহবাসীর, কিন্তু তখনো পেন্সিলের মতো সরু আঙুল রাগের চোটে নাড়ানো থামল না। তারপর সীট থেকে একটা থলে বের করে ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। বড়ো বড়ো পাক খেয়ে অনেক ওপরে উঠে দ্রুত গতিতে উড়ে গেল উত্তরমুখো, দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্ত পেরিয়ে।

থলেতে দুটো ধাতব বাক্স আর একটা চেপটা পাত্রে তরল পদার্থ কী একটা। বাক্সদুটো খুলে ফেলল গুসেভ— একটাতে কড়াগন্ধ জেলি, অন্যটাতে চটচটে কয়েকটা ডেলা, অনেকটা চিনির মোরব্বার মতো। শুঁকে দেখে গুসেভ বলল:

'ফুঃ! খাবার ছিরি দেখুন একবার!'

গ্রহজাহাজ থেকে খাবার ঝুড়ি নিয়ে এসে গুসেভ ফনিমনসার কয়েকটা শুকনো ডাল জড়ো করে আগুন ধরাল। ধোঁয়ার পাতলা রেখা, চড়চড় করে উঠল ডালগুলো, বেজায় গনগনে আঁচ। মাংসের একটা টিন গরম করে নিয়ে তারা পরিষ্কার ন্যাপকিনের ওপর খাবার রেখে গোগ্রাসে খেতে লাগল, এত ক্ষিধে পেয়েছিল আগে টের পায়নি।

মধ্যাকাশে সূর্য। হাওয়া পড়ে গেছে। বেশ গরম। নারাঙ্গি রঙের ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে ওদের দিকে গুড়ি মেরে এল একটা শতপদী ছোট জীব... একটুকরো শুকনো রুটি ছুঁড়ে দিল গুসেভ। শিঙওয়ালা তিনকোণা মাথা তুলে জীবটা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে লস শুয়ে পড়ল, গালে হাত রেখে। সিগারেট খেতে খেতে মৃদু হাসি দেখা দিল মুখে।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, কতক্ষণ খাইনি জানেন?'

'কাল সন্ধ্যে থেকে। ঠিক ছাড়ার আগে আমি পেটপুরে আলু খেয়ে নিয়েছিলাম।'

'আমরা দুজনে, দোস্ত, তেইশ চব্বিশ দিন খাইনি।'

'মানে?'

'কাল পেত্রগ্রাদে ছিল ১৮ই অগস্ট আর আজ সেখানে ১১ই সেপ্টেম্বর—অবাক কাণ্ড, তাই না?'

'শুনে মাথা ঘুরে যাচ্ছে, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, কিছু বুঝলাম না।'

'ব্যাপারটা আমিও ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। আমরা ছাড়ি সন্ধ্যে সাতটায়। এখন বেলা দুটো। আমার ঘড়ি অনুসারে ঊনিশ ঘণ্টা আগে পৃথিবী ছাড়ি, কিন্তু কামারশালার ঘড়ি হিসেবে প্রায় একমাস আগে। আপনি লক্ষ্য করেছেন, ট্রেন থামলে ঘুম ভেঙে কেমন অদ্ভুত লাগে, কিম্বা ট্রেন থামার সময় ঘুমিয়ে থাকলে শরীরে কী বিচিত্র অনুভূতি হয়? ট্রেন থামলে আমাদের শরীরের বেগ কমে যায়। চলন্ত ট্রেনে আমাদের হৃৎপিণ্ড আর ঘড়ি, দুটোরই গতি থেমে-থাকা ট্রেনের মধ্যেকার চেয়ে বেশী। অবশ্য পার্থক্যটা বলতে গেলে ধরা যায় না, কারণ ট্রেনের বেগ এমন কিছু নয়। কিন্তু আমাদের যাত্রা একেবারে আলাদা ব্যাপার তো। অর্ধেক পথ আমরা এসেছি প্রায় আলোর বেগে—তফাৎটা টের পেয়েছি হাড়ে হাড়ে। ওড়বার সময়টার সমস্তক্ষণ আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আর সমস্ত অঙ্গসঞ্চালন বলতে গেলে গ্রহজাহাজের বেগের সঙ্গে তাল রেখেছে। সবকিছু চলেছে তারি সমান ছন্দে। পৃথিবীতে সাধারণ গতিতে চলন্ত কোনো জিনিসের চেয়ে পাঁচ লক্ষ গুণ বেশী বেগে চলে আমাদের জাহাজ। তাই আমার হৃৎস্পন্দনের মাত্রা—জাহাজের ঘড়ি হিসেবে যেটা সেকেণ্ডে একবার—পাঁচ লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। তার মানে পেত্রগ্রাদের ঘড়ি হিসেবে, ওড়বার সময় আমার হৃৎস্পন্দন হয় সেকেণ্ডে পাঁচলক্ষ বার। আমার হৃৎস্পন্দন হিসেবে, গ্রহজাহাজের ঘড়ি আর আমার অনুভূতি হিসেবে পথে ঊনিশ ঘণ্টা কেটেছে।

আর ঠিক তাই — ঊনিশ ঘণ্টা। কিন্তু পেত্রগ্রাদের কারোর হৃৎস্পন্দন আর পেত্রপাভলভস্কি গির্জার ঘড়ি ধরে যদি হিসেব করি, তাহলে পৃথিবী ছাড়ার পর তিন হপ্তার বেশী কেটেছে। হয়ত এমন দিন আসবে যখন একটা বড়ো গ্রহজাহাজ বানিয়ে ছ মাসের খাবার, অক্সিজেন আর আলট্রালিড্ডাইট মজুত রেখে গুটিকতক মাথা পাগলা লোককে ডেকে বলব, "কী মশাই, আমাদের কালে আপনাদের অরুচি? এখন থেকে আরো একশ' বছর বাঁচতে চান? তাহলে এটাতে ঢুকে পড়ুন, মাস ছয়েক ধৈর্য ধরে থাকুন। আখেরে আফশোস করবেন না— ফিরে গিয়ে দেখবেন কী সে পৃথিবী! একশ' বছর পর ফিরে আসবেন!" ওদের পাঠিয়ে দেব গ্রহলোকে, আলোর গতিতে। ছ মাস মন-মরা হয়ে থাকবে ওরা, দাড়ি গজাবে, তারপর পৃথিবীতে ফিরে দেখবে—স্বর্ণযুগ। ব্যাপারটা দাঁড়াবে সে রকম।'

গুসেভ 'আহা' 'আহা' করে বিস্ময়ে জিভ দিয়ে টক্ টক্ আওয়াজ করে শুধাল:

'ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, এ খাবারটার বিষয়ে কী মনে হয় আপনার? খেলে ক্ষতি হবে?'

মঙ্গলগ্রহের সেই ফ্লাস্কের ছিপিটা দাঁত দিয়ে খুলে তরল পদার্থে জিভ ঠেকিয়ে থুথু ফেলল গুসেভ—খাওয়া চলে! কয়েক ঢোঁক খেয়ে চুমকুড়ি দিয়ে বলল:

'অনেকটা মাদিরার মতো।'

এক চুমুক খেয়ে দেখল লস। জিনিসটা ঘন আর মিষ্টি, ফুলের মতো গন্ধ। চেখে দেখতে দেখতে অর্ধেক ফ্লাস্ক সাবাড়। শরীরটা বেশ ঝরঝরে আর গরম লাগছে, কিন্তু মাথা পরিষ্কার।

দাঁড়িয়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙল লস। কী অপরূপ অদ্ভুত হালকা লাগছে এই অচেনা আকাশের নিচে, স্বপ্ন যেন। মনে হল নক্ষত্র সমুদ্রের ঢেউ তাকে তীরে এনে ফেলেছে—আবার সে জন্মেছে অচেনা নতুন জগতে।

খাবারের ঝুড়িটা গ্রহজাহাজে রেখে পোর্টহোলে ঢাকনা লাগিয়ে গুসেভ টুপিটা পেছনে হেলিয়ে দিল। বলল:

'বেড়ে লাগছে, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, এসেছি বলে একটুও দুঃখু নেই।'

ঠিক হল খাল পাড়ে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহাড়ে জায়গাটা তন্নতন্ন করে দেখতে হবে।

মনের আনন্দে কথাবার্তা বলতে বলতে দুজনে ফনিমনসার মধ্য দিয়ে চলল, মাঝে মাঝে লম্বা লাফে সেগুলোকে পেরিয়ে। কিছুক্ষণ পরে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চোখে পড়ল চকচকে সাদা টালি পাথরগুলো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল লস। শির শির করে উঠল শিরদাঁড়া। তিন পা দূরে ফনিমনসার পুরু পাতার আড়াল থেকে তার দিকে চেয়ে আছে এক জোড়া চোখ, ঘোড়ার চোখের মতো

বড়ো, ঝুলে-পড়া লাল চোখের পাতা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মারাত্মক বিদ্বেষের ছাপ।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল গুসেভ। সঙ্গে সঙ্গে চালাল রিভলভার। ধুলোর ঝলক একটা, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখজোড়া। 'এই যে আর একটা, কী জঘন্য!' একটা ডোরাকাটা বাদামি রঙের মোটা দেহ লম্বা পা ফেলে দৌড়চ্ছিল মাকড়সার মতো, ঘুরে গুলি চালাল গুসেভ। পৃথিবীতে অতল মহাসমুদ্রের গর্ভে যে অতিকায় মাকড়সা দেখা যায়, সে রকম দেখতে জিনিসটা ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল।

পোড়ো বাড়ি

খালপাড় থেকে সবচেয়ে কাছের ঝোপজঙ্গলে চলেছে লস ও গুসেভ। পায়ের নিচে বাদামি তপ্ত মাটি। মাঝে মাঝে শুকনো খাত পেরিয়ে যেতে হল, যেতে হল পুকুর ঘুরে। পরিত্যক্ত খাল গর্ভের বালিতে এখানে সেখানে উদ্যত এককালীন নৌকোর মরচে-পড়া কাঠামো। মরা নিরানন্দ মাঠে উত্তল অনেক চাকতির দীপ্তি, ব্যাসে এক মিটার। চকচকে বিন্দুতে সেগুলো সার বেঁধে ছড়িয়ে আছে উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে নিচের ঝোপজঙ্গল ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত।

দুটো পাহাড়ের মাঝে বাদামি রঙের খর্ব, মাথা চেপটা,

দোমড়ানো ডাল গাছের ঝাড়। পত্রপুঞ্জ শেওলার মতো, গুঁড়িগুলো গ্রন্থিল, শিরাকীর্ণ। একেবারে দূরের গাছগুলোর মধ্যে কাঁটাতারের ছিন্ন জালের আভাস।

ঝোপজঙ্গলে এসে পড়েছে দুজন। হেঁট হয়ে গুসেভ কী একটাতে লাথি মারাতে গড়িয়ে এল মানুষের মাথার ভাঙা খুলি। দাঁতে ধাতুর ঝিলিক। জায়গাটা গুমোট। আগুনের মতো হাওয়াহীন রোদ, শেওলা-ঢাকা ডালের ছায়া যথেষ্ট নয়। কয়েক পা এগোতে দুজনে হোঁচট খেল একটা উত্তল চাকতিতে। গোল একটা ধাতব কুয়োর গায়ে সেটা লাগানো। তারপর ঝোপজঙ্গলের পেছনে দেখা গেল একটা ভাঙাচোরা শক্ত ইটের দেয়াল। চারপাশে ভাঙা পাথর ও ধাতুর দোমড়ানো বরগার স্তূপ।

'বাড়িগুলো উড়িয়ে দিয়েছে,' গুসেভ বলল। 'মনে হচ্ছে লড়াই চলেছিল। এ ধরনের জিনিস যথেষ্ট দেখেছি।'

ভাঙা পাথরের স্তূপের পেছন থেকে অতিকায় একটা মাকড়সা বেরিয়ে একটা দেয়ালের এবড়ো খেবড়ো গা বেয়ে তড়বড় করে ছুটল। রিভলভার চালাল গুসেভ। মাকড়সাটা লাফিয়ে অনেকখানি উঠে উল্টে পড়ে গেল। আর একটা মাকড়সা ধ্বংসস্তূপ থেকে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে ছুটল গাছগুলোর দিকে, তামাটে ধুলোর মেঘ তুলে। কাঁটাতারের জালে আটকা পড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় ছটফট করতে লাগল।

ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় এসে আর একটা গাছের ঝাড়ের দিকে নেমে চলল গ্নসেভ ও লস। সেখানে দ্নর থেকে চোখে পড়ে একটি দীর্ঘ ছাদওয়ালা পাথরের দালানের চারদিকে কয়েকটা ইটের কাঠামো। পাহাড় ও বাড়িগ্নলোর মাঝে গোটা কতক চাকতি। সেগ্নলোকে দেখিয়ে লস বলল:

'মনে হয় এই কুয়োর মধ্যে রয়েছে জল সরবরাহের ব্যবস্থা, নিউম্যাটিক পাইপ আর ইলেকট্রিক তার। অনেক দিন কাজে লাগেনি গোছের চেহারা।'

কাঁটাতার পেরিয়ে ঝোপজঙ্গল পার হয়ে দ্নজনে টালি পাথর বাঁধানো একটা চওড়া প্রাঙ্গণের কাছে এসে পড়ল। শেষের দিকে একটি দালান, বিচিত্র গম্ভীর তার স্থাপত্য। মস্ণ দেয়ালগ্নলি সর্ন হয়ে উপরে উঠেছে কালো ও লাল পাথরের বিরাট একটি কার্নিসের দিকে। দেয়ালের ভেতরে বসানো জানলাগ্নলো ফাটলের মতো লম্বা ও সর্ন। ক্রমশ সর্ন হয়ে যাওয়া দ্নটো আঁশওয়ালা থাম-দেওয়া প্রবেশপথ, নিমীলিত চোখ, অর্ধশায়িত ব্রোঞ্জের ম্নর্তি খোদাই করা তাতে। দালানের সামনের দিকটা জ্নড়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল নিচু একটি দরজায়। দেয়ালের বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড়ের মধ্যিখানে লতানে গাছের শ্নকনো জাল। দালানটা দেখতে বিরাট কবরের মতো।

ধাতুর তৈরি দরজাটায় কাঁধ লাগিয়ে চাড় দিল গ্নসেভ। কিঁচকিঁচ শব্দে সেটা খ্নলে গেল। অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে

বড়ো একটা হলে তারা এসে পড়ল। কাঁচের ডোম থেকে পাতলা আলো এসে পড়েছে হলটায়। ঘরটা বলতে গেলে প্রায় ফাঁকা। কয়েকটা টুল উল্টে পড়ে আছে, কালো ধুলোভরা কাপড়ে ঢাকা নিচু একটা টেবিল। পাথরের মেঝেতে ভাঙা কাঁচের বাসন ছড়ানো, আর দরজার কাছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র বা কলকব্জা, চাকতি, গ্লোব ও ধাতুর জালে তৈরি। সবকিছু ধূলি ধূসর।

ফুটফুট সোনালি ছোপ-দেওয়া পীতাভ দেয়ালে ধূলিজালের মধ্য দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে। দেয়ালের ধারে বড়ো এক ফালি মোজেইকের কাজ, দৃশ্যগুলির বিষয়বস্তু স্পষ্টত ঐতিহাসিক নানা ঘটনা—হলদে-চামড়া ও লাল-চামড়া জীবেদের মধ্যে লড়াই: সমুদ্রে কোমর অবধি আমগ্ন মানুষের মতো একটি মূর্তি, সেই একই মূর্তি নক্ষত্রলোকে উড্ডীন; যুদ্ধের দৃশ্য, শিকারী জন্তুদের সঙ্গে লড়াই; অদ্ভুত দেখতে পশুদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখালের দল; গেরস্থালির দৃশ্য; শিকারের ছবি; নাচ; জন্ম মৃত্যুর ক্রিয়া আচার। বিরস মোজেইক দরজার ওপরে শেষ হয়েছে বিরাট গোল একটি জলাধারের ছবিতে।

'অদ্ভুত, অদ্ভুত,' বলে লস মোজেইকটা ভালো করে দেখার জন্য একটা কৌচে উঠল। 'বার বার মানুষের একটা অদ্ভুত মাথা এঁকেছে। অদ্ভুত ব্যাপার...'

ইতিমধ্যে আর একটা দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছে গুসেভ। সেটা পেরিয়ে অন্দরের সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষে

খিলান-দেওয়া চওড়া বারান্দা, ধূলোর কণাভরা আলোয় উজ্জ্বল।

দেয়াল বরাবর আর কুলুঙ্গিতে পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি, মাথা, মুখোস, নানা পাত্রের টুকরো। শ্বেত পাথর ও ব্রোঞ্জের দরজা পেরিয়ে নিভৃত কক্ষ।

নিচু ছাদ, ছাতা-ধরা স্বল্পালোকিত ঘরগুলি খুঁটিয়ে দেখবে বলে ঠিক করে ফেলেছে গুসেভ। একটাতে দেখল সাঁতারের জায়গা, জল নেই, তলায় মরা মাকড়সা। অন্য একটা ঘরে সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটা ভাঙা আয়না। মেঝেতে পচা ন্যাকড়া ও ওল্টানো আসবাবপত্রের স্তূপ, কাপড় রাখার জায়গায় নানা ধরনের পোষাকের জীর্ণ অবশিষ্টাংশ।

তৃতীয় ঘরে স্কাইলাইটের নিচে মঞ্চের ওপর চওড়া কৌচ। কৌচ থেকে মেঝেতে আলম্বিত একটি মঙ্গলগ্রহবাসীর কঙ্কাল। ভয়ঙ্কর লড়াই-এর চিহ্ন জায়গাটায় সর্বত্র। কোণে আর একটি কঙ্কাল জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে।

জঞ্জালের মধ্যে গুসেভ কয়েকটা মুদ্রার মতো ধাতব জিনিস পেল, মেয়েদের গয়নার মতো অনেকটা, আর রঙীন পাথরের ছোট কয়েকটি পাত্র। এককালে কঙ্কালের পরিধানে যেটা ছিল সেই পচা কাপড়ের ফালি থেকে গুসেভ গাঢ় সোনালি রঙের দুটো বড়ো পাথর তুলে নিল, ছোট শিকলিতে তারা বাঁধা। কবোষ্ণ দীপ্তি পাথর দুটোয়।

'কাজ দেবে এগুলো,' বিড়বিড়িয়ে বলল গুসেভ। 'মাশাকে দেওয়া যাবে।'

বারান্দার মূর্তিগুলো ভালো করে দেখছিল লস। তীক্ষ্ণ নাসা মঙ্গলগ্রহবাসীদের মাথা, অতিকায় সামুদ্রিক নানা জীবের মূর্তি, রঙীন মুখোস আর নানা পাত্র, আকারে ও কারুকার্যে সেগুলোর বিচিত্র সাদৃশ্য আছে ইক্রুশ্‌কান দু-হাতল পাত্রের সঙ্গে। এগুলির মধ্যে তার চোখে পড়ল এলোমেলো চুল, বর্বর রুক্ষ মুখ একটি নগ্ন নারীর বড়ো মূর্তি। স্তনদুটি তীক্ষ্ণাগ্র, অনেকখানি ছাড়াছাড়ি। মাথায় সোনালি তারার টায়রা কপালে নেমেছে হালকা অনুবৃত্তে। ছোট দুটো গোলোক তাতে খচিত — একটি চুনি-লাল, অন্যটির রঙ ইটের মতো। মেয়েটির বাসনাতীব্র উদ্ধত মুখ অদ্ভুত চেনা ঠেকল।

মূর্তিটির পাশে তারের জাল-দেওয়া অন্ধকার কুলুঙ্গি। জালে আঙুল ঢুকিয়ে দিল লস, কিন্তু কোনো ফল হল না। দেশলাই জ্বালিয়ে উঁকি মেরে দেখল। তাকিয়ার অবশিষ্টাংশে পড়ে আছে সোনালি একটা মুখোস। গালের হাড় চওড়া, প্রশান্ত নিমীলিত চোখ একটি মানুষের মুখোস সেটা। বাঁকা ওষ্ঠদেশে মৃদুহাসি লেগে আছে। পাখির ঠোঁটের মতো ধারালো নাক। ভুরুর মাঝে একটু ফুলো, বড়ো গঙাফড়িঙের চোখের মতো। প্রথম হলের মোজেইকে যে মূর্তিটা তার শিরভাগ এটা।

বিচিত্র মুখোসটা ভালো করে দেখতে গিয়ে দেশলাই-এর

অর্ধেক কাঠি খরচ করে ফেলল লস। পৃথিবী ছাড়ার কিছু দিন আগে এ রকম মুখোসের ফটোগ্রাফ সে দেখে: সেগুলো আবিষ্কৃত হয় নাইগার নদীতীরে বিরাট নানা সহরের ধ্বংসস্তূপে, আফ্রিকার সেই অংশ যেখানে লুপ্ত একটি সংস্কৃতির নানা চিহ্ন থেকে একটি জাতির রহস্যময় বিলুপ্তির কথা অনুমান করা হয়।

বারান্দায় একটি পাশ-দরজা হাট করে খোলা। একটি উঁচু-ছাদ দীর্ঘ ঘরে প্রবেশ করল লস, ভেতরে গ্যালারি ও জাফরি-কাটা বারান্দা। গ্যালারির ওপরে ও গ্যালারি পেরিয়ে বই-এর আলমারি আর তাক, সেখানে মোটা মোটা ছোট বই। ধূসর দেয়ালে সার বেঁধে বসানো পেছনে সোনালি মার্কা বইগুলি। কয়েকটা বই-এর আলমারিতে ধাতুর চৌবাচ্চার মতো ছোট আধার আর চামড়া বা কাঠে বাঁধানো বই। আলমারি, তাক আর অন্ধকার কোণ থেকে নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে আছে বলিকীর্ণ মুখ, টেকো মাথা মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞানীদের আবক্ষ মূর্তি। পাশে গোল পর্দা-লাগানো কয়েকটা দেরাজ-আলমারি আর ভারি আসন ঘরের এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে।

রুদ্ধশ্বাসে এই ছাতা-ধরা রত্নাগার দেখতে লাগল লস। বইগুলিতে কতো শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান।

একটা তাকের কাছে গিয়ে সাবধানে একটা বই বের করে নিল। পাতাগুলো সবুজাভ, অক্ষরগুলো হালকা-বাদামি রঙের জ্যামিতিক সংখ্যার মতো। যন্ত্রপাতির নকসা-আঁকা একটি বই

পকেটে রাখল, পরে ভালো করে দেখা যাবে। ধাতুর আধারগুলোতে হলদে চোঙ্গ, প্রাচীনকালের ফোনোগ্রাফ রেকর্ড যেন। নখের আঁচড় কাটলে শব্দ করে হাড়ের মতো, কিন্তু ওপরটা কাঁচের মতো মসৃণ। পর্দা-দেওয়া দেরাজ আলমারির ওপর একটা চোখে পড়ল। বোঝা যায় কেউ সেটাকে ব্যবহার করতে যাচ্ছিল, এমন সময় হামলা শুরু হয় বাড়িতে।

কালো একটা বই-এর আলমারি খুলে চামড়ায় বাঁধানো পোকা-খাওয়া একটি বই বের করে লস জামার হাতা দিয়ে সযত্নে ধুলো ঝেড়ে নিল। কালের প্রকোপে পীত জীর্ণ পাতাগুলো পুঁথির মতো লম্বা ও খাড়া, হাতপাখার মতন ভাঁজ করা যায়। একটা পাতা পড়েছে অন্যটায়, হাতের নখের আকারের রঙীন ত্রিভুজে ভর্তি সেগুলো, ত্রিভুজগুলো বাঁ থেকে ডাইনে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে গিয়ে অসরল রেখায় থেকে থেকে নেমে গিয়ে জোট পাকিয়েছে। নকসা ও রঙ রকমারি। কয়েক পাতা নিচে ত্রিভুজগুলো রকমারি রঙীন ও নানা আকারের বৃত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে, দুটোতে মিলিয়ে বিভিন্ন নকসার সৃষ্টি করেছে। পাতা থেকে পাতায় বিস্তৃত এই রঙ-বদলানো ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ ও জটিল মূর্তির মিশ্রিত রূপ। লসের কানে এল অপরূপ একটি সুর, প্রায় শোনা যায় না।

বইটি বন্ধ করে স্বপ্নালসভাবে বই-এর আলমারিতে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লস, নতুন অনুভূতিতে সে রোমাঞ্চিত, বিচলিত। গান-গাওয়া বই এটি।

'মুস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ!' ডাক শোনা গেল গুসেভের, ফাঁকা বাড়িতে গমগমে তার গলার আওয়াজ। 'শীগগির আসুন, শীগগির!'

বারান্দায় বেরিয়ে লস অন্যপ্রান্তে দোরগোড়ায় দেখল গুসেভকে। মুখে তার ভীরু মৃদু হাসি।

'এখানে কী, দেখুন।'

'আধো-অন্ধকার একটি সরু ঘরে সে লসকে নিয়ে গেল। ঘরের অন্যদিকের দেয়ালে বড়ো চৌকোণা সাদা একটি আয়না, সামনে কয়েকটা টুল আর হাতাওয়ালা চেয়ার।

'দড়িতে টাঙ্গানো গোল ছোট হাতলটা দেখছেন? সোনা ভেবে ছিঁড়ে নিতে গিয়েছিলাম। কী ব্যাপার দেখুন।'

হাতলটায় টান দিল গুসেভ। আলো হয়ে উঠল আয়নাটা, বুকে দেখা দিল ধাপে ধাপে বড়ো বড়ো দালান-বাড়ির বহির্লেখা, অস্তরবির আলোয় ঝকঝকে জানলার শার্সি, উড়ন্ত পতাকা। জনতার ক্ষীণ গর্জনে ভরে গেল ঘর। একটা ডানাওয়ালা ছায়া আয়নার ওপর ভেসে এসে মুছে দিল সহরটাকে। হঠাৎ ঝলকে উঠল আয়নার কাঁচ। মেঝেতে চড়চড় শব্দ, ম্লান হয়ে এল আয়না।

'সর্ট সার্কিট,' গুসেভ বলল। 'যাওয়া দরকার এবার, মুস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। রাত হতে চলল।'

সূর্যাস্ত

কুয়াশার ঝাপসা সরু ডানা মেলে ক্রমশ হেলে পড়ছে সূর্য।

তাড়াতাড়ি মাঠ হয়ে চলল দুজনা খালপাড়ের দিকে। ম্লান আলোয় আরো নির্জন, আরো বন্য দেখাচ্ছে মাঠটা। মাঠের নিকট প্রান্তে দ্রুত গতিতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সূর্য, অস্তাচলে রেখে গেল ঘোর রক্তাভা। তীক্ষ্ন রেখায় আলো হয়ে উঠল অর্ধেক আকাশ, তারপর খুব তাড়াতাড়ি ছাই-এর মতো ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেল রেখাগুলো। আকাশের চেহারা কেমন যেন অস্বচ্ছ।

মঙ্গলগ্রহের একটু ওপরে সূর্যাস্তের ধূসর আভায় দেখা দিল বড়ো ও লাল একটি তারা। ক্রুদ্ধ চোখের মতো তার দীপ্তি। শুধু তার ভয়ংকর রেখায় মুহূর্তের জন্য অন্ধকার আলো হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে অদ্ভুত উঁচু আকাশমণ্ডল ভরে গেল নক্ষত্রে — ঝকঝকে সবুজাভ নক্ষত্রপুঞ্জের হিম আলো চোখে লাগে। ঊর্ধ্বগামী সেই জ্বলন্ত লাল তারাটি আরো উজ্জ্বল।

খালপাড়ে এসে দাঁড়াল লস। আঙুল দিয়ে তারাটিকে দেখিয়ে বলল:

'আমাদের পৃথিবী।'

টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছল গুসেভ। মাথা অনেকখানি হেলিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ভাসমান সুদূর জন্মভূমির দিকে। মুখে এল আর্ত বিষণ্ণ ভাব।

'পৃথিবী বটে,' বেরোল তার মুখ থেকে।

তারার আলোয় ঝাপসা ফনিমনসা-কীর্ণ সমভূমির ওপর প্রাচীন সেই খালের পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে।

তীক্ষ্ন দিগন্তরেখার ওপর দেখা দিল কাস্তের মতো রুপোলি তারা, চাঁদের কাস্তের চেয়ে ছোট। এল ফনিমনসা মাঠের ওপর। দীর্ঘ ছায়া মাটিতে বিছাল করতলের মতো দেখতে গাছগুলো।

কনুই-এর খোঁচা দিয়ে গুসেভ বলল:

'পেছনে একবার তাকিয়ে দেখুন।'

পেছনে, বন্ধুর মাঠের ওপর, ঝোপঝাড় আর ধ্বংসস্তূপের ওপর জ্বলছে মঙ্গলগ্রহের দ্বিতীয় উপগ্রহ। চাঁদের চেয়ে ছোট পীতাভ গোলকটি দংষ্ট্রাকরাল পাহাড়গুলোর পেছনে নেমে গেল। আলোয় চিকচিক করে উঠল পাহাড়ের গায়ে সেই চাকতিগুলো।

'অদ্ভুত রাত্রি! স্বপ্নের মতো,' ফিসফিসিয়ে বলল গুসেভ।

পাড় থেকে দুজনে সাবধানে নামল ফনিমনসার মাঠে। ছায়ার মতো কী একটা সড়সড় করে উঠল পায়ের তলায়।

মাটিতে দুটো উপগ্রহের আলোছায়ায় গড়িয়ে গেল ঝাঁকড়া একটা বল। খড়খড় করে উঠল কী একটা। তারপর কিসের কিঁচকিঁচানি। পাতলা, তীক্ষ্ণ সে আওয়াজে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। নড়ে উঠল ফনিমনসার ঝকঝকে পাতাগুলি। মুখে ঠেকছে মাকড়সার জাল, ঠিকরে যাচ্ছে জালের মতো।

হঠাৎ খ্যানখ্যানে সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদে দীর্ণ হল রাত্রি। থেমে গেল আওয়াজটা। গভীর স্তব্ধতা। বিতৃষ্ণা ও বিভীষিকায় কেঁপে উঠে গুসেভ ও লস মাঠ হয়ে দৌড়ল, জীবন্ত হয়ে ওঠা কম্পমান গাছগুলো বড়ো বড়ো লাফে পেরিয়ে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গ্রহজাহাজ। সেই ঊর্ধ্বগামী কাস্তের মতো তারার আলোয় চিকচিক করছে জাহাজের ইস্পাত আবরণ। দৌড়িয়ে সেটার পাশে গিয়ে বসে পড়ল দুজন, হাঁফ ধরে গেছে ভয়ানক।

'এই ভূতুড়ে জায়গায় রাত্তির বেলায় আমি বেড়াচ্ছি না বাবা,' গুসেভ বলে উঠল। পোর্টহোলের ঢাকনা খুলে জাহাজের ভেতর সেঁধিয়ে গেল সে।

গড়িমসি করে লস রয়ে গেল। কান পেতে তাকিয়ে রয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল নক্ষত্রের মধ্যে উড়ন্ত একটি হাওয়াই জাহাজের ডানাওয়ালা অদ্ভুত রেখা।

লসের পৃথিবী দর্শন

মিলিয়ে গেল হাওয়াই জাহাজের ছায়া। নিজের জাহাজের ভেজা গায়ে উঠে পাইপ ধরিয়ে লস তাকিয়ে রইল তারাগুলোর দিকে। হিমেল হাওয়ায় শরীরে অল্প কাঁপুনি। গ্রহজাহাজের ভেতর লব্ধ জিনিসগুলি সরিয়ে রাখতে রাখতে গুসেভের বিড়বিড়ানি। তারপর পোর্টহোল থেকে মাথা বের করে সে বলল:

'যাই বলুন না কেন, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, এগুলো খাঁটি সোনার। পাথরগুলো তো একেবারে অমূল্য জিনিস। পেয়ে ছুঁড়ীটা কী খুশি না হবে!'

মাথা সরিয়ে নিল গুসেভ। কিছুক্ষণের মধ্যে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। সুখী লোক বটে।

লসের কিন্তু ঘুম এল না। বসে বসে পাইপের বাঁট মুখে দিয়ে স্বপ্নালসভাবে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। শয়তান জানে ব্যাপারখানা কী! গঙাফড়িঙের মতো সেই তৃতীয় চোখ সুদ্ধ সোনালি মুখোসগুলো মঙ্গলগ্রহে হাজির হল কোথা থেকে? আর মোজেইকটা? সমুদ্রে ডুবন্ত, নক্ষত্রলোকে উড্ডীন সেই দানবগুলো? অনুবৃত্তের সেই চিহ্ন? চুনির সেই গোলকটা কি পৃথিবীর আর ইটের গোলকটি মঙ্গলগ্রহের প্রতীক? দুটি দুনিয়া করায়ত্ত, তার চিহ্ন? অকূল পাথার। আর সেই গান-গাওয়া বইটা? ছায়া দর্পণে প্রতিফলিত সেই

অদ্ভুত সহর? কেন, সমস্ত জায়গাটা কেন এত পোড়ো আর বিষণ্ণ?

গোড়ালিতে ঠুকে পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলল লস। ভোর কি কখনো হবে না? মঙ্গলগ্রহের সেই উড়ন্ত বাসিন্দেটি তাদের আগমন সংবাদ নিশ্চয় দিয়েছে কোনো বসতিতে। হয়ত এখনি তারা খোঁজে বেরিয়েছে। তাদেরি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাওয়াই জাহাজটা?

আকাশে চোখ মেলে দেখল লস। উচ্চ সীমার কাছাকাছি এসে লাল সেই তারাটির -- পৃথিবীর — আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সে আলো বুকে নাড়া দেয়।

ঠিক এমনি বিষণ্ণ হিম হৃদয়ে পৃথিবীতে নিজের কামারশালার দরজায় দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বগামী মঙ্গলগ্রহের দিকে বিনিদ্র রাত্রে তাকিয়ে ছিল সে। মাত্র দু'রাত আগে। সে সময়, পৃথিবীতে সে সময় আর এখানকার মধ্যে মাত্র একদিনের ব্যবধান।

হায় রে, সেই পৃথিবী, কী সবুজ পৃথিবী, এই মেঘের আড়ালে ঢাকা, এই আলোয় আলো, অতল জলের পৃথিবী, সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর, তবু তারা কতো না ভালোবাসে তাকে — জন্মভূমিকে ...

•

ঠাণ্ডায় মাথা অসাড় লাগছে। পৃথিবীর এই লাল গোলক, ঠিক যেন জ্বলন্ত হৃদয়। নশ্বর মানুষ প্রাণলোকে আসে মুহূর্তের জন্য; আর সে — লস — কি না একলা হাতে,

উন্মাদ ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এই মরুভূমিতে বসে আছে নিঃসঙ্গ দানবের মতো। নিঃসঙ্গতা, এই হল নিঃসঙ্গতা। সে কি এই চেয়েছিল? নিজের কাছ থেকে সে কি চলে আসতে পেরেছে?..

ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে শরীর কাঁপছে। পাইপ পকেটে গুঁজে গ্রহজাহাজে উঠে লস শুয়ে পড়ল গুসেভের পাশে। নাক ডাকছে গুসেভের। এই সহজ মানুষটি মাতৃভূমিকে প্রতারণা করেনি, মহাশূন্যে নবম লোকে উড়ে এসে ঠিক পৃথিবীতে যেমন তেমনি আছে। শান্ত তার ঘুম, বিবেকে কোনো জ্বালা নেই।

গরমে আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল লস। স্বপ্নে সান্ত্বনা এল। স্বপ্নে দেখল পৃথিবীর একটি নদীতীর, হাওয়ায় বার্চ গাছের মর্মর, মেঘ, জলে আলোর খেলা, আর ওপার থেকে শুভ্র দীপ্ত কে যেন তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। প্রপেলারের কর্কশ ঘড়ঘড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লস ও গুসেভের।

মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা

ভোরের আকাশে কাটনা-কাটা সুতোর ফেটির মতো ভেসে চলেছে ঝকঝকে লাল-বেগুনি মেঘ। রৌদ্রালোকিত একটি উড়োজাহাজ নামছে, গভীর নীল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনো দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বেগুনি-লাল

কিনারার ওদিকে। তিন-মাস্তুল কাঠামোর দু'পাশে তিনটি করে সরু, উঁচু ডানা। জিনিসটা দেখতে বিরাট গুবরে পোকার মতো।

ভিজে ঝকঝকে চেহারার রুপোলি জাহাজটি মেঘ ভেদ করে ভেসে এল ফনিমনসাগুলোর উপর। দু'দিকের খাটো মাস্তুলের ডগায় খাড়া স্ক্রু ঘড়ঘড় করে ঘুরে জাহাজটিকে মাটি থেকে একটু উঁচুতে রেখেছে। দু'পাশ থেকে নামানো হল দুটি মই, জাহাজটা বসল তাতে ভর দিয়ে। স্ক্রুগুলো থেমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একের পর-এক মঙ্গলগ্রহের রোগা ছোটখাটো বাসিন্দারা, সবার মাথায় একই রকমের ডিমের আকারের হেলমেট, গায়ে রুপোর ঢিলে জ্যাকেট। গলা আর চিবুক মোটা কলারে ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে খাটো আটোম্যাটিক রাইফেল, তাতে মাঝামাঝি চাকতি বসানো।

গ্রহজাহাজের কাছে ভুরু কুঁচকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুসেভ, রিভলভারে হাত রেখে। দেখল মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা দু'লাইনে সার বেঁধে দাঁড়াল। মোড়া হাত বরাবর বন্দুকের মুখগুলো।

'বুরবকগুলো, মেয়েদের মতো বন্দুক ধরেছে দেখুন,' গরগর করে বলল গুসেভ।

বুকে হাত মুড়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল লস। জাহাজ থেকে সর্বশেষে যে নামল তার গায়ে কালো একটা আলখাল্লা

কাঁধ থেকে নেমে এসেছে ভাঁজে ভাঁজে। খালি মাথায় টাক, কপালে আব, দাড়িগোঁফহীন লম্বা মুখের রঙ প্রায় নীল।

দু'সারি সৈন্যদের পেরিয়ে দলদলে মাটি ভেঙে সে এল। ঠেলে বেরিয়ে আসা হালকা রঙের চোখ মেলে হিম দৃষ্টিতে তাকাল গুসেভের দিকে। তারপর কেবল লসের দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনের কাছে এসে বড়ো আস্তিন-ঢাকা ছোট হাত তুলে পাতলা, খনখনে গলায় বলল:

'তালৎসেৎল!'

চোখদুটো তার আরো বিস্ফারিত হয়ে গেল, চাপা উত্তেজনার ঝিলিক তাতে। পাখির ডাকের মতো শব্দটি আবার হেঁকে আকাশের দিকে দেখাল রাজকীয় আদেশের ভঙ্গিতে। লস বলল:

'পৃথিবী।'

'পৃথিবী,' ভুরু কুঁচকে কষ্ট করে পুনরুক্তি করল মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দে। কপালের আবগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠল। এক পা বাড়িয়ে, কেশে রাগতভাবে বলল গুসেভ:

'আমরা এসেছি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে, রুশী আমরা। দেখছেন তো, এখানে বেড়াতে এসেছি, নমস্কার,' টুপি ছুঁয়ে যোগ করল, 'আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না, আপনারাও আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না ... নাঃ, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, একটা কথাও মাথায় ঢোকেনি ওর।'

মঙ্গলগ্রহবাসীর বুদ্ধিদীপ্ত নীল মুখের কোনো পরিবর্তন হল না, শুধু দুটো ভুরুর মাঝখানে লাল একটা ছোপ ফুটতে আরম্ভ করল — মানসিক ক্লেশের লক্ষণ। অমায়িকভাবে সূর্যের দিকে দেখিয়ে অদ্ভুত কিন্তু চেনা একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে:

'সয়াৎস্‌র।'

তারপর মাটি দেখিয়ে, যেন গোল একটা জিনিসকে আলিঙ্গন করছে এমনভাবে হাত নাড়িয়ে বলল:

'তুমা।'

এরপর পেছনে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়ানো সৈনিকদের একজনকে দেখাল, তারপর গুসেভকে, নিজেকে এবং লসকে দেখিয়ে বলল:

'শখো।'

কয়েকটা জিনিসের নাম বলে শুনে নিল পৃথিবীর ভাষায় তাদের কী বলে। লসের কাছে এসে অনামিকা দিয়ে তার দুটো ভুরুর মাঝখানে গুরুগম্ভীরভাবে স্পর্শ করল। প্রতিনমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লস। ঠিক সে ভাবে গুসেভকে স্পর্শ করাতে সে টুপিটা চোখের কাছে নামিয়ে বলল:

'ব্যাভারটা দেখুন, আমরা যেন জানোয়ার।'

গ্রহজাহাজের কাছে গিয়ে চাপা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মঙ্গলগ্রহবাসী। মনে হল জিনিসটা কী বোধগম্য হয়েছে;

কালিঝুল-মাখা সেই ইস্পাতের বিরাট ডিমটিকে অত্যন্ত কৌতূহলভরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। হঠাৎ হাত তুলে, সৈন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, দ্রুত তাদের কী যেন বলল।

'আইয়ু,' আর্তকণ্ঠে জবাব দিল তারা।

মঙ্গলগ্রহবাসী কপালে করতল ঠেকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করল একটা, উত্তেজনা সামলে উঠে ফিরে তাকাল লসের দিকে; আগেকার সে সংযত গাম্ভীর্য আর নেই। যে চোখে তাকাল লসের দিকে সে চোখ অন্ধকার আর আর্দ্র।

'আইয়ু,' বলল সে, 'আইয়ু উতারা শখো, দাৎসিয়া তুমা রা গেও তালৎসেৎল।'

এরপর হাতে চোখ ঢেকে নিচু হয়ে নমস্কার জানাল। একটি সৈনিককে ডেকে তার কাছ থেকে সংকীর্ণ ফলা চেয়ে নিয়ে গ্রহজাহাজের ওপর আঁচড় কেটে ছবি আঁকল একটা ডিমের, তার ওপর ঢাকনি আর পাশে সৈনিকের মূর্তি। মঙ্গলগ্রহবাসীর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে গুসেভ বলল:

'জাহাজটার ওপর একটা তাঁবু খাটিয়ে পাহারাদার রাখতে চায়। কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো মেরে না দেয় আবার। ঢাকনাটার কোনো চাবি নেই।'

'কী বাজে বকছেন, আলেক্সেই ইভানভিচ! বোকার মতো কথা বলবেন না।'

'কিন্তু আমাদের সব যন্ত্রপাতি আর জামাকাপড় ওখানে যে ... আর আমার কথা যদি বলেন — ওই সৈনিকটার চেহারাটা একবার দেখুন না — আমি হলে ওর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকতাম।'

সসম্মানে, মনোযোগসহকারে ওদের কথাবার্তা শুনছিল মঙ্গলগ্রহবাসী। লস ইসারা করে জানিয়ে দিল গ্রহজাহাজের ওপর তাঁবু খাটাতে কোনো আপত্তি নেই। সরু ঠোঁটে হুইস্‌ল লাগিয়ে বাজাতে হাওয়াই জাহাজ থেকে ঠিক সে-রকম তীক্ষ্ণ সুরে জবাব দিল আর একটি হুইস্‌ল। এরপর মঙ্গলগ্রহবাসী আরো কত কী ইসারা করল। জাহাজের মধ্যেকার দীর্ঘ মাস্তুল থেকে ওপরে উঠল সরু সরু তার, পোকামাকড়ের শুঁয়ার মতো, আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে।

হাওয়াই জাহাজে যেতে লস ও গুসেভকে ইঙ্গিত করল মঙ্গলগ্রহবাসী। সৈন্যরা কাছে এসে গোল হয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে চেয়ে মুখ ভেংচে গুসেভ গ্রহজাহাজে উঠল, জামাকাপড়ের দুটো থলি বের করে পোর্টহোল বন্ধ করে সেটা দেখিয়ে রিভলভারে মারল দু'একটা টোকা। তারপর সৈন্যদের দিকে আঙুল নাড়িয়ে মুখে ভয়ংকর একটা ভাব আনল। অত্যন্ত অবাক হয়ে তারা গুসেভের গতিবিধি দেখতে লাগল।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, বন্দী হই বা অতিথি হই, হাল

ছেড়ে দিতে হবে,' মৃদু হেসে লস বলে কাঁধে থলি চাপিয়ে নিল। দুজনে চলল হাওয়াই জাহাজের দিকে।

মাস্তুলের খাড়া স্ক্রুগুলো ভীষণ ঘড়ঘড় করতে শুরু করল। ডানাদুটো নেমে গেল, গর্জন করে উঠল প্রপেলারগুলো। অতিথি, বা বন্দী দুজন, পলকা সিঁড়ি বেয়ে উঠল উপরে।

পাহাড়ের ওপারে

মঙ্গলগ্রহের অনতি ঊর্ধ্বে থেকে হাওয়াই জাহাজ চলল উত্তর-পূবে। ডেকে লস ও টেকো লোকটি। গুসেভ নিচে নেমে গেল সৈন্যদের কাছে।

খড়-রঙা, আলোভরা একটা কামরায় ঢুকে হাতলওয়ালা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে সে খাড়া নাক, খাটো সৈন্যদের মনোযোগসহকারে দেখতে লাগল। পাখির মতো তাদের লালচে চোখ পিটপিট করছে। তারপর গুসেভ পকেট থেকে বহুমূল্য টিনের সিগারেট কেসটা বের করে (লড়াই-এর সাত বছরের মধ্যে কখনো সেটা হাতছাড়া করেনি) ঢাকনাতে টোকা মারল কয়েকটা, যেন বলতে চায়, 'সিগারেট চলবে না কি, দোস্ত?' সিগারেট বাড়িয়ে দিল তাদের দিকে।

ভয়ে ঘটঘট করে মাথা নাড়ল মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা। যাই হোক, একজন সিগারেট নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, শুঁকল একবার, তারপর সাদা পেন্টুলেনের পকেটে রেখে দিল। গুসেভ

সিগারেট ধরাতে তারা হটে গিয়ে ভীরু গলায় ফিসফিস করে উঠল:

'শখো তাও তাভ্‌রা, শখো-ওম্‌।'

'শখো'টা ধোঁয়া গিলছে দেখে তাদের ধারালো লালচে মুখে কী না বিভীষিকা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেল তাদের, শান্ত হয়ে আবার কাছে এসে ভিড় জমাল।

মঙ্গলগ্রহের ভাষা জানে না বলে খুব বিচলিত নয় গুসেভ। সে নতুন বন্ধুদের গল্প বলতে লাগল, রাশিয়ার গল্প, যুদ্ধ ও বিপ্লবের গল্প, নিজের নানা কীর্তিকলাপের গল্প।

'গুসেভ — এটা আমার পদবী। শব্দটা এসেছে "হাঁস" থেকে — পৃথিবীর বড়ো গোছের একটা পাখি আর কি, সে রকম পাখি আপনারা বোধহয় চোখে দেখেননি কখনো। আমার নাম আলেক্সেই ইভানভিচ। শুধু রেজিমেণ্ট নয়, গোটা একটা অশ্বারোহী ডিভিসনের ভার ছিল আমার ওপর। বীর আমি, ভয়ংকর বীর। তলোয়ার বের করে — মেসিনগানটানের পরোয়া আমি করি না — ওদের কচু কাটা করি আর হাঁক দিই, "ওরে বেজন্মারা, এবার অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দে!" আমি নিজেও জখম হয়েছিলাম, কিন্তু বিলকুল পরোয়া করিনি। আমাদের ফৌজী আকাদেমীতে একটা বিশেষ পাঠ্যধারা আছে, তার নাম — "তরবারি চালনায় গুসেভী রীতি", বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমাকে একটা বড়ো দলের ভার দিতে চেয়েছিল,' টুপিটা

পেছনে হেলিয়ে মাথা চুলকে গুসেভ বলে চলল, 'আমি বললাম, না, আর সখ নেই, মাপ করবেন। সাত বছর লড়াই করার পর ঘেন্না ধরে যায়। আর তখন ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ আমাকে ডাকলেন ওঁর সঙ্গে ওড়ার জন্য। বললেন, "আলেক্সেই ইভানভিচ, আপনি না থাকলে হয়ত মঙ্গলগ্রহে পৌঁছতে পারব না।" ব্যস, তাই এখানে হাজির।'

অবাক হয়ে শুনছে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা। একজন একটা ফ্লাস্ক নিয়ে এল। তামাটে রঙের তরল জিনিস, মৃগনাভির গন্ধ। থলি হাতড়ে গুসেভ ভোদকার একটা পাঁইট বোতল বের করল। সেটা খেয়ে মঙ্গলগ্রহবাসীদের মুখে যেন খই ফুটল। তাদের পিঠ চাপড়ে বেশ হৈহল্লা চালাল গুসেভ। তারপর পকেট থেকে নানা টুকিটাকি জিনিস বের করে অদলবদল করতে চাইল তাদের সঙ্গে। মহানন্দে মঙ্গলগ্রহবাসীরা ওর পেন্সিলকাটা ছুরি, পেন্সিলের ডগা আর ফাঁকা কার্তুজ দিয়ে বানানো সিগারেট-লাইটারের বদলে সোনার নানা জিনিস দিয়ে দিল।

এদিকে হাওয়াই জাহাজের তারের রেলিঙে ভর দিয়ে লস নিচের অপসৃয়মান, বন্ধুর বিষণ্ণ সমভূমির দিকে তাকিয়ে দেখছে। আগের দিনে দেখা বাড়িটা চেনা গেল। যে দিকে চোখ যায়, শুধু ধ্বংসস্তূপ, ঝোপজঙ্গল আর মরা শুকনো খালের প্রসার।

নিচের মরুভূমির দিকে দেখিয়ে লস বুঝিয়ে দিল

এতখানি বন্ধ্যা জমি দেখে তার অবাক লাগছে। মঙ্গলগ্রহবাসীর ড্যাবড্যাবে চোখ হঠাৎ রাগে জ্বলে উঠল। একটা ইসারা করাতে হাওয়াই জাহাজটা আরো উঁচুতে উঠে অর্ধবৃত্তে পাক খেয়ে চলল দাঁতালো পাহাড়গুলির চূড়ার দিকে।

ঊর্ধ্বে উঠল সূর্য, মিলিয়ে গেল মেঘ। প্রপেলারের গর্জন, জাহাজটা ঘুরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাবলীল ডানাগুলোর নড়াচড়া আর কিচকিচ আওয়াজ, খাড়া স্ক্রুগুলোর ঘড়ঘড়। হাওয়ার শিস আর প্রপেলারের ঘড়ঘড় ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, লক্ষ্য করল লস। মোটর কাজ করে যাচ্ছে নিঃশব্দে। আর মোটর বলতে তো কিছু চোখে পড়ছে না। শুধু প্রত্যেকটা প্রপেলারের কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে গোল বাক্স, ইলেক্ট্রিক কলের বাক্সের মতো দেখতে, আর সামনের ও পেছনের মাস্তুলের উপরে রূপোলি তারের দুটি ফুলকি-ছড়ানো উপবৃত্তাকার ঝুড়ি।

মঙ্গলগ্রহবাসীর কাছে নানা জিনিসের নাম জেনে নিয়ে টুকে রাখল লস। তারপর কলকব্জার নকসার বইটা বের করে তাকে বলল জ্যামিতিক অক্ষরগুলি উচ্চারণ করতে। অবাক হয়ে বইটা দেখল মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দে। চোখদুটো আবার হিম হয়ে গেল, পাতলা ঠোঁটের কোণ কুঁকড়ে গেল অবজ্ঞায়। লসের কাছ থেকে সাবধানে বইটা নিয়ে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অনিবিড় হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লসের,

চোখে জল আসছে। দেখে মঙ্গলগ্রহবাসী নিচে নামার একটা সঙ্কেত করল। জাহাজটা তখন চলেছে রক্তলাল মরু পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। দক্ষিণ-পূব থেকে উত্তর-পশ্চিমে চওড়া শৈলশিরা সর্পিল রেখায় প্রসারিত। পাথুরে চূড়ার আকর ও ধাতুর চিকচিকে শিরায় ছায়া পড়ছে জাহাজের, ছায়া পড়ছে শৈবালাচ্ছন্ন খাড়া ঢালুতে, কুয়াশায় ভরা অতল খাদে, তুষারাবৃত চূড়ায় আর হিমবাহে। জায়গাটা বন্য, জনমানুষ বর্জিত।

'লিজিয়াজিরা,' পাহাড়গুলো দেখিয়ে বলল মঙ্গলগ্রহবাসী, ঝকঝক করে উঠল ধাতুতে-বাঁধা ছোট ছোট দাঁত।

নিচে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে লস মৃত গ্রহের একটা অংশে দেখা সেই শ্মশান দৃশ্যের কথা ভাবছে, এমন সময়ে নজরে পড়ল একটা খাদের বুকে পাথরখণ্ডে অসহায় পড়ে-থাকা একটা জাহাজের কাঠামো। চারিদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রূপোলি ধাতুর টুকরো। উদ্যত শৈলশিরা পেরিয়ে, একটু দূরে আর একটা জাহাজের ভাঙা ডানা উদ্যত। ডান দিকে গ্রানিট চূড়ায় বিদ্ধ তৃতীয় একটি জাহাজের ভগ্নাংশ। চারিদিকে বড়ো বড়ো ডানা, ভাঙা কাঠামো আর উদ্যত ফলার টুকরো। যুদ্ধ চলেছিল সেখানে; মনে হল অনুর্বর পাহাড়ে পরাজিত হয়েছে দানবেরা।

প্রতিবেশীর দিকে লুকিয়ে একবার তাকাল লস। কলার আঁকড়ে, প্রশান্তভাবে আকাশটা দেখে নিচ্ছে সে পাশে বসে।

সার বেঁধে দীর্ঘডানা পাখিরা উড়ে আসছে জাহাজের দিকে। হঠাৎ অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে আকাশের গভীর নীলে হলদে পাখা ঝকঝকিয়ে তারা মোড় ঘুরল। তাদের নামার পথ অনুসরণ করাতে লসের চোখে পড়ল পাহাড়ের গভীরে একটি গোল হ্রদের কালো বুক। পাড়ে পত্রবহুল ঝোপ। হলদে পাখিগুলো নামল জলের ধারে।

হঠাৎ ঢেউ খেলে টগবগ করে উঠল সেই হ্রদ, মাঝখান থেকে জলের ফোয়ারা উৎসারিত হয়ে আবার নেমে গেল।

'সয়াম,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মঙ্গলগ্রহবাসী।

একটা পর্বতমালার শেষাশেষি তারা এসে পড়েছে। বিক্ষুব্ধ উজ্জ্বল তাপ তরঙ্গের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে দেখা গেল ঝকঝকে বড়ো কয়েকটি হ্রদসুদ্ধ কানারি-হলদে সমভূমি। সেই অপরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন দূরসীমা দেখিয়ে স্বপ্নালস মৃদু হাসিতে বলল মঙ্গলগ্রহবাসী:

'আজোরা।'

আবার উপরে একটু উঠছে হাওয়াই জাহাজ। ভিজে মিঠে হাওয়া মুখে লাগছে লসের, গুনগুন করছে কানে। নিচের বিস্তৃত উজ্জ্বল সমভূমিতে আজোরা প্রসারিত। ঢেউ-খেলা খালের আঁকাবাঁকা রেখায় কীর্ণ, নারাঙি রঙের ঝোপজঙ্গল ও কানারি রঙের সরস জলামাঠের চাদর বিছানো আজোরা, অথবা আনন্দলোক — শৈশবের স্বপ্নে দেখা বসন্তের ছোট মাঠের মতো।

ধাতুর তৈরি চওড়া বজরা ভেসে চলেছে খালগুলিতে। পাড়ে ছোট ছোট সাদা বাড়ির সারি, সুন্দর বাগান পথ সেগুলোতে। চতুর্দিকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের মূর্তি — গুড়ি মেরে চলেছে। কেউ কেউ সমান ছাদ থেকে বাদুড়ের মতো লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে খাল পেরিয়ে যাচ্ছে, কেউবা যাচ্ছে ওপারের ঝোপজঙ্গলে। মাঠে ডোবা আর জলধারার ঝকঝকানি। আজোরা মোহিনী দেশ বটে।

সমভূমির প্রান্তে জলের বিরাট উজ্জ্বল প্রসার, সেখানে গিয়ে পড়েছে সমস্ত খালগুলির সর্পিল রেখা। সেদিকে চলেছে হাওয়াই জাহাজ। শেষ পর্যন্ত লস দেখল চওড়া ও সমান রেখা একটি খাল। কুয়াশায় অন্য পাড় অদৃশ্য, ঘোলাটে হলুদ জল অলসভাবে বয়ে চলেছে একটা পাথুরে ঢালু জায়গার পাশ দিয়ে।

হাওয়াই জাহাজ উড়ে চলেছে তো চলেছে। অবশেষে খালের শেষে একটি মসৃণ দেয়াল জল থেকে উঠে দুধারে আদিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেখা গেল। ক্রমশ বড়ো দেখাচ্ছে দেয়ালটা। চোখে পড়ে পাথরের প্রকাণ্ড চাঙড়, ফাটল থেকে বেরিয়ে আছে ঝোপঝাড় আর গাছ। প্রকাণ্ড একটি জলাশয়ের কাছে তারা এসে পড়েছে। থৈ থৈ জল। জলাশয়ের বুকে এখানে সেখানে ফেনিল ফোয়ারা উৎসারিত।

'রো,' অর্থপূর্ণভাবে আঙুল তুলে বলল মঙ্গলগ্রহবাসী।

পকেট থেকে নোট-বইটা টেনে তার আগের দিন

মঙ্গলগ্রহের বুকে নিজের আঁকা সরল রেখা ও বিন্দু নকসাগুলো খুঁজে বের করল লস। প্রতিবেশীকে নকসাটা দেখিয়ে নিচের জলাশয় দেখাল। ভুরু কুঁচকে মঙ্গলগ্রহবাসী নকসাটা খুঁটিয়ে দেখল, উত্তেজিতভাবে মাথা নেড়ে কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে একটা বিন্দু দেখাল।

রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে লস দেখল জলাশয় থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি বাঁকা ও দুটি সোজা খাল। হেঁয়ালির মানে তাহলে এই: মঙ্গলগ্রহের বুকের গোল দাগগুলো তাহলে জলাশয়, আর ত্রিভুজ ও অর্ধবৃত্তগুলি হল খাল। কিন্তু বিরাট দেয়ালগুলো বানাল কোন ধরনের জীব? সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সে নিচের ঠোঁটটা বাড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলল:

'তাও খাৎস্‌খা রো খামাগাৎসিৎল।'

পোড়া একটি সমভূমির ওপর দিয়ে তখন চলেছে হাওয়াই জাহাজ। সেখানে লাল-বেগুনি আঁচড় কেটেছে চতুর্থ একটি খাল, অত্যন্ত চওড়া আর শুকনো। খালের তলদেশে পরিষ্কার সারি বেঁধে গাছপালা বসানো হয়েছে। মঙ্গলগ্রহের বুকের সেই আবছা নকসায় খালের যে দ্বিতীয় দলটি দেখা যায় তার একটি রেখা এটা বোধহয়।

ছোট ছোট বন্ধুর পাহাড়ে শেষ হয়েছে সমভূমি। পেছনে জাফরি-কাটা মিনারের নীলাভ রেখা। হাওয়াই জাহাজের মাঝখানের মাস্তুলের ওপর আবার উঠল সরু সরু তারের শুঁয়া,

বেরুতে লাগল আগুনের ফুলকি। পাহাড়ের ওধারে জাফরি-কাটা মিনার আর দালানের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ঝাপসা সূর্যালোকে রুপোলি আলোছায়ার নকসায় অবশেষে দেখা দিল বিরাট একটি সহর।

মঙ্গলগ্রহবাসী বলল:

'সয়াৎসেরা।'

সয়াৎসেরা

ধাপে ধাপে সমান ছাদ, সবুজ আঙুরলতায় জড়ানো জাফরি-কাটা দেয়াল, লম্বাটে আয়নার মতো পুকুর আর পাহাড় ছাড়িয়ে স্বচ্ছ মিনার, সব নিয়ে সয়াৎসেরা হালকা-নীল রেখায় ঝাপসা দিগন্ত পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রসারিত। হাওয়াই জাহাজের দিকে সহরের উপর ঝাঁক বেধে উড়ে যাচ্ছিল অনেক কালো কালো বিন্দু।

যে খালটার গর্ভে গাছপালা, সেটা উত্তর দিকে চলে গেছে। সহরের পূব দিকে একটা পোড়া ফাঁকা মাঠ, ভাঙা পাথরের ছড়াছড়ি সেখানে। পরিত্যক্ত মাঠের এক প্রান্তে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটি মূর্তি, চিড়ধরা, শেওলায় আচ্ছন্ন; দীর্ঘ কালো ছায়া তার মাটিতে পড়েছে।

নগ্ন মানুষের মূর্তি সেটা, পাদুটো একসঙ্গে লাগানো, সংকীর্ণ উরুদেশে হাতদুটো চেপে রাখা। শিক-দেওয়া একটা

বেল্ট গিয়েছে বিরাট ছাতি হয়ে, একটা কান-ঢাকা হেলমেট মাথায়, তার চূড়োয় মাছের লেজের মতো চকচকে চিরুনি। চওড়া মুখ, বাঁকা ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখ নিমীলিত।

'মাগাৎসিৎল,' বলে আকাশের দিকে দেখাল মঙ্গলগ্রহবাসী।

দূরে মূর্তিটার পিছনে একটি বড়ো জলাশয় ও পয়োনালীর ধ্বংসাবশেষ। তাকিয়ে দেখে লস বুঝল যে সমভূমিতে ভাঙা পাথরের সব স্তূপ — ছোট ছোট পাহাড় আর খাত — একটি প্রাচীন সহরের অবশিষ্টাংশ। ঝকঝকে সেই হ্রদটা ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে নতুন সহর সয়াৎসেরা, ধ্বংসস্তূপের পশ্চিম দিকে।

কালো কালো বিন্দুগুলি কাছে এসে ক্রমশ বড়ো দেখাচ্ছে। মঙ্গলগ্রহের শত শত লোক তাড়াতাড়ি আসছে জাহাজটার দিকে, আসছে ডানাওয়ালা নৌকো আর আসনে, চটের তৈরি পাখিতে আর পারাসুট-লাগানো ঝুড়িতে চেপে।

প্রথমে এসে পড়ল চকচকে সোনালি সিগারের মতো একটা জাহাজ, চারটে ডানা গঙ্গাফড়িঙের মতো। হঠাৎ ঘুরে হাওয়াই জাহাজের উপর ভাসতে লাগল সেটা। ডেকে ভেসে এল ফুল আর রঙীন কাগজের ফালি, রেলিঙ থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে উত্তেজিত মুখ অনেকের।

দাঁড়িয়ে উঠল লস। দড়ি ধরে মাথা থেকে খুলে নিল হেলমেট। হাওয়ায় সাদা চুল ফুরফুর করে উড়ছে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল গুসেভ। ওপরের নৌকোগুলো

থেকে পুষ্পবৃষ্টি চলেছে। নীলচে মুখগুলো, কয়েকটা একটু কালো, কয়েকটা ইটের মতো লাল, তাতে উত্তেজনা আনন্দ ও ভয়ের ছাপ।

মন্থর হাওয়াই জাহাজকে এতক্ষণে ঘিরে ফেলেছে শত শত উড়ন্ত বাহন। পারাসুট-দেওয়া ঝোড়ায় সোঁ করে সামনে নেমে ডোরাকাটা টুপি-পরা মোটা একটা লোক হাত নাড়ল। সাঁ করে সরে গেল দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগানো একটা বর্তুল মুখ। একটি শঙ্কিত চেহারার খাড়া নাক, হাওয়ায় উষ্কখুষ্ক চুল লোক ডানাওয়ালা আসনে বারবার পাক দিচ্ছে জাহাজটাকে, লসের দিকে এগিয়ে রেখেছে পাক-খাওয়া যন্ত্র। তারপর সামনে দিয়ে উড়ে গেল একটা পুষ্পক ঝোড়া, টানা টানা চোখ, পাণ্ডুর মুখ, নীল বনেট-পরা তিনটি স্ত্রীলোক তাতে বসে, নীল আস্তিন আর সোনালি কাজ-করা রুমাল হাওয়ায় ফৎফৎ করছে।

প্রপেলারের ঘড়ঘড়, জাহাজের পাখায় হাওয়ার গুনগুন, পাতলা শিস, সোনালি ঝিলিক আর নীল আকাশে উজ্জ্বল পোষাক, নিচের বাগানের সিঁদুরে, রুপোলি ও কানারি-হলুদ গাছপালা, সূর্যের আলোয় ঘরবাড়ির ঝকঝকে শার্সি, সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো। মাথা ঘোরে। হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বারবার ফিসফিস করে গুসেভ বলছে:

'দেখুন, দেখুন, ওরে বাবা, অবাক কাণ্ড!..'

শূন্যোদ্যানের ওপর ভেসে গিয়ে হাওয়াই জাহাজ নামল বড়ো, গোল একটা স্কোয়ারে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত ছোটো নৌকো, ঝোড়া আর ডানাওয়ালা আসনগুলো আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নামল স্কোয়ারের সাদা টালি পাথরে। সেখান থেকে যে সব রাস্তা তারকাকারে বেরিয়েছে সেগুলো ভরে গেল মঙ্গলগ্রহবাসীদের চেঁচামেচিতে; ছুটোছুটি করছে তারা, ফুল আর কাগজের টুকরো ছড়াচ্ছে, রুমাল নাড়ছে।

জাহাজটা নেমেছে লাল-কালো পাথরে তৈরি একটা দীর্ঘ থমথমে দালানের পাশে, পিরামিডের মতো ভারিক্কি সেটা। বাড়িটা যতখানি উঁচু তার তিনভাগের দুভাগ পর্যন্ত উঠেছে চৌকোণ সরু লম্বা থাম। মাঝখানে প্রশস্ত সিঁড়ি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একদল লোক, প্রত্যেকের পরনে কালো আলখাল্লা, মাথায় গোল টুপি। পরে লস জেনেছিল এরা ইঞ্জিনিয়ারদের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য — যে পরিষদ মঙ্গলগ্রহের সমস্ত দেশের শাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা।

লসকে অপেক্ষা করতে ইসারা করল তার সঙ্গী। সিঁড়ি বেয়ে স্কোয়ারে নেমে সৈন্যরা জাহাজটিকে ঘিরে দাঁড়াল ভিড়ের ঠেলাঠেলি সামলে। মহানন্দে গুসেভ তাকিয়ে দেখতে লাগল রঙীন পোষাকে উজ্জ্বল আর লোকের ভিড়ে তরঙ্গিত স্কোয়ার, মাথার উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা, ধূসর ও কালো-লাল দালানের সারি, ছাদ পেরিয়ে মিনারের স্বচ্ছ রেখা।

উত্তেজনায় পা ঠুকে বারবার বলছে গুসেভ, 'সহর বটে! সত্যিকার সহর বটে!'

সিঁড়িতে দাঁড়ানো লোকেরা একটি দীর্ঘ-কুঁজো ব্যক্তির জন্য পথ ছেড়ে দিল। তারও পরনে কালো আলখাল্লা, মুখটা লম্বাটে মনমরা, লম্বা ছুঁচলো কালো দাড়ি। মাছের লেজের মতো দেখতে সোনার চিরুনি গোল টুপির ডগায় কাঁপছে।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে এসে ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে আসা আগন্তুকদের দিকে সে তাকিয়ে রইল অন্ধকার, কোটরগত চোখ মেলে। সাবধানে, খুঁটিয়ে তাকে দেখতে লাগল লসও।

'তাকানোর রকমটা দেখুন শয়তানের!' ফিসফিসিয়ে বলল গুসেভ। ভিড়ের দিকে ফিরে ফুর্তিসে হাঁকল, 'নমস্কার, মঙ্গলগ্রহের বন্ধুগণ! সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সাদর অভ্যর্থনা জানাই আপনাদের... আপনাদের সঙ্গে পড়শীর মতো মিতালি পাতাতে এসেছি...'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জনতা, তড়বড়িয়ে কথা বলে ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। গম্ভীরমুখো মঙ্গলগ্রহবাসী দাড়ি চেপে স্কোয়ারে ঠেলাঠেলি-করা ভিড়ের দিকে বিবর্ণ চোখ মেলে তাকাল। সে দৃষ্টিপাতে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল বিক্ষুব্ধ জনতা। মঙ্গলগ্রহবাসী সিঁড়ির সঙ্গীদের দিকে ফিরে দু'একটা কথা বলে ছড়ি তুলে হাওয়াই জাহাজটা দেখাল।

একটি লোক জাহাজে দৌড়িয়ে গিয়ে রেলিঙ-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ানো টেকো মঙ্গলগ্রহবাসীটিকে কী যেন বলল তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে। পর মুহূর্তে হুইসলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, উপরে উঠে গেল দুটি সৈনিক, প্রপেলারের গর্জন, ভারিক্কি চালে ছেড়ে দিল হাওয়াই জাহাজ, সহরের উপরে উঠে চলল উত্তরমুখো।

ফিকে-নীল ঝোপজঙ্গলে

পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সয়াংসেরা। হাওয়াই জাহাজ চলেছে একটি সমভূমির ওপর দিয়ে। এখানে সেখানে দালানের একঘেয়ে রেখা, উঁচু রাস্তার পাইলন ও তার, খনির মুখ; সরু খালগুলোয় ভেসে চলেছে মালবোঝাই বজরা।

বনের ছোপে ক্রমশ দেখা দিল কয়েকটি পাথুরে পাহাড় চূড়া। নিচে নেমে একটি গিরিখাত পেরিয়ে জাহাজ নামল ফাঁকা মাঠে। মাঠটা ঢালু হয়ে মিশেছে অন্ধকার বৃক্ষবহুল ঝোপজঙ্গলে।

নিজেদের ঝোলা তুলে লস ও গুসেভ টেকো সঙ্গীটির পিছু পিছু চলল ঢালু বেয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে।

একটি গাছের পিছন থেকে জলের ফোয়ারা উঠে চকচক করছে রামধনুর মতো চিকচিকে ভেজা কোঁকড়ানো ঘাসের ওপর। ঢালু জায়গাটায় চরে বেড়াচ্ছে কালো আর সাদা রঙের

জন্তুর পাল, খাটো খাটো পা, লম্বা-লোম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। জলের কুলকুল শব্দ। ফুরফুরে হাওয়া।

লম্বা-লোম জন্তুগুলো ওদের পথ ছেড়ে দিতে উঠল গড়িমসি করে, তারপর ভালুকের মতো থাবা অস্বস্তিভরে থপথপিয়ে চলে গেল, মাঝে মাঝে চেপটা শান্ত মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল নবাগতদের। মাঠে হলদে পাখিরা নেমে চকচকে ফোয়ারার নিচে পালক সাফ করা শুরু করল।

ঝোপজঙ্গলে এসে পড়েছে ওরা। রুদন্ত অদ্ভুত গাছগুলোর রঙ আকাশ-নীল। শুকনো আনত শাখায় রজনের মতো পাতাগুলোর খসখস শব্দ। ছোপ-ধরা গাছের গুঁড়ি পেরিয়ে একটি হ্রদের ঝিলিমিলি খেলা। নীল বনের সরস ঝাঁঝালো উত্তাপে মাথা ধরে যায়।

ঝোপজঙ্গল কেটে গিয়েছে নারাঙ্গি রঙের বালি বিছানো অনেক পায়ে চলার পথ। পথগুলি যেখানে মিলেছে সেখানে বৃত্তাকার খোলা জায়গায় বড়ো বড়ো বেলে পাথরের মূর্তি, কয়েকটা ভাঙা, কয়েকটা শেওলায় ঢাকা। এখানে সেখানে থামের গুঁড়ি আর বিরাট দেয়ালের অবশিষ্টাংশ গাছপালার উপর উদ্যত।

তাদের পথ এঁকেবেঁকে গিয়েছে হ্রদের দিকে। শীগগিরই নজরে এল হ্রদের ঘন-নীল বুক, ছায়া পড়েছে দূর একটি খাড়া পাহাড়-চূড়ার আর মৃদুমর্মরিত রুদন্ত গাছের। জমকালো সূর্য জ্বলছে আকাশে। হ্রদের একটা বাঁকে, জলের

ধার পর্যন্ত নেমে আসা শেওলা-ঢাকা সিঁড়ির দু'পাশে বিরাট দুটো উপবিষ্ট মূর্তি, আঙুর লতার মালা তাদের চিড়-ধরা গায়ে।

হলদে ছুঁচলো টুপি মাথায় একটি তরুণী দেখা দিল সিঁড়ির ধাপে। ঘুমের ঘোরে মৃদু হাসি যার মুখে চিরকাল লেগে আছে, সেই শেওলা-ধরা উপবিষ্ট মাগাৎসিৎলের বিরাট পটভূমিকায় মেয়েটির চেহারা ছিমছাম, তন্বী, নীল-শুভ্র। পা পিছলে যাওয়াতে পাথরের একটা আল্‌সে ধরে মুখ তুলল সে।

'আএলিতা,' ফিসফিসিয়ে বলে মঙ্গলগ্রহবাসী আস্তিনে চোখ ঢেকে লস ও গুসেভকে টানতে টানতে নিয়ে গেল পথ ছেড়ে ঝোপজঙ্গলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এসে পড়ল একটি প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায়। ঘাস-ঢাকা নিরালায় একটি ধূসর থমথমে বাড়ি, দেয়ালগুলো হেলে পড়েছে। সামনে বালি বিছানো তারকাকারের জায়গা থেকে ঘাসমাঠ হয়ে কয়েকটি রাস্তা নাক বরাবর গিয়েছে কুঞ্জে, সেখানে গাছপালার মধ্যে পাথরের কয়েকটি খাটো বাড়ি।

শিস দিল টেকো মঙ্গলগ্রহবাসী। বাড়ির কোণ থেকে বেরিয়ে এল একটি বেঁটেখাটো গোলগাল লোক, পরনে ডোরাকাটা আলখাল্লা। টকটকে লাল মুখ যেন বীটের রসে লিপ্ত। রোদে চোখ পিটপিটিয়ে ওদের দিকে এল বটে, কিন্তু

নবাগতরা কে শোনামাত্র কেটে পড়ার উপক্রম। টেকো মঙ্গলগ্রহবাসী আদেশের সুরে তাকে কী বলাতে তাদের নিয়ে গেল বাড়িতে; ভয়ে কাঁপছে, বারবার মুখ ঘুরিয়ে পিছু তাকাচ্ছে; মুখে একটি মাত্র হলদে দাঁত।

বিশ্রাম

অতিথিদের যে সব ঘরে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলো ছোট, ঝকঝকে, প্রায় খালি। বাগানমুখো ছোট ছোট জানলা। খাবার ও শোবার ঘরের দেয়াল মাদুরে ঢাকা। কোণে মাটির টবে ফুলের ঝোপগাছ। জায়গাটা বেশ পছন্দ হল গুসেভের, 'দেখতে ঝুড়ির মতো—খাসা জায়গা।'

ডোরাকাটা আলখাল্লা গায়ে সেই গোলগাল লোকটি—বাড়ির সরকার সে—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে, বকর বকর করছে, একটা তামাটে রুমাল দিয়ে বারবার মাথা মুছছে। থেকে থেকে আবার স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁ করে ছানি-পড়া চোখে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বিড়বিড় করে কয়েকটা কথা আউড়িয়ে নিচ্ছে—খুব সম্ভব কিছু মন্ত্র।

জল ভরে সে লস ও গুসেভকে আলাদা আলাদা চৌবাচ্চায় নিয়ে গেল। তলা থেকে ঘন বাস্পের ধোঁয়া উঠছে। অসীম ক্লান্ত দেহে সেই উষ্ণ, হালকা, বুড়বুড়ি-কাটা জলের স্পর্শ

এতো মধুর যে লস প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল চৌবাচ্চায়। হাত ধরে জল থেকে তাকে তুলল সরকার।

প্রায় টলতে টলতে খাবার ঘরে পেঁছিল লস। টেবিলে শাকসব্জী, কাটা মাংস, ছোট ছোট ডিম আর ফলের রেকাবী। গোল গোল রুটির টুকরো, বাদামের চেয়ে বড়ো নয়, কুড়মুড় করে মুখে গলে যায়। ছুরি বা কাঁটার বালাই নেই, প্রত্যেক রেকাবীতে শুধু গোঁজা ক্ষুদে ক্ষুদে চামচে। সরস সুখাদ্যগুলো পৃথিবীর আদমীরা কী গোগ্রাসে গিলছে দেখে থ বনে গেল সরকার। অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করছে গুসেভ। বাসি ফুলের গন্ধে ভুরভুর মদটা বিশেষ করে খাসা। মুখে যেতে না যেতে যেন উবে গিয়ে শিরায় শিরায় মিশে শরীরটা উষ্ণ আর তাজা লাগছে।

শোবার ঘরে অতিথিদের নিয়ে গিয়ে সরকার বিছানার বালিশ আর চাদর নিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে 'সাদা দৈত্যগুলো' গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাদের নাসিকা গর্জন এত জোরালো যে জানলার শার্সি আর টবের ফুলগুলো কাঁপতে থাকল। বিরাট দেহের ভারে খাটের কিচকিচানি, দেহগুলি তো আর মঙ্গলগ্রহবাসীদের মতো নয়।

চোখ মেলে তাকাল লস। স্কাইলাইট থেকে নীল কৃত্রিম আলোর জোয়ার নেমেছে। শুয়ে থাকাটা কত উষ্ণ আরামের। 'কী ব্যাপার? কোথায় শুয়ে আছি?' কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পাবার আগে মধুর আয়েসে চোখ আবার বুজে গেল।

দীপ্ত বিন্দু সব ভেসে চলেছে, যেন ফিরোজা-নীল পত্রপুঞ্জে চকচকে শিশির ফোঁটা। মধুর অস্থিরতায় ভরে গেল অন্তর, আনন্দের সেই পূর্বাভাসে, যেন এক্ষুনি এসব বিন্দু ভেদ করে স্বপ্নে প্রবেশ করবে অপরূপ কিছু একটা।

ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে ভুরু কোঁচকাল লস, কম্পমান আলোক রেখার ঝাপসা পর্দা ভেদ করার চেষ্টায়। কিন্তু আরো গভীর নিদ্রার মেঘলোকে তলিয়ে গেল সে।

. . . .

বিছানায় উঠে কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে বসে রইল লস। তারপর উঠে পর্দাগুলো সরিয়ে দিল। সরু জানলা পেরিয়ে নক্ষত্রের হিম দ্যুতি, অপরিচিত অদ্ভুত ছাঁচ তাদের।

অস্ফুট কণ্ঠে লস বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তাই তো, আমি তো আর পৃথিবীতে নেই। তুষার-মরুভূমি আর অসীম দূরত্ব, তারপর এসেছি নতুন জগতে। সত্যি মরে গেছি। পেছনে ফেলে এসেছি আমার জীবন ...'

বুক আঁচড়ে দেখল একবার।

'এ তো জীবন নয়, মরণও নয়। মগজ আর শরীরে প্রাণ আছে। কিন্তু জীবন ফেলে এসেছি ওখানে ...'

গত দু'রাত্রি ধরে পৃথিবীর জন্য কেন এত ব্যাকুলতা, কেন এত ব্যাকুলতা নক্ষত্রের ওপারে একদা বেঁচে থাকা নিজের সম্বন্ধে, ঠিক বুঝতে পারছে না সে। যেন নাড়ীর বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেছে, হিম অন্ধকার মহাশূন্য কণ্ঠরোধ

করেছে তার হৃদয়ের। বালিশে মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়ল সে।

. . .

'কে?'

বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল লস। জানলা হয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে। খড়ের ছোট ঘরটা তকতকে পরিষ্কার। জানলার বাইরে পাতার মর্মর, পাখির কিচিরমিচির। চোখে হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল লস।

দরজায় আবার মৃদু টোকা। দরজা খুলে দেখল ডোরাকাটা জামা-পরা গোলগাল লোকটা ভুঁড়ির কাছে বড়ো এক থোকা নীল ফুল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝিকঝিকে শিশির কণা ফুলগুলোতে।

'আইয়ু উতারা আএলিতা,' ফুলগুলো বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে সে বলল।

ধোঁয়াটে গোলক

সকালের খাবার খেতে খেতে বলল গুসেভ:

'মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, এভাবে চলবে না। শয়তান জানে কত দূর পাড়ি দিলাম, তারপর কিনা বসে আছি একটা ইঁদুর গর্তে। চৌবাচ্চায় আরাম করে গোসলের জন্য এখানে আসিনি নিশ্চয়। সহরে আমাদের থাকতে দেবে না — দেড়েটা কী রকম

কটমট করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে, মনে আছে তো? ও লোকটার বিষয়ে হুঁশিয়ার, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। এখন না হয় আমাদের আদরযত্ন করছে, খাওয়াচ্ছে, কিন্তু তারপর?'

'তাড়াহুড়ো করে কী লাভ, আলেক্সেই ইভানভিচ?' ফিরোজা-নীল তিক্ত-মধুর গন্ধ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে লস বলল। 'সবুর করা যাক। আমাদের দেখেশুনে যখন বুঝবে যে আমরা বিপজ্জনক লোক নই, তখন সহরে যেতে দেবে।'

'আপনার কথা জানি না, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, কিন্তু আমি এখানে আয়েস করার জন্য আসিনি।'

'আমাদের কী করা উচিত মনে করেন বলুন তো।'

'অবাক করে দিলেন বটে। কিছু একটা মন্তর-পড়া জিনিসটিনিস শোঁকেননি তো?'

'ঝগড়া করতে চান না কি?'

'না, তবে বসে বসে ফুলের গন্ধ শোঁকা — সেটা তো পৃথিবীতে বসে করা চলত। আমি যা বুঝি, আমরা মঙ্গলগ্রহে প্রথম এসেছি, তাই এটা এখন আমাদের মুলুক, সোভিয়েত গ্রহ এটা। বন্দোবস্তটা পাকাপাকি করে নেওয়া উচিত।'

'মজার লোক আপনি, আলেক্সেই ইভানভিচ।'

'দেখা যাবে কে মজার লোক, আপনি না আমি,' চামড়ার বেল্ট এঁটে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেয়ানার মতো চোখ কুঁচকিয়ে বলল গুসেভ। 'কাজটা শক্ত, সেটা তো বুঝি: আমরা মাত্র দুজন। কিন্তু রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রে যোগ দিতে

ইচ্ছুক, এরকম একটা দলিল আমাদের দরকার ওদের কাছ থেকে। এমনি এমনি দেবে না নিশ্চয়, কিন্তু নিজেই তো দেখলেন মঙ্গলগ্রহের সব ব্যাপার স্যাপার সুবিধের নয়। ধরণ-ধারণ দেখেই বুঝতে পারি।'

'একটা বিপ্লব শুরু করে দিতে চান?'

'কী করে বলি, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ? পরে দেখা যাবে। কী নিয়ে পেত্রগ্রাদে ফিরে যাব? শুকনো একটা মাকড়সা হাতে? তা চলবে না। ফিরে গিয়ে কাগজের টুকরোটা দেখাব: এই দেখুন, ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রগুলোতে মঙ্গলগ্রহ যোগ দিয়েছে! ইউরোপে তখন সাড়া পড়ে যাবে। একটা জিনিস তো স্পষ্ট — বিস্তর সোনা এখানে, নিজেই তো দেখেছেন, জাহাজ বোঝাই সোনা। বুঝলেন কিনা, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ।'

চিন্তিতভাবে লস তাকাল গুসেভের দিকে: ঠাট্টা করছে না ভেবেচিন্তে কথা বলছে বোঝা মুশকিল। বাহ্যত সরল অথচ ধূর্ত চোখে একটা ঝিলিক, কিন্তু কোথায় যেন একটা বেপরোয়া ভাবের প্রচ্ছন্ন আভাস।

মাথা ঝাঁকিয়ে বড়ো বড়ো ফুলগুলোর দীপ্ত মোম-মসৃণ পাপড়িগুলো ছুঁয়ে চিন্তান্বিতভাবে বলল লস:

'মঙ্গলগ্রহে কেন যে এলাম সেটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনো। উড়লাম, যাতে এখানে পৌঁছতে পারি। এককালে দিগ্বিজয়ীরা জাহাজে চেপে বেরিয়ে পড়ত নতুন দেশের

সন্ধানে। সমুদ্র থেকে চোখে পড়ত অজানা তীর, নদীমুখে নিয়ে যেত জাহাজ, চওড়া-কানাত টুপি মাথা থেকে খুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনরা নিজেদের নামে নামকরণ করত জায়গাটার। তারপর চলত লুঠপাট। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি: তীরে পৌঁছনোই যথেষ্ট নয়, ধনরত্নে জাহাজ বোঝাই করে নেওয়া চাই। আমাদের দরকার নতুন দুনিয়া খুঁজে বার করা—কী অসীম ঐশ্বর্য সেখানে! যে বস্তুটা সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ফেরা অবশ্যকর্তব্য, সেটা হল জ্ঞান, জ্ঞান, আলেক্সেই ইভানভিচ।'

'আপনার সঙ্গে মানিয়ে চলা মুশকিল হবে, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। আপনি মানুষটা সহজ নন।'

হেসে বলল লস:

'না, আমি মানুষটা শক্ত শুধু নিজের কাছে। মানিয়ে চলব ঠিক, প্রিয় বন্ধু।'

দরজায় কার যেন আঁচড়। দেখা গেল বাড়ির সরকারকে, ভয়ে থরহরিকম্প। ইসারা করে ওদের বলল পিছু পিছু আসতে। তাড়াতাড়ি উঠে লস হাত বুলিয়ে নিল সাদা চুলে। গুসেভ গোঁফে চাড়া দিল সজোরে। বারান্দা হয়ে গিয়ে এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওরা গেল বাড়ির অন্য দিকটায়।

. . . .

নিচু একটা দরজায় সরকার টোকা মারাতে শোনা গেল ত্রস্ত, প্রায় শিশুর মতো কণ্ঠস্বর। যে ঘরে লস ও গুসেভ ঢুকল সেটা দীর্ঘ, সাদা রঙের। স্কাইলাইট থেকে মোজেইক-

করা মেঝেতে নেমেছে আলোর রেখা, তার মধ্যে ধূলিকণার খেলা। সারি সারি বই, বই-এর আলমারির মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জের মূর্তি, খাড়াপায়া ছোট টেবিল আর পর্দার ধবধবে সাদা বুকের ছায়া পড়েছে মেঝেতে।

দরজা থেকে কিছুদূরে একটি তরুণী। কটা চুল, পরনে গলাবন্ধ কালো, লম্বা হাতা পোষাক। উঁচু খোঁপার উপরে আলোর তির্যক রেখায় ধূলো কণা ঝিকমিকিয়ে তাকের সোনালি-পিঠ বইগুলোর ওপর পড়ছে। মেয়েটি হল সেই, কাল হ্রদের তীরে মঙ্গলগ্রহবাসী যার নাম বলেছিল আএলিতা।

নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল লস। আএলিতা নড়ল না, শুধু কটা চোখের বিশাল মণি নিবদ্ধ করল তার মুখে। একটু কেঁপে উঠল শুভ্র-নীল দীর্ঘ মুখ। ছোট নাক আর উদার ঠোঁট শিশুর মতো কোমল। গাউনের কালো নরম ভাঁজের তলায় বুকের ওঠাপড়া, যেন খাড়া পাহাড়ে উঠেছে এইমাত্র।

‘এল্লিও উতারা গেও,’ সুরেলা নরম গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে মাথাটা এত নিচু করল যে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ দেখা গেল।

আঙুল মটকানো ছাড়া আর কোনো জবাব দিতে পারল না লস। কষ্টকৃতভাবে, কেন জানি না, বেজায় পোষাকি সুরে বলল:

‘পৃথিবীর পথিকরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আএলিতা।’

মুখ লাল হয়ে উঠল লসের। গাম্ভীর্যসহকারে জানাল গুসেভ:

'রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার গুসেভ ও ইঞ্জিনিয়ার মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ লস। আলাপ হওয়াতে খুশি বোধ করছি। আতিথেয়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।'

মানুষের ভাষা শুনে মুখ তুলল আএলিতা। সে মুখ এখন ধীর স্থির, চোখের মণি ছোট হয়ে এসেছে। নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিল, হাতের তালু উল্টে। সে ভাবে রইল কিছুক্ষণ। লস ও গুসেভের মনে হল তার হাতের তালুতে ছোট একটা ফিকে-সবুজ গোলক যেন দেখতে পেয়েছে। হঠাৎ হাতের তালু সোজা করে বই-এর তাক ছাড়িয়ে আএলিতা গেল লাইব্রেরীর একেবারে শেষ দিকে। পিছু পিছু চলল অতিথিরা।

লসের চোখে পড়ল যে আএলিতা লম্বায় তার কাঁধ বরাবর; কোমল ও হালকা সে, সকালে তাদের কাছে যে তীব্র-মধুর ফুলগুলো পাঠিয়েছিল ঠিক তার মতো। ঢিলে পোষাকের প্রান্তদেশ মোজেইক-করা মসৃণ মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। ফিরে তাকিয়ে স্মিত হাসল সে, কিন্তু চোখে তখন উৎকণ্ঠার ছাপ।

ঘরের একটা অর্ধবৃত্তাকার জায়গায় চওড়া বেঞ্চ দাঁড়িয়ে, সেটা আএলিতা দেখাতে আসন গ্রহণ করল লস ও গুসেভ। পড়ার একটা টেবিলের পাশে মুখোমুখি বসে আএলিতা তাতে

কনুই-এর ভর দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অতিথিদের দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। এভাবে বসে থাকা আর এই অদ্ভুত অপরূপ মেয়েটিকে মন দিয়ে দেখা— শান্ত সুতীব্র আনন্দের অনুভূতি হল লসের। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল গুসেভ:

'খাসা মেয়ে, অত্যন্ত মিষ্টি বটে।'

কথা বলতে শুরু করল আএলিতা। মনে হল তারের ঝঙ্কার উঠেছে আঙুলের ছোঁয়ায়, গলাটি এত অপরূপ। কয়েকটি কথা বারবার পুনরুক্তি করল, বলতে গেলে ঠোঁট প্রায় না নাড়িয়ে। ধূসর চোখের পাতা কখনো নামছে, কখনো উঠছে।

আবার হাতের তালু উল্টো করে ধরে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তখুনি আবার লস ও গুসেভের চোখে পড়ল ধোঁয়াটে সেই ছোট ফিকে-সবুজ গোলকটি, আকারে ছোট আপেলের চেয়ে বড়ো নয়। ভেতরে রঙের খেলা, সজীব।

এবার আএলিতা ও অতিথিরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বহুরূপী ধোঁয়াটে আপেলটার দিকে। হঠাৎ ভেতরকার নড়াচড়া থেমে গেল, বুকে দেখা দিল কয়েকটি কালো ছোপ। ভালো করে দেখতে দেখতে লস চমকে উঠল: আএলিতার হাতের তালুতে পৃথিবীর গোলক।

'তালৎসেৎল,' সেটা দেখিয়ে বলে উঠল আএলিতা।

আস্তে আস্তে পাক খেতে শুরু করেছে গোলকটি। চোখের সামনে ভেসে গেল আমেরিকা ও এশিয়ার প্রশান্ত-মহাসাগরবর্তী উপকূলের রেখা। উত্তেজনা শুরু হয়েছে গুসেভের।

‘এ হল, এ হল আমরা — রুশীরা,’ সাইবেরিয়া দেখিয়ে বলে উঠল সে।

ছায়ার মতো ভেসে গেল উরালের শৈলশিরা, ভাটির দিকের ভোলগার ফিতে। চোখে পড়ল শ্বেতসাগর উপকূলের রেখা।

‘এই যে,’ ফিনলাণ্ড উপসাগর দেখিয়ে লস বলল।

বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে তাকাল আএলিতা। থেমে গেল গোলকের আবর্তন। একাগ্রচিত্তে ভাবার চেষ্টা করে লস মানসপটে দেখল মানচিত্রের একটি অংশ। আর সঙ্গে সঙ্গে, যেন তার কল্পনায় সাড়া দিয়ে, ধোঁয়াটে গোলকটির বুকে দেখা দিল একটা কালো দাগ, সেখান থেকে রেলপথের জাল চলে গেছে চারিদিকে, আর সেখানে, সবুজাভ জায়গায় লেখা ‘পেত্রগ্রাদ’।

ভালো করে দেখে নিয়ে হাত দিয়ে গোলকটা ঢেকে দিল আএলিতা — আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তার দীপ্তি। লসের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

‘ওএয়েও, খো সুয়া,’ বলল সে, আর তার মানে ধরতে পারল লস: ‘একাগ্রচিত্তে ভাবার চেষ্টা করুন।’

পিটার্সবুর্গের ছবিটা মনে আনল সে — গ্রানিটের বাঁধ, নেভার ঠাণ্ডা নীল ঢেউ, তাতে দুলছে একটা নৌকো, কুয়াশায় নিকলায়েভ্‌স্কি ব্রিজের খিলান, কারখানার চিমনি থেকে ওঠা ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সূর্যাস্তের কুয়াশা ও মেঘ, ভিজে একটা রাস্তা, ছোট দোকানের সাইনবোর্ড, রাস্তার কোণে একটা ছেকড়া গাড়ি।

হাতে থুতনি রেখে গোলকটি নিঃশব্দে দেখছে আএলিতা। লসের স্মৃতির ছায়া পড়ছে তাতে, ছবিগুলো কখনো স্পষ্ট, কখনো বা ঝাপসা। দেখা দিল সেণ্ট আইজাক ক্যাথিড্রালের অস্পষ্ট ঝকঝকে গম্বুজ, তারপর জলের ধার পর্যন্ত নেমে-যাওয়া পাথরের সিঁড়ি, একটা অর্ধবৃত্তাকার বেঞ্চ। বিষণ্ন একাকী বসে আছে সোনালি-চুল একটি মেয়ে — থরথর করে কেঁপে মিলিয়ে গেল তার মুখ — আর উপরে টায়রা-পরা দুটো স্ফিনক্স। ভিড় করে চলে গেল নানা সংখ্যা, একটা কারিগরি নকসা, আগুন-ছিটানো হাপর, হাওয়া দিচ্ছে বেজারমুখো খখ্‌লভ।

ধোঁয়াটে গোলকে প্রতিফলিত অজানা জীবনের দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখল আএলিতা। ছবিগুলো তালগোল পাকিয়ে যেতে শুরু করেছে, গোলকে দেখা দিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের নানা দৃশ্য — ধোঁয়ার রাশি রাশি কুণ্ডলী, আগুন, ঘোড়া ছুটেছে, লোকে পালিয়ে যেতে যেতে পড়ে যাচ্ছে! তারপর শুধু একটি রক্ত-ঝরা দাড়িওয়ালা মুখ, আর কিছু

নয়। গ্‌সেভ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস নেওয়াতে তার দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে হাতের তাল্‌ তৎক্ষণাৎ উল্টে দিল আএলিতা। গোলকটা নেই।

কয়েক ম্‌হ্‌র্ত চুপ করে বসে রইল আএলিতা, টেবিলে কন্‌ই রেখে, হাতে চোখ ঢেকে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে একটা তাক থেকে একটি আধার নিয়ে হাড়ের একটা চোঙ বের করে পর্দা-দেওয়া পড়ার টেবিলে রাখল সেটা। লাইব্রেরীর ওপর দিকের জানলাগ্‌লোর নীল পর্দা একটা দড়ি টেনে নামিয়ে দিল, বেঞ্চের দিকে টেবিলটা সরিয়ে একটা বোতাম টিপল।

আলো হয়ে উঠল পর্দাটি, দেখা দিল মঙ্গলগ্রহবাসীদের ম্‌র্তি, জন্তুজানোয়ার, বাড়িঘরদোর, গাছপালা আর গেরস্থালির নানা বাসনকোসন।

প্রত্যেকটা জিনিসের নাম বলে দিল আএলিতা। ছবিগ্‌লো নড়ে উঠে এ ওর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে, তখন ক্রিয়াগ্‌লোর নাম বলল। থেকে থেকে ছবিগ্‌লোর পাশে পাশে দেখা দিচ্ছে রঙীন নানা চিহ্ন, সেই গান-গাওয়া বইটায় যেমন, শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ স্‌রেলা বাক্য। তখন একটি ভাবধারণার নামোচ্চারণ করল আএলিতা।

কথা সে বলছে নিচু স্বরে। অদ্ভুত বর্ণপরিচয়ের অক্ষরগ্‌লো ভেসে চলেছে ধীরে ধীরে। চুপচাপ ঘরে, লাইব্রেরীর ফিকে-নীল অন্ধকারে ধ্‌সর চোখ লসের দিকে

মেলে রয়েছে আএলিতা, তার কণ্ঠস্বর কঠোরকোমল একটা মোহে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে লসকে। মাথা তার ঘুরছে।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে লসের মনে হল মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে, যেন কুয়াশার একটা পর্দা সরিয়ে নেওয়া হল, মনে গেঁথে বসছে নতুন শব্দ ও ভাবধারণা। অনেকক্ষণ কাটল এ ভাবে। কপাল ছুঁয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে আএলিতা নিভিয়ে দিল পর্দার আলো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রয়েছে লস ও গুসেভ।

'এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন,' বলল আএলিতা। কথাগুলোর ধ্বনি তখনো অচেনা, কিন্তু অর্থ গিয়ে পেঁছিল মনের গহনে।

সিঁড়িতে

কেটে গেল সাত দিন।

পরে সেই দিনগুলোর কথা লসের মনে হত যেন নীল গোধূলি, অপরূপ সে শান্তির দিন কটা কেটেছে একটার পর একটা বিচিত্র দিবাস্বপ্নে।

লস ও গুসেভের ঘুম ভাঙত ভোর-ভোর। স্নান ও লঘু আহারের পর তারা যেত লাইব্রেরীতে। দোরগোড়ায় তাদের অভ্যর্থনা জানাত আএলিতার ডাগর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। এরি মধ্যে তার কথার মানে বোঝা যায়। সে ঘরের গোধূলি-স্তব্ধতায়, আএলিতার অনুচ্চ কথায় অখণ্ড শান্তির আবেশ। আএলিতার

আর্দ্র চোখে কী দীপ্তি, মনে হত সে চোখ তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ অলকায়, সেখানে দিবাস্বপ্নের ভিড়। পর্দায় ছায়ার আনাগোনা। কথাগুলি আপনা থেকে প্রবেশ করত মনের অতলে।

কথাগুলি প্রথমে ধ্বনি মাত্র, তারপর কুয়াশার মধ্যে যেন ভাবধারণায় দানা বেঁধে অর্থঘন হয়ে উঠত, জীবনের মদিরা উৎসারিত হত সেগুলি থেকে। এখন আএলিতার নাম উচ্চারণ করলে দু'ধরনের সাড়া জাগে লসের অন্তরে: প্রথম অক্ষর দুটি 'আএ', অথবা 'শেষ বারের মতো দেখা', জাগায় বিষণ্ণতা; আর 'লিতা', অথবা 'তারার আলো', তা থেকে বিচ্ছুরিত হয় রুপোলি দীপ্তি। এইভাবে নতুন পৃথিবীর ভাষা সূক্ষ্মতম জিনিসের মতো চেতনায় মিশে গেল।

পাঠ চলল সাত দিন, সকালে ও সূর্যাস্তের পর — মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত মনে হল আএলিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অষ্টম দিনে অতিথিদের আর সকালে জাগানো হল না, সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমোল দুজন।

ঘুম ভাঙল যখন লসের, জানলার বাইরে গাছের দীর্ঘ ছায়া চোখে পড়ে। কী একটা পাখি স্ফটিক-স্বচ্ছ গলায় একটানা গেয়ে চলেছে। গুসেভকে জাগাল না লস, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে গেল লাইব্রেরীতে। কিন্তু দরজায় টোকার সাড়া দিল না কেউ। তখন লস গেল প্রাঙ্গণে, গত সাত দিনের মধ্যে এই প্রথম।

ফাঁকা মাঠটা গিয়ে পড়েছে ঝোপজঙ্গলের ধারে ছোট বাড়িগুলির কাছে। বেঢপ চেহারার ঝাঁকড়া-লোম একদল খাশি করুণ গলায় ডাকতে ডাকতে চলেছে সেদিকে — জানোয়ারগুলো ভালুক ও গরুর দো-আঁসলার মতো। অস্তরবির সোনালি আলো কুঞ্চিত ঘাসে — সমস্ত ঘাস-মাঠটা ভিজে সোনার মতো চিকচিকে। হ্রদের উপর উড়ে চলেছে বকের মরকত ঝাঁক। দূরে সূর্যাস্তের আলোয় স্নাত পাহাড়ের উদ্যত বরফ চূড়া। প্রশান্তি চারি ধারে, বিদায়-বেলার সোনালি করুণ আলোয় উদ্ভাসিত।

চেনা পথ ধরে লস চলল হ্রদের দিকে। দু'ধারে সেই ফিকে-নীল রুদন্ত গাছের সারি, চোখে পড়ে ছোপ-ধরা বৃক্ষকাণ্ড পেরিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপ, আর সেই হাওয়া — হালকা শিরশিরে হাওয়া। কিন্তু লসের মনে হল শুধু এখনি এই অপরূপ দৃশ্য ধরা পড়েছে তার কাছে — চোখ আর কান খুলে গিয়েছে — কেননা এখন বস্তুর নাম তার জানা।

পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে হ্রদের ঝিলিক। কিন্তু হ্রদের ধারে যখন লস এসে পড়ল, তখন সূর্য অস্ত গেছে, সূর্যাস্তের জ্বলন্ত পালক, তার অগ্নিজিহ্বা আকাশের মাঝখানে ছড়িয়ে সোনালি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে দিল। সে আগুন নিভে গেল অচিরে, স্বচ্ছ হয়ে উঠল আকাশ, তারপর অন্ধকার, বসে গেল তারার মেলা। হ্রদের জলে প্রতিফলিত হল নক্ষত্রলোকের সেই বিচিত্র ছক। হ্রদের বাঁকে, সিঁড়ির দু'ধারে উদ্যত জেগে আছে

পাথরের সেই বিরাট মূর্তিদুটি কালো ছায়ারেখায় — কতো শতাব্দীর সেই দুটি প্রহরী বসে আছে তারার দিকে মুখ তুলে।

সিঁড়ির কাছে গেল লস। দ্রুত নেমে-আসা অন্ধকার তখনো চোখ-সওয়া হয়নি। একটি মূর্তির পায়ে ঠেস দিয়ে বুক ভরে নিল হ্রদের স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া, জলার ফুলের তীব্র গন্ধ। জলে তারার ছায়া অস্পষ্ট — জলের বুকে জেগে উঠেছে পাতলা কুয়াশা। আকাশে কিন্তু তারাগুলো আরো ঝিকঝিকে; এখন স্পষ্ট চোখে পড়ছে ঘুমন্ত গাছের ডাল, চিকচিকে নুড়ি-পাথর আর উপবিষ্ট মাগাৎসিৎলের স্মিত হাসিমুখ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে লস, শেষে পাথরে-রাখা হাত অসাড় হয়ে এল। মূর্তিটার কাছ থেকে সরে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখল সিঁড়ির নিচের ধাপে বসে আছে আএলিতা। নিশ্চল হয়ে বসে দেখছে কালো জলে তারার ছায়া।

'আইয়ু তু ইরা খাস্‌খে, আএলিতা,' বলল লস। অবাক হয়ে শুনল নিজেরি উচ্চারিত কথাগুলির বিচিত্র আওয়াজ। কথাগুলো বেরোল বেশ কষ্টে, যেন ঠোঁটদুটো হিমে অসাড়। 'আপনার সঙ্গে থাকতে পারি,' এই ইচ্ছেটা আপনা থেকেই রূপ নিল পরদেশী শব্দগুলোয়।

আস্তে আস্তে ফিরে তাকিয়ে আএলিতা বলল:

'হ্যাঁ।'

সিঁড়ির ধাপে তার পাশে বসে পড়ল লস। কেপের কালো

হুডে আএলিতার চুল ঢাকা। তারার আলোয় মুখ দেখা যায়, চোখ নয় — দেখা যায় শুধু চোখের কোলে কালো ছায়া।

শান্ত নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞেস করল আএলিতা:

'পৃথিবীতে আপনি সুখে ছিলেন?'

তখুনি জবাব দিল না লস, ভালো করে তাকে দেখে নিল একবার: নিস্পন্দ মুখ, ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ রেখা।

'হ্যাঁ,' জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, সুখে ছিলাম।'

'আপনাদের পৃথিবীতে কীসে সুখ হয়?'

আর একবার তার মুখ ভালো করে দেখে নিল লস।

'আমাদের পৃথিবীতে নিজের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাতেই অবশ্য সুখ। সে-ই সুখী যে পূর্ণ, যার বিভেদ নেই, যে বাঁচতে চায় তাদের জন্য যারা তাকে দিয়েছে পূর্ণতা, বিভেদহীনতা ও আনন্দ।'

এবার ফিরে তাকাল আএলিতা। দেখা গেল তার বিশাল চোখ বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে শুভ্রকেশ প্রকান্ড লোকটির দিকে।

'সে সুখ আসে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে,' লস বলল।

মুখ ফিরিয়ে নিল আএলিতা। হুডটা কেঁপে উঠল মাথায়। ও কি হাসছে? না। কাঁদছে তাহলে? না। শেওলা-ভরা সিঁড়ির ধাপে অস্বস্তিভরে উসখুস করল লস। ধরা গলায় শুধাল আএলিতা:

'তাহলে পৃথিবী ছেড়ে চলে এলেন কেন?'

'যাকে ভালোবাসতাম সে মারা গেল। হতাশা জয় করার শক্তি আমার ছিল না, জীবন দুর্বিষহ ঠেকল। আমি পলাতক, কাপুরুষ।'

কেপ থেকে হাত বের করে আ্এলিতা রাখল লসের বলিষ্ঠ হাতে, একবার ছুঁয়ে আবার সরিয়ে নিল কেপের ভেতর।

'আমি জানতাম,' চিন্তান্বিতভাবে বলল আএলিতা, 'আমার জীবনে এটা ঘটবে। ছোটবেলায় অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতাম উত্তুঙ্গ সবুজ পাহাড়ের। দীপ্ত নদীর, আমাদের নদীর মতো নয়। আর মেঘের, বিরাট সাদা মেঘের, বৃষ্টির, মুষলধারা বৃষ্টির। আর বিরাট সব মানুষের। ভেবেছিলাম, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পরে গুরু বললেন যে এ সব হল আশ্‌খে — দিব্যদৃষ্টি। মাগাৎসিৎলদের বংশধর আমরা, আমাদের মধ্যে জেগে রয়েছে অন্য এক জীবনের স্মৃতি, দিব্যদৃষ্টি ঘুমিয়ে রয়েছে, যে বীজ অংকুরিত হয়নি তার মতো। আশ্‌খে হল নিদারুণ শক্তি, বিরাট জ্ঞান। কিন্তু সুখ কাকে বলে আমার অজানা।'

কেপ থেকে দুটো হাত বের করে শিশুর মতো হাততালি দিল আএলিতা। আবার কেঁপে উঠল হুডটা।

'বছরের পর বছর রাত্রিবেলায় এই সিঁড়ির ধাপে এসেছি, এসে চেয়ে থাকি তারার দিকে। অনেক, অনেককিছু জানি।

বিশ্বাস করুন, আমি যা জানি তা কখনো জানা উচিত নয় আপনার, দরকারও নেই। তবে সুখী ছিলাম ছোটবেলায়, যখন স্বপ্ন দেখতাম মেঘের, মুষলধারা বৃষ্টির, সবুজ পাহাড়ের, বিরাট মানুষের। গুরু সাবধান করে বলেছিলেন, আমার মৃত্যু হবে।' আবার ফিরে হঠাৎ মৃদু হাসল আএলিতা।

সন্ত্রস্ত লাগল লসের: কী অদ্ভুত সুন্দর আএলিতা, তার কেপে, তার হাতে, তার মুখে, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কী তিক্ত-মধুর গন্ধ; সে গন্ধে বিপদের কী আভাস!

'গুরু বলেছেন: "খাও তোকে মারবে।" খাও-এর মানে অবতরণ।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের ওপর হুড টেনে দিল আএলিতা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে লস বলল:

'আএলিতা, কী আপনি জানেন আমাকে বলুন তো।'

'সেটা গোপন কথা,' গম্ভীরভাবে জবাব দিল আএলিতা। 'কিন্তু আপনি তো মানুষ, আপনাকে অনেক কিছু বলতে হবে বইকি।'

আএলিতা মুখ তুলে তাকাল আকাশপানে। ছায়াপথের দু'ধারে নক্ষত্রপুঞ্জের কী ঝকঝকানি, যেন মহাকালের হাওয়ায় আগুন ধরে গিয়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আএলিতা।

বলল, 'শুনুন, মন দিয়ে শান্তভাবে আমার কথা শুনুন।'

আএলিতার প্রথম গল্প

'তুমা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহে বিশ হাজার বছর আগে থাকত আওলরা—নারাঙ্গি জাতি। আওলদের বন্য উপজাতিরা শিকার করত, খেত বিরাট বিরাট মাকড়সা — বিষুবরেখার কাছে বনেজঙ্গলে ও জলাভূমিতে তাদের আস্তানা ছিল। এ সব উপজাতিদের কয়েকটি মাত্র শব্দ আমাদের ভাষায় টিকে আছে। আওলদের অন্য উপজাতিরা থাকত মহাদেশের দক্ষিণ উপসাগর কূলে। সেখানে আগ্নেয় গুহা, লোণা ও টাটকা জলের হ্রদ। মাছ ধরে মাটির নিচে লোণা হ্রদে সেটা রাখত তারা। শীতকালে তারা আশ্রয় নিত গভীর গুহাগুলোয়। সেগুলোতে এখনো মাছের হাড়ের ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়।

'আওলদের তৃতীয় একটা দল বিষুবরেখার কাছে আস্তানা গাড়ে, পাহাড়তলিতে, সেখানে খাবার মতো গরম জলের প্রস্রবণ আছে। তারা বাড়িঘরদোর তৈরি করতে পারত, ঝাঁকড়ালোম খাশি পালত, মাকড়সাভুক আওলদের সঙ্গে লড়াই চালাত আর পুজো করত তালৎসেৎলের রক্তলাল নক্ষত্রকে।

'আজোরার পূত দেশে যে সব উপজাতি থাকত তাদের একটির মধ্যে অসাধারণ একজন শখোর আবির্ভাব ঘটল। মেষপালকের ছেলে, বড়ো হয় লিজিয়াজিরা পাহাড়ে। সতেরোয় পা দিয়ে সে পাহাড় ছেড়ে আসে আজোরা পাহাড়তলিতে। সহরে সহরে ঘুরে বলে:

'"আমি স্বপ্ন দেখেছি। আকাশ খুলে গেল, খসে পড়ল একটি তারা। খাশি তাড়িয়ে গেলাম সেখানে যেখানে তারাটি পড়েছে। সেখানে দেখলাম ঘাসে শুয়ে আছে আকাশ-সন্তান। দীর্ঘকায়, মুখ সাদা ধবধবে, পাহাড়চূড়ার বরফের মতো। মাথা তুলল সে, আর আমি দেখলাম তার চোখে আলো আর উন্মত্ততার ঝিলিক। ভয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম, মড়ার মতো শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কানে এল আকাশ-সন্তান আমার লাঠিটা নিয়ে খাশিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার পদভরে কেঁপে উঠছে মাটি। আর শুনলাম বজ্রকণ্ঠে বলছে, "তুই মরবি, কেননা আমি চাই তুই মরিস।" কিন্তু তবু তার পিছু নিলাম, খাশিগুলোর মায়া কাটাতে পারিনি। কাছে যেতে সাহস হল না: তার চোখে অশুভ আগুনের ঝিলিক, বার বার মাটিতে শুয়ে পড়লাম যাতে প্রাণ না খোয়াই। এ ভাবে চললাম কয়েক দিন পাহাড় ছেড়ে মরুভূমিতে।

'"লাঠি দিয়ে একটা পাথরে আকাশ-সন্তান ঘা দিতে জলের ফোয়ারা ছুটল। খাশিগুলো আর আমি খেলাম সেই জল। আর আকাশ-সন্তান আমাকে বলল, "তুই আমার দাস হ।" তার খাশিগুলোর দেখাশোনা করতে লাগলাম, আর সে তার উচ্ছিষ্ট খেতে দিত আমাকে।"

'সহরবাসীদের এ কথা শোনাল মেষপালক। আরো বলল:

'"কোমল পাখিরা আর নিরীহ পশুরা বেঁচে থাকে, কখন মরণ আসবে জানে না তারা। কিন্তু হিংস্র ঈখি ডানা মেলে

দেয় বকের উপর, জাল বোনে মাকড়সা, ভয়াবহ চা-র চোখ জ্বলজ্বল করে শ্যামল ঝোপঝাড়ে। সাবধান! পাপকে ধ্বংস করার মতো ধারালো তলোয়ার তোমাদের নেই, তার নাগাল এড়াবার মতো কঠিন দেয়াল নেই তোমাদের, তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার মতো লম্বা পা নয় তোমাদের। আমি আকাশে দেখেছি জ্বলন্ত অলক্ষণ, দেখেছি অশুভ আকাশ-সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ছে তোমাদের ঘরদোরের ওপর। তার চোখ তালৎসেৎলের লাল আগুনের মতো।”

‘এ কথা শুনে বিভীষিকায় হাত তুলল শান্ত আজোরার অধিবাসীরা। মেষপালক বলে চলল:

‘“ঝোপঝাড় থেকে রক্তপিপাসু চা তোমাদের দিকে দৃষ্টি হানলে, ছায়ামূর্তি ধোরো, তাহলে তোমাদের রক্তের গন্ধ পেঁৗছবে না তার নাকে। সিঁদুরে মেঘ থেকে ইখি ঝাঁপিয়ে পড়লে ছায়ামূর্তি ধোরো, তাহলে ইখির চোখ বৃথায় ঘাসে তোমাদের খুঁজে বেড়াবে। দুই চাঁদের — ওল্লো আর লিত্‌খার — আলোয় অশুভ মাকড়সা ৎসিৎলি তোমাদের ঘরদোরের চারদিকে জাল বুনলে, ছায়ামূর্তি হয়ে যেও, তাহলে ৎসিৎলি তোমাদের ধরতে পারবে না। তুমার দুর্ভাগা সন্তান, ছায়ামূর্তি হয়ে যেও। পাপ শুধু টানে পাপকে। পাপের সগোত্র সবকিছুকে এড়িয়ে চলা চাই। বাড়ির দোরগোড়ার নিচে ঢেকে রেখো তোমাদের সমস্ত পাপত্রুটি। সয়ামের সেই বিপুল উষ্ণ প্রস্রবণে গিয়ে স্নান করো। তাহলে

অশুভ আকাশ-সন্তান তোমাদের আর দেখতে পাবে না — বৃথায় তোমাদের ছায়া ভেদ করবে তার রক্তবর্ণ চোখ।”

‘আজোরার অধিবাসীরা কথা শুনল মেষপালকের। অনেকে তার পিছু পিছু গেল বৃত্তাকার হ্রদে, গেল সয়ামের বিপুল উষ্ণ প্রস্রবণে।

‘সেখানে কয়েকজন জানতে চাইল, “পাপকে কী করে দোরগোড়ার নিচে ঢেকে রাখা সম্ভব?” জন কয়েক চটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল মেষপালককে, “তুই ধাপ্পা দিচ্ছিস — মনের আক্রোশে গরীবেরা তোকে উসকিয়েছে যাতে আমরা অসতর্ক হয়ে পড়ি আর ওরা আমাদের ঘরবাড়ি হাতিয়ে নিতে পারে।” কয়েক জন বলল, “এই পাগলাটাকে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ফেলে দেব গরম হ্রদে, বেটা নিজে ছায়ামূর্তি হয়ে যাক।”

‘এ কথা শুনে মেষপালক নিজের উল্লাটা নিল; কাঠের বাঁশীটার ডগায় একটি ত্রিভুজে তার বসানো। তারপর সেই রাগী খিটখিটে বিচলিত লোকেদের মাঝখানে বসে বাজাতে লাগল বাঁশী, গেয়ে চলল। বাঁশীর সুর আর গান এত সুমধুর যে পাখিরা চুপ করে গেল, থেমে গেল হাওয়া, পশুর পাল শুয়ে পড়ল মাটিতে, মধ্যাকাশে থেমে গেল সূর্য। শ্রোতাদের প্রত্যেকের মনে হল তাদের পাপত্রুটি এরি মধ্যে চাপা পড়ে গেছে নিজেদের দোরগোড়ার নিচে।

'তিন বছর শিষ্যদের শেখাল মেষপালক। চতুর্থ বছরের গ্রীষ্মকালে জলাভূমি থেকে মাকড়সাভুক আওলরা এসে হানা দিল আজোরায়। মেষপালক সহরে সহরে গিয়ে বলল, "দোরগোড়ার বাইরে পা ফেলো না। নিজেদের মনের পাপের বিষয়ে হুঁশিয়ার। নিজেদের শুচিতা যেন কলঙ্কিত না হয়।" তার কথা শুনল লোকেরা। কিন্তু কয়েকজন ছিল যারা মাকড়সাভুকদের বিরোধিতা করতে চাইনি, দোরগোড়ায় তাদের বধ করল বর্বররা। তখন সহরের মোড়লেরা পরামর্শ করে মেষপালককে ধরল, পাহাড়চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল হ্রদে।

'ততদিনে মেষপালকের শিক্ষাবলী শুধু আজোরায় নয়, অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি সমুদ্রগুহার অধিবাসীরা পর্যন্ত পাহাড়চূড়ায় তার বংশীধর মূর্তি খোদাই করে। কিন্তু কয়েকটি উপজাতির সর্দাররা মেষপালকের ভক্তদের প্রাণদণ্ড দিল, তাদের মনে হয়েছিল মেষপালকের শিক্ষাবলীর মাথামুণ্ডু নেই, বিপজ্জনক সেগুলো। অবশেষে তার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাবার দিন এসে পড়ল। সে সময়কার ইতিবৃত্তে বলেছে:

'"চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত্রি ধরে আকাশ-সন্তানেরা তুমার ওপরে পড়ে। গোধূলির পর তালৎসেৎলের নক্ষত্র উঠে অসাধারণ দীপ্তিতে জ্বলন্ত, পাপচক্ষুর মতো। আকাশ-সন্তানদের অনেকে মৃতাবস্থায় পড়ে, অনেকে টুকরো টুকরো

হয়ে যায় পাহাড়ের গায়ে লেগে, অনেকে ডুবে যায় দক্ষিণ সমুদ্রে, কিন্তু তুমার বুকে পেঁাছিয়ে বেঁচে থাকে অনেকে।"

'মাগাৎসিৎলদের সেই ব্যাপক দেশান্তর যাত্রার কথা ইতিবৃত্তে এভাবে বলা হয়েছে—এরা হল পার্থিব জাতিদের একটি যারা বিশ হাজার বছর আগে মহাপ্লাবনে ধ্বংস পায়।

'ব্রোঞ্জের তৈরি ডিমের আকারের যন্ত্রে তারা আসে, যন্ত্র চলে বস্তুর বিভাজন প্রক্রিয়ার শক্তিতে। চল্লিশ দিন ধরে তারা আসে পৃথিবী থেকে।

'এ সব বিরাট ডিমের অনেকগুলো হারিয়ে যায় নক্ষত্রলোকে, মঙ্গলগ্রহের বুকে পেঁাছিয়ে চুরমার হয়ে যায় আরো অনেক। কয়েকটি নির্বিঘ্নে নামে বিষুবরেখার কাছে মহাদেশের সমভূমিতে।

'ইতিবৃত্তে বলে:

'"ডিমগুলো থেকে বেরিয়ে এল তারা, দীর্ঘদেহ, কৃষ্ণকেশ। আকাশ-সন্তানদের মুখমণ্ডল পীতবর্ণ, চেপটা। দেহ আজানু ব্রোঞ্জের বর্মাবৃত। শিরস্ত্রাণে গোঁজা ধারালো চিরুনি, শিরস্ত্রাণগুলি মুখের ওপরে আলম্বিত। আকাশ-সন্তানদের বাঁ হাতে ছোট তরবারি, আর ডান হাতে নানা সংকেত চিহ্ন চিত্রিত ছোট ছোট পুঁথি। সে সবে সর্বনাশ ঘটে তুমার দুর্ভাগ্য অজ্ঞ জনগণের।"

'এই হল মাগাৎসিৎলদের সেই দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত জাতি।

পৃথিবীতে তাদের বাসস্থান ছিল শত স্বর্ণদ্বার নগরীতে, যে নগরীকে গ্রাস করে সমুদ্র।

'এ ব্রোঞ্জের ডিম থেকে বেরিয়ে এসে তারা আওলদের সহরে ঢুকে যা খুশি তাই অধিকার করল, হত্যা করল বিরোধীদের। খাশির পাল তাড়িয়ে নিয়ে গেল মাঠে, খুঁড়ল কুয়ো। মাটি চষে যবের বীজ বসাল। কিন্তু কুয়োর জল যৎসামান্য, শুকনো অনুর্বর মাটিতে যবের শস্য নষ্ট হয়ে গেল। তখন তারা আওলদের বলল সমভূমিতে গিয়ে সেচনালী ও বড়ো বড়ো জলাশয় বানাতে।

'কয়েকটি উপজাতি সে কথা মেনে গেল সমভূমিতে। অন্য উপজাতিরা বলল, "মানব না ওদের কথা, জান নেব ওদের।" আওল সৈন্যরা সমভূমিতে গিয়ে জায়গাটা ছেয়ে ফেলল পঙ্গপালের মতো।

'নবাগতরা সংখ্যায় কম। কিন্তু তারা ছিল পাহাড়ের মতন কঠিন, সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন পরাক্রান্ত, ঝড়ের মতন দুর্ধর্ষ। আওল সৈন্যদের ছত্রাকার করে দিল তারা। পুড়িয়ে দিল নগরী। খাশির পাল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। হিংস্র চা-রা জলাভূমি থেকে বেরিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলল স্ত্রীলোক ও শিশুদের। পরিত্যক্ত বাড়িঘরদোরের চারদিকে জাল বুনে চলল মাকড়সারা। শবভুকরা—ইখিরা—এত খেল যে নড়াচড়ার আর শক্তি রইল না। ঘনিয়ে এল পৃথিবীর প্রলয়কাল।

' তখন লোকের মনে পড়ে গেল সেই দৈববাণী: "পাপের কাছে ছায়ামূর্তি হয়ে যেও, তুমার দুর্ভাগা সন্তান, আর তাহলে আকাশ-সন্তানের রক্তচক্ষু বৃথায় ভেদ করবে তোমার ছায়া।" আওলদের অনেকে গেল সয়ামের বিপুল উষ্ণ প্রস্রবণে। অনেকে গেল পাহাড়ে, তাদের মনে আশা যে কুয়াশাচ্ছন্ন গিরিখাতে আবার শুনবে উল্লার সেই পাপনাশা পূত সঙ্গীত। অনেকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল নিজেদের বিষয়সম্বল। নিজেদের এবং অন্যদের মধ্যে তারা সন্ধান করল পুণ্যের, সে পুণ্যকে অভ্যর্থনা জানাল সঙ্গীতে, আনন্দাশ্রুতে। লিজিয়াজিরার পাহাড়ে মেষপালকের শিষ্যরা তৈরি করল একটি পবিত্র দ্বারদেশ, পাপ সেঁধিয়ে গেল তার নিচে। সে দ্বারদেশকে পাহারা দিত অনন্তাগ্নির তিনটি বৃত্ত।

'আওল সৈন্যরা বিনাশ পেল। মাকড়সাভুকদের সবাই প্রাণ হারাল অরণ্যে। যে সব জেলে টিঁকেছিল তারা হল গোলাম। কিন্তু মেষপালকের শিষ্যদের অবমাননা করল না মাগাৎসিৎলরা, পবিত্র দ্বারদেশ স্পর্শ করল না তারা, গেল না সয়ামের উষ্ণ প্রস্রবণে বা গিরিখাতে, যেখানে মধ্যাদিনে হাওয়ায় ভেসে আসত রহস্যধ্বনি — উল্লার সঙ্গীত।

'এ ভাবে কেটে গেল অনেক রক্তাক্ত বিষণ্ন বছর।

'নবাগতদের সঙ্গে কোনো স্ত্রীলোক ছিল না। বিজেতারা কোনো বংশধর না রেখে বিলোপ পেত নিশ্চয়। আর তাই পাহাড়ে লুকিয়ে-থাকা আওলদের মধ্যে হাজির হল একটি

দূত — সুদর্শন একটি মাগাৎসিৎল। শিরস্ত্রাণ বা তরবারি নেই। হাতে শুধু একটি লাঠি, তাতে পশমের ফেটি লাগানো। পবিত্র দ্বারদেশের অগ্নির কাছে গিয়ে সমস্ত গিরিখাত থেকে আগত আওলদের বলল:

'"আমার মাথা ঢাকা নয়, বুক আমার অনাবৃত, মিথ্যা বললে তরবারির আঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবেন। আমরা পরাক্রান্ত। তালৎসেৎলের নক্ষত্র ছিল আমাদের করায়ত্তে। আমরা উড়ে এসেছি নক্ষত্র পথে, যার নাম ছায়াপথ। তুমা জয় করি, বিরোধী জাতিদের বিলোপ করি। তুমার অনুর্বর সমভূমি সুফলা করার জন্য জলাশয় ও বিরাট বিরাট খাল বানিয়েছি আমরা। আমরা সয়াৎসেরার মহানগরী — সূর্য নগরী বানাব, যারা বেঁচে থাকতে চায় তাদের দেব প্রাণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক নেই বলে বিধিলিপি পূরণ করার আগে লোপ পেতে হবে আমাদের। আপনাদের কুমারীদের দিন আমাদের, তাদের গর্ভ থেকে বিরাট একটি জাতির সৃষ্টি করব আমরা আর সে জাতি বাস করবে তুমা মহাদেশে। আসুন আমাদের কাছে, নির্মাণকার্যে হাত লাগান।"

'পশমের ফেটি বাঁধা লাঠি আগুনের পাশে রেখে দূত বসল পবিত্র দ্বারদেশের দিকে মুখ করে। তার চোখ নিমীলিত। আর সবাই দেখল তার কপালে তৃতীয় নেত্র, পাতলা পর্দা তার ওপর, যেন চোখটা ফুলে উঠেছে।

'আওলরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "পাহাড়ে গরুবাছুরের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই, জলও কম। শীতকালে গুহাগুলোয় জমে যাবার অবস্থা। আমাদের কুঁড়েগুলো দামাল হাওয়ায় অতল গহ্বরে গিয়ে পড়ে। দূতের কথা মেনে নিয়ে পুরোনো ঘরদোরে ফেরা যাক এবার।"

'পাহাড় ছেড়ে আওলরা চলল আজোরার সমভূমিতে, খাশির পাল সঙ্গে নিয়ে। ওদের কুমারীদের গ্রহণ করে নিজেদের ঔরসে নীল পাহাড়ে জাতির জন্ম দিল মাগাৎসিৎলরা। বানাতে শুরু করল রো-র সেই ষোলোটি বিরাট জলাশয়, বরফগলার সময়ে মেরু পাহাড় থেকে নামা জল ধরে রাখার জন্য। খাল কেটে অনুর্বর জমি সেচ করল।

'পুরোনোর ভস্মস্তূপে জেগে উঠল আওলদের নতুন নগরী, প্রচুর ফসল ফলল ক্ষেতে।

'তারপর তৈরি হল সয়াৎসেরার প্রাচীর। প্রাচীর ও জলাশয় নির্মাণের সময় অদ্ভুত যান্ত্রিক কৌশলে চালিত বিরাট ক্রেন ব্যবহার করল মাগাৎসিৎলরা। মহতী তাদের জ্ঞান, জগদ্দল পাথর সরাতে কষ্ট হল না, বেড়ে উঠল গাছপালা। নিজেদের জ্ঞান তারা লিখে রাখল বইতে — রঙীন বিন্দু আর তারার মতো দেখতে নানা চিহ্নে।

'পৃথিবী থেকে আসা লোকদের শেষজন মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেল জ্ঞান। শুধু বিশ হাজার বছর পর আমরা,

পাহাড়ে জাতির বংশধররা, সেই অতলান্তিকীয়দের রহস্যময় লিপির পাঠোদ্ধার করি।'

হঠাৎ আবিষ্কার

কোনো কিছু করার নেই, গোধূলিতে গুসেভ এ ঘর ও ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িটা বড়ো, শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার মতো করে বানানো। অনেক বারান্দা, সিঁড়ি, হল-ঘর আর গ্যালারি, সব জায়গায় ফাঁকা স্তব্ধতা। ঘুরে ঘুরে দেখে হাই তুলে গুসেভ ভাবল:

'বেটারা থাকে বেশ বড়োলোকি চালে, কিন্তু কী বিরক্তিকর!'

বাড়ির অপর প্রান্তে কণ্ঠস্বর, রান্নাঘরে ছুরি কাঁটার আর বাসনপত্রের আওয়াজ। কানে এল বাড়ির সরকার কিচির-মিচির কথার তোড়ে কাকে যেন বকে চলেছে। রান্নাঘরে গেল গুসেভ। নিচু খিলান-দেওয়া একটা ঘর। পেছন দিকটায় কয়েকটা চাটুর ওপর রান্নার তেলের দবদবে আলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় নাক টানল গুসেভ। নিজেদের বকাবকি থামিয়ে সরকার ও রাঁধুনী চুপ করে খিলানের পেছনে হটে গেল ভয়ে।

'কী ধোঁয়া রে বাবা এখানে, কী ধোঁয়া,' রুশীতে বলল গুসেভ। 'স্টোভের ওপর ঠিকমতো একটা বড় মুখওয়ালা

চিম্‌নি বসানো দরকার। এ বুনোরা আবার নিজেদের মঙ্গলগ্রহবাসী বলে!'

দুজনের ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বাইরে গেল, খিড়কির অলিন্দে গিয়ে বসল পাথরের সিঁড়ির ধাপে, পেয়ারের সিগারেট-কেসটা বের করে ধরাল একটা সিগারেট।

নিচে ঘাস-মাঠে ঝোপজঙ্গলের কাছে একটি রাখাল ছেলে দৌড়দৌড়ি করে চেঁচিয়ে খাশি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইটের গোয়ালে খাশিগুলো ডাকছে অস্পষ্ট স্বরে। গোয়াল থেকে ঘাস-ঢাকা পথে তার দিকে এল একটি মেয়ে। হাতে দুধের দুটো বালতি। হাওয়ায় হলদে ব্লাউজ কাঁপছে, নড়ছে লাল-চুল মাথায় বসানো মজার দেখতে টুপিটার ছোট চুটলা। থেমে দাঁড়িয়ে, বালতিদুটো নামিয়ে কনুই দিয়ে মুখ আড়াল করে মেয়েটি কী একটা পোকা তাড়াতে লাগল। হাওয়ায় উপরে উঠে গেল স্কার্ট। উবু হয়ে বসে পড়ে হেসে উঠল মেয়েটি, তারপর বালতিদুটো তুলে নিয়ে ছুটে এল বাড়িতে। গুসেভকে দেখে ঝকঝকে ছোট দাঁত বের করে হাসল একটু।

গুসেভ তাকে ডাকত ইখশ্‌কা বলে, তার নাম অবশ্য ইখা। সরকারের ভাইঝিটি •হাসিখুশি ধোঁয়াটে-নীল মোটাসোটা মেয়ে।

ছুটে গুসেভকে পেরিয়ে যাবার সময় তার দিকে একটু নাক কোঁচকাল মেয়েটি। গুসেভের ইচ্ছে হল আদর করে এক

ঘা দেয় ওর পেছনে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল বসে বসে। সবুর করে রইল।

সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল ইখশ্‌কা, হাতে ঝুড়ি আর একটা ছোট ছুরি। আকাশ-সন্তান থেকে একটু তফাতে বসে শাকসব্জী সাফ করতে লাগল সে, ঘন চোখের পাতা পিটপিটিয়ে। সব মিলিয়ে এটা বেশ স্পষ্ট যে মেয়েটি ফূর্তিবাজ।

'তোমাদের দেশের সব মেয়েদের রঙ নীল কেন?' রুশীতে শুধাল গুসেভ। 'বোকা মেয়ে তুমি, ইখশ্‌কা, জীবনের হালচাল নিশ্চয়ই কিস্‌সু জান না।'

জবাব দিল ইখা, আর অবাক কাণ্ড, তার মানে বুঝতে পারল গুসেভ:

'স্কুলে আমরা ধর্মপুরান পড়ি। তাতে বলে আকাশ-সন্তানরা হল ভয়ানক রগচটা লোক। বইতে বলে এক কথা, কিন্তু আসলটা অন্য রকম। আকাশ-সন্তানরা তো দেখছি আদপেই রগচটা নয়।'

'না, তারা ফূর্তিবাজ লোক,' চোখ মটকে বলল গুসেভ।

খিলখিল করে হেসে উঠল ইখা, ছুরির তলা থেকে ছিটিয়ে পড়ল খোসাগুলো।

'কাকা বলেন যে আকাশ-সন্তানরা চোখের দৃষ্টিতে মানুষকে ভস্ম করে ফেলতে পারে। এখনো তো সেরকম দেখলাম না।'

'তাই নাকি? কী দেখেছ তাহলে?'

'শুনুন, আমাদের ভাষায় জবাব দিন তো,' বলল ইখশ্‌কা, 'আপনাদের ভাষাটাষা বুঝিনে বাপু।'

'তোমাদের ভাষা বললে কিম্ভূত ঠেকে কানে।'

'কী বললেন?' ছুরিটা নামিয়ে রাখল ইখা। হাসিতে পেটে খিল লেগে যাবার জোগাড়। 'আমার তো মনে হয়, লাল তারার আপনারা আর আমরা সবাই সমান।'

গলা খাঁকারি দিয়ে কাছ ঘেঁষে বসল গুসেভ। ঝুড়ি তুলে নিয়ে সরে গেল ইখা। কেশে আরো কাছে সরে বসল গুসেভ। ইখা বলল:

'সিঁড়িতে ঘষটে ঘষটে পোষাক নষ্ট হয়ে যাবে যে।'

কথাটা হয়ত ইখা বলেছিল অন্য কোনো ধরনে, কিন্তু গুসেভ বুঝল এ ভাবে।

একেবারে পাশ ঘেঁষে বসেছে তখন। ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ইখশ্‌কা। মাথা একপাশে হেলে গেল, আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস, এবার আগের চেয়ে জোরে। গুসেভ তাড়াতাড়ি চারদিক দেখে নিয়ে হাত রাখল ওর কাঁধে। ইখা পিছনে হেলে বসল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল তার দিকে। ঠোঁটে জোর একটা চুমু বসিয়ে দিল গুসেভ। ইখা ঝুড়ি আর ছুরিটা আঁকড়ে ধরল প্রাণপণ শক্তিতে।

'কেমন, হল তো, ইখশ্‌কা!' তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ছুটে পালাল ইখশ্‌কা।

গোঁফে তা দিতে দিতে বসে রইল গুসেভ। মুখে হাসি। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে তারার ঝিকিমিকি। ঝাঁকড়া-লোম ছোট কী একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে একেবারে সিঁড়ির কাছে এসে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল গুসেভের দিকে। গুসেভ নড়ে ওঠাতে হিসহিসিয়ে উঠে জন্তুটা অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ার মতো।

'না এসব ছেলেখেলা চলবে না,' বলে গুসেভ বেল্টে একটা টান দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। হঠাৎ বারান্দায় সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল ইখশ্কার সঙ্গে। গুসেভ ইসারা করাতে দুজনে চলল বারান্দা হয়ে। মঙ্গলগ্রহের ভাষায় গুসেভ বলতে শুরু করল, কণ্ঠে ভুরু কুঁচকিয়ে:

'ইখশ্কা, একটা কথা বলি: দরকার হলে তোমাকে বিয়ে করব। আমার কথা মেনে চলা চাই।' (দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইখা ঠোঁট ফোলাল। দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে এনে জোরে তার হাত চেপে ধরল গুসেভ।) 'হয়েছে, হয়েছে, ঠোঁট আর ফোলাতে হবে না, এখনি তো বিয়ে করিনি। শোনো, আমি, আকাশ-সন্তান, এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। তোমাদের দেশে আমার জরুরী কাজ আছে। কিন্তু এখানে আমি নতুন লোক, তোমাদের হালচাল জানি না। আমাকে সাহায্য না করলে চলবে না। কিন্তু, মিথ্যে কথা বোলো না যেন। বলো তো, তোমাদের কর্তা কে?'

'আমাদের কর্তা?' গুসেভের অদ্ভুত কথা বোঝার চেষ্টা

করতে করতে ইখা বলল, 'আমাদের কর্তা, তিনি তুমার সমস্ত দেশের অধিপতি।'

'তাই নাকি!' থেমে দাঁড়াল গ্নুসেভ। 'সত্যি বলছ?' (কানের পেছনটা চুলকে নিল একবার।) 'তাঁর উপাধি কী? রাজা, না অন্য কিছু? কী কাজ তাঁর?'

'তাঁর নাম তুস্কুব। তিনি আএলিতার বাবা। সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান তিনি।'

'ও, বুঝেছি।'

নিঃশব্দে কয়েক পা এগোল গ্নুসেভ।

'আচ্ছা, ইখশ্‌কা, ওই ঘরটায় একটা মায়া-মুকুর দেখলাম। আর একবার দেখতে পেলে ভালো হয়। ওটা কী করে কাজ করে দেখাও তো।'

দুজনে ঢুকল একটা সরু, আধো-অন্ধকার ঘরে, নিচু আরাম-চেয়ার সেখানে। দেয়ালে মায়া-মুকুরের দীপ্তি। পর্দার পাশে একটা আরাম-চেয়ারে পা এলিয়ে বসল গ্নুসেভ। ইখা জিজ্ঞেস করল:

'আকাশ-সন্তান কী দেখতে চান?'

'সহরটা দেখাও।'

'এখন তো রাত, সব কাজ থেমে গেছে, কলকারখানা দোকানপত্তর সব বন্ধ, পথে লোক নেই। হয়ত আমাদের আমোদ-প্রমোদ কী রকম দেখতে চান?'

'তাই দেখি।'

সুইচবোর্ডের একটা ফুটোয় প্লাগ লাগিয়ে লম্বা একটা দড়ির কোণ ধরে ইখা সরে এল আরাম-চেয়ারটার কাছে, যেটাতে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসেছিল গুসেভ।

'উৎসব চলেছে দেখুন,' দড়িতে টান দিয়ে বলল ইখা।

হাজার লোকের কণ্ঠস্বর আর হৈহৈতে ঘর ভরে গেল। জ্বলে উঠল আয়নাটা। জমকালো পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল কাঁচের খিলান-দেওয়া ছাদ। আলোর চওড়া রেখা পড়েছে প্রকাণ্ড পতাকায়, পোস্টারে, রকমারি রঙের ধোঁয়ার মেঘে। নিচে জনসমুদ্রের জোয়ার। এখানে-সেখানে, উপরে, নিচে বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা মূর্তি উড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর কাঁচের খিলান, পরস্পরকে বিদ্ধ-করা আলোর রেখা, উদ্বেল জনতা, সব সরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'কী করছে ওরা?' এত হট্টগোল যে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে হল গুসেভকে।

'পূত ধূপ নিশ্বাস ভরে নিচ্ছে। দেখছেন তো ধোঁয়ার কুণ্ডলী? খাভ্‌রা পাতার ধূপ, অত্যন্ত মহার্ঘ, আমরা বলি চিরজীবীর ধূপ। এ ধূপ যে নিশ্বাসভরে নেয় অদ্ভুত সব জিনিস সে দেখে — মনে হয় তার কখনো মৃত্যু হবে না। অদ্ভুত সব জিনিস সে দেখে আর বোঝে। অনেকের কানে আসে উল্লার ধ্বনি। ঘরে বসে এ ধূপ খাওয়া বারণ — খেলে মৃত্যুদণ্ড। ধূপ আঘ্রাণের অনুমতি দিতে পারে শুধু সর্বোচ্চ

পরিষদ। এ বাড়িতে বছরে মাত্র বারো বার খাভ্রার পাতা জ্বালানো হয়।'

'আর ওরা, ওরা কী করছে?'

'ওরা সংখ্যাচক্র ঘোরাচ্ছে। ঠিক নম্বরটা পাবার জন্য। আজ যে কোনো একটা নম্বর সবাই আঁচ করে নিতে পারে। যে সঠিক নম্বর আঁচ করে তাকে আর কখনো কাজ করতে হয় না। সর্বোচ্চ পরিষদের কাছ থেকে পায় সুন্দর বাড়ি, জমি, দশটা খাশি আর ডানাওয়ালা একটা নৌকো। ঠিক নম্বরটা আঁচ করা সৌভাগ্যই বটে।'

আরাম-কেদারার হাতলে বসে ইখা বোঝাচ্ছে, গুসেভ ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ইখা, বসে রইল চুপ করে। সেই মায়া-মুকুরে অদ্ভুত সব জিনিস দেখে গুসেভ অবাক। 'ওরে বাবা! শয়তানের কাণ্ড! গুণ্ডাগুলোর রকম দেখ!' তারপর অন্য কিছু দেখাতে বলল ইখাকে।

আরাম-চেয়ারের হাতল থেকে নেমে ইখা আয়নাটা নিভিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ সংখ্যা-আঁকা বোর্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল — ঠিক জায়গায় প্লাগটা বসছে না। যখন ফিরে এসে আরাম-চেয়ারের হাতলে আবার বসে দড়ির বোতামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল তখন তার মুখটা হতভম্ব গোছের দেখাল। গুসেভ মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসাতে তার চোখে এল আতঙ্কের ছাপ।

'তোমার সত্যি বিয়ে করার সময় হয়েছে, সখী।'

অন্যদিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ইখশ্কা। তার পিঠ চাপড়াতে লাগল গুসেভ, বেড়ালের মতন নরম পিঠে।

'ভারি মিষ্টি তুমি, নীল মেয়ে।'

আদরে গলে গিয়ে, দড়িতে একটা টান দিয়ে ইখা বলল, 'দেখুন, কী মজার ব্যাপার।'

জ্বলে-ওঠা দর্পণের অর্ধেকটা ঢেকে গেল কার যেন পিঠে। কানে এল কার কঠিন কণ্ঠস্বর, প্রত্যেকটি কথা বলছে আস্তে আস্তে। নড়ে উঠে সে পিঠ সরে গেল আয়নার বুক থেকে। গুসেভ দেখল ঘরের অন্য কোণে চারকোণা থামের ওপর দীর্ঘ একটি খিলানের অংশ, সোনালি লেখা ও জ্যামিতিক সংখ্যায় কীর্ণ দেয়ালের একটা ভাগ। নিচে টেবিল ঘিরে মাথা হেঁট করে বসে আছে তারা যাদের সে হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমে দেখেছিল নিরানন্দ দালান-বাড়িটার সিঁড়িতে।

ব্রোকেড-ঢাকা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আএলিতার বাবা, তুস্কুব। পাতলা ঠোঁট নড়ছে, সোনালি কাজ-করা আলখাল্লার ওপর নড়ছে কালো দাড়ি। পাথরের মতো চেহারা। নিষ্প্রভ মরা চোখ সোজা নিবদ্ধ আয়নায়। কথা বলছে তুস্কুব, কথাগুলি অবোধ্য হলেও ভয়ঙ্কর। কয়েকবার উচ্চারণ করল 'তালৎসেৎল'। হাতের মুঠিতে আঁকড়ে-ধরা পুঁথিটা এমনভাবে নামাল যেন কাকে খুন করবে। মুখোমুখি উপবিষ্ট, চওড়া বিবর্ণ মুখ

একটি লোক হঠাৎ পাগলের মতো দাঁড়িয়ে উঠে সাদা চোখে ঝিলিক এনে বলল চেঁচিয়ে:

'ওরা নয়, তুমি, তুমি!'

চমকে উঠল ইখশ্কা। আয়নার দিকে মুখ করে বসে থাকলেও এতক্ষণ কিছু দেখেনি বা শোনেনি সে, আকাশ-সন্তানের বিরাট হাত তার পিঠ চাপড়ে চলেছিল। আয়নায় মঙ্গলগ্রহবাসীর চিৎকার, গুসেভের বার বার প্রশ্ন — 'ওরা কী নিয়ে কথা বলছে, কী নিয়ে?' শুনে সে শুধু চমকে উঠল, হাঁ করে তাকিয়ে রইল আয়নায়। হঠাৎ করুণা-মাখানো সুরে কী বলে দড়িটা টানল।

আয়নার আলো নিভে গেল।

'ভুল করেছি ... ভুল চাবিটা টিপেছিলাম ... সর্বোচ্চ পরিষদের গোপন কথা শোনার সাহস নেই কোনো শখোর।' ইখশ্কার দাঁত ঠকঠক করতে লাগল। লাল চুল টেনে হতাশায় ফিসফিস করে বলল, 'ভুল করেছি। আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে পাঠিয়ে দেবে কোনো গুহায়, চিরতুষারের কোনো জায়গায়।'

'আরে আরে, কী হল, আমি কাউকে বলব না ইখশ্কা,' বলে গুসেভ ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে হাত বোলাতে লাগল, আঙ্গোরা বেড়ালের মতন নরম উষ্ণ চুল। শান্ত হয়ে চোখ বুজল ইখশ্কা।

'কী বোকা মেয়ে! মানুষ না জন্তু? বোকা নীল মেয়ে!'

কানের পিছনে আস্তে আস্তে চুলকে দিল গুসেভ, তার স্থির বিশ্বাস যে এতে বেশ ভালো লাগছে ইখশ্‌কার। পা গুটিয়ে নিয়ে একেবারে গোল হয়ে গেল ইখশ্‌কা। চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করে উঠল, খিড়কির অলিন্দে দেখা সেই জানোয়ারটার চোখের মতো। আতঙ্ক হল গুসেভের।

ঠিক সে মুহূর্তে শোনা গেল লস ও আএলিতার পায়ের শব্দ ও গলার স্বর। আরাম-চেয়ার থেকে নেমে স্খলিত পায়ে ইখশ্‌কা গেল দরজার দিকে।

সে রাত্রে লসের শোবার ঘরে গিয়ে গুসেভ বলল:

'আমাদের ব্যাপারস্যাপার মোটেই ভালো চলছে না, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। একটা মেয়েকে বুঝিয়ে বললাম আয়নাটা চালু করতে, দুজনে হঠাৎ দেখলাম সর্বোচ্চ পরিষদের একটা অধিবেশন চলেছে। যা বুঝলাম তাতে মনে হল আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া চাই। ওরা আমাদের খুন করবে, সত্যি বলছি, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। শেষরক্ষা হবে না।'

কথা কানে গেল না লসের। স্বপ্নালু চোখে চেয়ে রইল সঙ্গীর দিকে, মাথার নিচে হাত রেখে।

'সব যাদু, আলেক্সেই ইভানভিচ, সব যাদু। আলোটা নিভিয়ে দিন তো।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেজার গলায় গুসেভ বলল:

'বেশ!'

তারপর শুতে চলে গেল।

আএলিতার সকাল

ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে আএলিতার। কনুই-এ হেলান দিয়ে শুয়ে আছে সে। সেখানকার প্রথা মতো, শোবার ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় তার চওড়া চারদিক খোলা খাট। গম্বুজের মতো ছাদ শেষ হয়েছে মার্বেলের ফ্রেম-দেওয়া উঁচু স্কাইলাইটে। সকালের আলো ঘরে এসে পড়েছে সেখান থেকে। দেয়ালের বিবর্ণ মোজেইক নকসা অন্ধকারে দেখা যায় না। আলোর রেখা শুধু পড়েছে ধবধবে সাদা চাদরে, বালিশে আর হাতে ন্যস্ত আএলিতার ধূসর মাথায়।

রাতটা ভালো কাটেনি তার। অদ্ভুত ও ভয়াবহ স্বপ্নের টুকরো বিশৃংখলভাবে ভেসে গিয়েছে বন্ধ চোখের সামনে। পাতলা ঘুম, জলের হালকা পর্দার মতো। সারা রাত মনে হয়েছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্তিকর কী সব ছবি দেখেছে, অলসভাবে ভেবেছে আর ভেবেছে, স্বপ্নগুলো কী নিষ্ফল।

সকালের সূর্য হানা দিল স্কাইলাইটে, আলো পড়ল বিছানায়। তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একেবারে জেগে উঠল আএলিতা, শুয়ে রইল, না নড়েচড়ে। চিন্তাগুলি এখন স্বচ্ছ, কিন্তু রক্তে এখনো ঝাপসা আতঙ্কের ব্যাকুলতা। এটা অত্যন্ত খারাপ, সত্যি খারাপ।

‘রক্তের এই ব্যাকুলতা, মনের এই তোলপাড় — এ হল সুদূর অতীতে মিছিমিছি ফেরা। রক্তের ব্যাকুলতা — তার

মানে ফিরে যাওয়া গুহায়, জানোয়ারের পালে, শিবির অগ্নিতে। বাসন্তী হাওয়া, ব্যাকুলতা, আবার জন্ম। জীবের জন্ম দেওয়া, পালন করা, তারপর আবার মৃত্যু ও সমাধি। আবার মায়ের যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা। ব্যর্থ, অন্ধ প্রজনন শুধু।'

এ কথা ভাবল আএলিতা। চিন্তাগুলো জ্ঞানীর মতো, কিন্তু রক্তে সে ব্যাকুলতা তখনো বেজে চলেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে খড়ের চটি পরল, নগ্ন কাঁধে আলখাল্লা চাপিয়ে গেল স্নানের ঘরে। সেখানে কাপড় ছেড়ে, শক্ত করে চুল বেঁধে নিয়ে মার্বেলের চৌবাচ্চায় নামল।

সবচেয়ে নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ল আএলিতা। জানলা দিয়ে আসা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে কী ভালো না লাগে! আলোর খেলা দেয়ালে। নীলচে জলের দিকে তাকিয়ে দেখল নিজের ছায়া, আলোর একটা রেখা পড়েছে পেটে। বিতৃষ্ণায় কেঁপে উঠল উপরের ঠোঁট। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ দিল সে।

স্নান করে বেশ তাজা লাগছে, মন ফিরে গেছে প্রাত্যহিক কাজের চিন্তায়। প্রতিদিন সকালে সে কথা বলে বাপের সঙ্গে, এই ছিল প্রথা। তার ঘরে সে জন্য ছোট একটি আয়না আছে।

আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়ানো হল, মুখে ঘাড়ে আর হাতে সুগন্ধি ক্রীম তার পুষ্পসার মেখে, সন্দিগ্ধ চাউনিতে নিজেকে দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। পর্দা-লাগানো ছোট টেবিলটা কাছে টেনে নিয়ে সংকেত-বোর্ডের সুইচ টিপল।

মায়া-মুকুরে ভেসে এল বাপের সেই পরিচিত পড়ার ঘর: বই-এর আলমারি, ঘুরন্ত ত্রিশির কাচের কলমে মানচিত্র আর নানা নকসা। তুস্কুব ঘরে ঢুকে টেবিলের পাশে বসে কনুই দিয়ে কয়েকটা পাণ্ডুলিপি সরিয়ে দিয়ে চোখ রাখল আএলিতার চোখে। পাতলা লম্বা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল:

'ভালো ঘুম হয়েছিল তো, আএলিতা?'

'হ্যাঁ। বাড়ির সবাই ভালো।'

'আকাশ-সন্তানেরা কী করছে?'

'ওরা আরামে আছে। এখনো জাগেনি।'

'ওদের পড়াশুনো চলেছে তো?'

'না। ইঞ্জিনিয়ার স্বচ্ছন্দে কথা বলে। আর ওর সঙ্গী যা জানে, যথেষ্ট।'

'এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় কি ওরা?'

'না, না বাবা।'

উত্তরটা আএলিতা দিয়েছিল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। নিষ্প্রভ চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে তাকাল তুস্কুব। সে দৃষ্টির সামনে চেয়ারে যতটা পারে ততটা সরে গেল আএলিতা। তার বাবা বলল:

'বুঝলাম না ব্যাপারটা ...'

'কী বোঝোনি? আমাকে সব কথা বলছ না কেন, বাবা? ওদের কী করবে বলে ঠিক করেছ? দোহাই তোমার ...'

কথাটা শেষ করল না আওলিতা, তুস্কুবের মুখ নিদারুণ ক্রোধে বিকৃত। ম্লান হয়ে এল আয়না। তবু আয়নার ধোঁয়াটে বুকে আওলিতা তখনো তাকিয়ে রইল, দেখল বাবার সেই মুখ, যে মুখ সমস্ত জীব এবং তার কাছেও অতি ভয়াবহ।

'কী ভয়ংকর', বলল আওলিতা, 'সর্বনাশ হবে দেখছি।' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে, তার হাতদুটো ঝুলে পড়ল, আবার সে বসল চেয়ারে।

ঝাপসা ব্যাকুলতা আবার বেশি করে হানা দিয়েছে তাকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আয়নায় নিজের দিকে। রক্তে ব্যাকুল স্পন্দন, শরীর শিউরে উঠেছে। 'কোনো মাথামুণ্ডু নেই, কী ছাই।'

ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোখের সামনে ভেসে এল আকাশ-সন্তানের মুখ, ঠিক রাত্রের স্বপ্নে দেখার মতো, বলিষ্ঠ সে মুখ, বরফের মতন ধবধবে সাদা চুল, অস্থির মুখের ভাব বার বার বদলে যাচ্ছে বিনা কারণে, চোখ জোড়া কখনো করুণ, কখনো স্নিগ্ধ, তাতে পৃথিবীর সূর্যের, পৃথিবীর জলহাওয়ার আভাস; সে চোখ কুয়াশাচ্ছন্ন অতল গহ্বরের মতো সর্বনেশে, ঝড়ের অস্থিরতা, মনের সর্বনাশ তাতে।

মাথা নাড়ল আওলিতা। যন্ত্রণায় ঢিপঢিপ করছে বুক। ঝুঁকে পড়ে সুইচবোর্ডে প্লাগ বসাল। মায়া-মুকুরে দেখা গেল অনেকগুলো বালিশের মাঝখানে বসে ঝিমন্ত একটি লোলচর্ম বৃদ্ধের মূর্তি। ছোট জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে নরম

কম্বলে রাখা তার কুঞ্চিত হাতে। চমকে উঠে বৃদ্ধ ঝুলে-পড়া চশমা ঠিক করে নিল, চশমার উপর দিয়ে আয়নার দিকে তাকাতে দন্তহীন মুখে এল হাসি।

'কী বলছিস, বাছা?'

'গুরুদেব, বড্ড ব্যাকুল লাগছে,' বলল আএলিতা। 'ঠিক ভাবে ভাবতে পারছি না। এ-রকমটা আমি চাই না। ভয় করছে, কিন্তু কিছু করতে পারছি না।'

'আকাশ-সন্তান তোর অস্থিরতার কারণ?'

'হ্যাঁ। ওর মধ্যে যেটা বুঝি না সেটা আমাকে অস্থির করে তুলছে। গুরুদেব, এইমাত্র বাবার সঙ্গে কথা হল। উনি বিচলিত। আমার মনে হয় সর্বোচ্চ পরিষদের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধেছে। আমার ভয় হয় পাছে ওরা ভয়ঙ্কর কিছু একটা সিদ্ধান্ত করে বসে। আপনার সাহায্য চাই।'

'তুই এইমাত্র বললি আকাশ-সন্তান তোর অস্থিরতার কারণ। ও একেবারে উধাও হয়ে গেলে ভালো।'

'না!' সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে, উত্তেজিতভাবে বলে উঠল আএলিতা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল বৃদ্ধ। শীর্ণ ঠোঁট চিবোল একবার।

'তোর ভাবনার রকমসকম আমি ঠিক ধরতে পারছি না, আএলিতা। তোর কথাবার্তায় যুক্তি যেমন আছে তেমন আছে গোলমেলে ভাব।'

'আমারো তাই মনে হয়।'

'দোষের স্পষ্ট লক্ষণ সেটা। উচ্চতম চিন্তা হল স্পষ্ট, আবেগবিহীন, তাতে গোলমেলে ভাব থাকে না। তুই যা বলিস করব। তোর বাবার সঙ্গে আলাপ করে দেখব। তিনিও অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ, ফলে হয়ত এমন কিছু একটা করে বসবেন যেটা বুদ্ধি বা ন্যায়সঙ্গত হবে না।'

'সেই আশায় থাকব।'

'অস্থির হোস্‌নে আএলিতা, একাগ্র হ। নিজের মনের ভেতরটা তলিয়ে দেখ। তোর এত ব্যাকুলতা কেন? সিঁদুরে মেঘের মতো রক্তের অতল থেকে উঠে আসছে আদিম স্মৃতি, এটা হল জীবনের জের টেনে চলার তৃষ্ণা। তোর রক্তে এসেছে বিদ্রোহের ভাব...'

'গুরুদেব, ও আমাকে অস্থির করে অন্যভাবে।'

'দেখ, তোর মধ্যে ও যে ভাব আনে সেটা হতে পারে খুব মহান, কিন্তু তোর ভেতরকার নারী একদিন জেগে উঠবে, তুই মারা পড়বি। আএলিতা, নির্বিকার জ্ঞান শুধু, সমস্ত কিছু প্রাণীর অমোঘ মৃত্যুর চিন্তা—ক্লেদ ও কামনার নাগপাশে বদ্ধ জড় দেহের বিনষ্টির চিন্তা, জীবনের খিন্ন অভিজ্ঞতায় নিরাসক্ত তোর শুদ্ধ আত্মা কখন চেতনার সীমারেখা অতিক্রম করে নির্বাণ পাবে, তার প্রতীক্ষা—এই একমাত্র আনন্দ। আর তুই চাস প্রত্যাবর্তন। বাছা, এই মোহ এড়িয়ে চলা দরকার। পাহাড় থেকে পতন সোজা, কিন্তু ওঠাটা সময়সাপেক্ষ, কষ্টকর। জ্ঞান হারালে তোর চলবে না।'

কথাটা শুনে আএলিতার মাথা হেঁট হয়ে গেল ...

হঠাৎ সে বলে উঠল, কম্পিত ওষ্ঠাধরে, বাসনায় ব্যাকুল চোখে, 'গুরুদেব, আকাশ-সন্তান বলেছে যে পৃথিবীতে ওরা জানে যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের চেয়ে বড়ো জিনিস। সেটা কী আমি বুঝিনি। তাই আমার এই অস্থিরতা। কাল আমরা হ্রদে গিয়েছিলাম। লাল তারা উঠল, ও দেখিয়ে বলল, "একে ঘিরে রেখেছে ভালোবাসার কুয়াশা। যে লোক একবার ভালোবেসেছে সে কখনো মরে না," বাসনায় আমার বুক দীর্ণ হয়ে গেল, গুরুদেব।'

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। শুধু জীর্ণ হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'বেশ,' অবশেষে সে বলল, 'আকাশ-সন্তান তাহলে তোকে জ্ঞানামৃত দিক। সব জেনে নেবার আগে আমাকে আর জ্বালাস নে। কিন্তু সাবধানে থাকিস।'

মিলিয়ে গেল আয়নার আলো। ঘরে কোনো সাড়া নেই। কোল থেকে রুমাল তুলে মুখ মুছে নিজেকে একবার খুঁটিয়ে সাবধানে দেখে নিল আএলিতা। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল। একটা ছোট কাস্কেট খুলে ঝুঁকে হাতড়িয়ে একটা জিনিস পেয়ে গলায় পরল। অদ্ভুত জন্তু ইন্দ্রির ছোট শুকনো একটা থাবা, বহুমূল্য কবচে বসানো। বহুদিনকার বিশ্বাস এটা বিপদের সময় মেয়েদের রক্ষাকবচ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাইব্রেরীতে গেল আএলিতা। জানলার ধারে বসে বই পড়ছিল লস, তাকে দেখে দাঁড়াল। তার দিকে তাকাল আএলিতা — বড়োসড়ো, সদয়, বিব্রত চিন্তিত মানুষটি। দেখে উষ্ণতায় বুক ভরে গেল। বুকের ওপরে, অদ্ভুত জন্তুটির থাবার ওপরে হাত রেখে আএলিতা বলল:

'কাল কথা দিয়েছিলাম অতলান্তিকীয়দের অন্তিম কালের কথা বলব। বসুন, বলি।'

আএলিতার দ্বিতীয় গল্প

আএলিতা বলে চলল: 'রঙীন পুঁথিতে আমরা যা পড়লাম তা হল এই:

'সুদূর সেই অতীতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থান ছিল শত স্বর্ণদ্বার নগরী, সমুদ্রের অতলে এখন যেটা। এ নগরী থেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে জ্ঞান ও বিলাসের মোহ। পৃথিবীর নানা জাতিকে আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় আদিম লোভ। এমন সময় এল যখন তরুণ জাতি শাসকদের চড়াও করে অধিকার করে নিল নগরী। সাময়িকভাবে ম্লান হয়ে গেল সভ্যতার আলো। সময় কাটল, তারপর আবার নতুন তেজে, বিজেতাদের তাজা রক্তে শক্তি সঞ্চয় করে জ্বলে উঠল সে আলো।

কেটে গেল অনেক শতাব্দী। আবার যাযাবরদের পঙ্গপাল ছেঁকে ধরল অনন্ত নগরীকে।

'শত স্বর্ণদ্বার নগরীর গোড়াপত্তন করে জেম্‌জে উপজাতির আফ্রিকাবাসী নিগ্রোরা। তারা ভাবত তারা হল কনিষ্ঠতম শাখা সেই কৃষ্ণ জাতির যে জাতি অতি সুদূর অতীতে বাসা বেঁধেছিল গোয়ান্‌দান্‌ মহাদেশে। গোয়ান্‌দান্‌ প্রশান্ত মহাসাগরের মহা প্লাবনে ধ্বংস হয়। কৃষ্ণ জাতির যারা বেঁচে রইল তারা বিভক্ত হয়ে গেল বহু উপজাতিতে। তাদের অনেকে ফিরে গেল বন্য দশায়। কিন্তু তবু নিগ্রোদের রক্তে টিঁকে রইল নিজেদের মহান অতীতের স্মৃতি।

'জেম্‌জের লোকেরা ছিল অতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ। অসাধারণ একটা গুণ ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য: প্রকৃতি ও জিনিসের আকার দূর থেকে তারা আঁচ করে নিতে পারত, চুম্বক যেমন চুম্বকের অস্তিত্ব টের পায়, ঠিক তেমনি ভাবে। গ্রীষ্মমণ্ডলের বনেজঙ্গলে অন্ধকার গুহায় থাকার সময় এ গুণ বৃদ্ধি পায়।

'বিষাক্ত গথ-মাছির তাড়নায় বনজঙ্গল ছেড়ে জেম্‌জে জাতি চলল পশ্চিম দিকে, থাকবার মতো একটা জায়গার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত। জায়গাটা পাহাড়ে মালভূমি, দুধারে বিরাট নদী।

'জায়গাটায় অনেক ফল আর শিকারের জন্তুজানোয়ার;

পাহাড়ে—সোনা, টিন আর তামা। বন, পাহাড় আর শান্ত নদী, সব সুন্দর; সর্বনেশে জ্বরের প্রকোপ নেই।

'বুনো জন্তুদের এড়াবার জন্য জেম্‌জের লোকেরা দেয়াল তুলল, বানাল পাথরের দীর্ঘ একটা পিরামিড, তার মানে এখানে তারা বাসা গেড়েছে।

'পিরামিডের ওপরে তারা বসাল ক্লিৎলির পালকের গোছাসুদ্ধ একটা থাম। ক্লিৎলি তাদের অধিষ্ঠাত্রী পাখি, দেশান্তরের সময় পথে গখ-মাছির হাত থেকে রেহাই দেয় এই পাখি। জেম্‌জের সর্দাররা মাথায় গুঁজত পালক, পাখির নামে নিজেদের নাম রাখত।

'মালভূমির পশ্চিমে বসতি ছিল লোহিত জাতির। জেম্‌জের লোকেরা তাদের ওপর চড়াও করে বন্দী করল, তাদের দিয়ে চাষবাস, ঘরদোর তৈরি ও আকরিক আর সোনা তোলাতে লাগল। নগরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে, লোহিত জাতিরা আতঙ্কে অস্থির, কেননা জেম্‌জের লোকেরা ছিল বলিষ্ঠ, শত্রুদের মৎলব আঁচ করতে পারত তারা, দূর থেকে কাঠের বাঁকা অস্ত্র দিয়ে শত্রু হননের ক্ষমতা ছিল তাদের। গাছের বাকলে তৈরি নৌকোয় তারা বিরাট নদী পারাপার করত, ভেট নিত লোহিত জাতিদের কাছ থেকে।

'জেম্‌জের বংশধররা পাথরের গোল গোল, নলখাগড়া-ছাওয়া বাড়ি দিয়ে নিজেদের সহরের শোভা বাড়াল। পশম থেকে বানাল অদ্ভুত সুন্দর কাপড়, নকসার সাহায্যে নিজেদের

ভাবনা চিন্তা লিপিবদ্ধ করার শক্তি ছিল তাদের। বিগত প্রাচীন সভ্যতার এ প্রয়োগ কৌশল সঞ্চিত ছিল তাদের স্মৃতির গভীরে।

'কয়েকটি শতাব্দী কেটে গেল। পশ্চিমে লোহিত জাতিদের মধ্যে দেখা দিল শক্তিমান এক নেতা। তার নাম উরু। সহরে জন্ম তার, কিন্তু যৌবনে সে চলে যায় স্তেপের যাযাবর ও শিকারীদের কাছে। অসংখ্য যোদ্ধা জড়ো করে সহর আক্রমণ করল উরু।

'আত্মরক্ষার জন্য জেম্‌জের লোকেরা তাদের সমস্ত জ্ঞান নিয়োগ করল: আগুন ছড়াল শত্রুদের দিকে, লেলিয়ে দিল উন্মত্ত ষাঁড়ের পাল, বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রগতি অস্ত্র ছুঁড়ল, যে অস্ত্র ফিরে আসে। কিন্তু সংখ্যায় ও লোভের তীব্রতায় বলীয়ান ছিল লোহিতদেহরা। সহর জয় করে ধূলিসাৎ করে দিল তারা। নিজেকে শাহেনসা বলে ঘোষণা করল উরু। লোহিত যোদ্ধাদের হুকুম দিল জেম্‌জের কুমারীদের গ্রহণ করতে। বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া বিজিতদের বাকিরা সহরে ফিরে এসে বিজেতাদের বশ্যতা স্বীকার করল।

'লোহিতদেহরা আয়ত্ত করে নিল জেম্‌জের জ্ঞান বিদ্যা, আচার ও শিল্পকলা। বর্ণসংকরতার গুণে জন্ম নিল অনেক প্রশাসক ও বিজেতা। আর দূর থেকে বস্তুর প্রকৃতি আঁচ করে নেবার সেই রহস্যময় ক্ষমতা সঞ্চারিত হল বংশ পরম্পরায়।

'উর বংশীয় সেনাপতিরা রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে চলল। পশ্চিমের যাযাবররা লোপ পেল তাদের হাতে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তারা মাটি ও পাথরের পিরামিড বসাল। পূবে তারা হটিয়ে দিল নিগ্রোদের। নাইগার ও কঙ্গোর তীরে, ভূমধ্যসাগরের সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুর উপকূলে অনেক দুর্গম কেল্লা তারা বানাল। যুদ্ধের আর নির্মাণের কাল সেটা। সে সময় জেম্‌জে ভূমি হামাগান নামে পরিচিত ছিল।

'নগরীর চারপাশে তৈরি করা হল নতুন প্রাচীর, সোনার পাত দেওয়া একশ দরজা তাতে। পৃথিবীর সবখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এল লোভ ও কৌতূহলের তাড়নায়। বাজারে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, দেয়ালের নিচে তাঁবু-ফেলা জাতিদের মধ্যে দেখা দিল একদল অচেনা লোক। ঘন জলপাই রঙ, সরু জ্বলজ্বলে চোখ, পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক। বুদ্ধিমান ও ধূর্ত লোক। কেমন করে নগরীতে এসে পড়েছে কেউ জানে না। এক পুরুষ পরে শত স্বর্ণদ্বার নগরীর বিজ্ঞান ও ব্যবসা চলে এল ক্ষুদ্র এই জাতিটির হাতে। তারা নিজেদের "আয়ামের সন্তান" বলে পরিচয় দিত।

'আয়ামের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ যারা তারা জেম্‌জের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করল, চর্চা করত লাগল ক্ষমতার যার ফলে বস্তুর প্রকৃতি বোঝা যায়। মাটির নিচে তারা বানাল "নিদ্রিত নিগ্রো মাথার" মন্দির, রোগীকে আরোগ্য

ক'রে, লোকের ভাগ্য গণনা ক'রে ও বিশ্বাসীদের প্রেতের ছায়ামূর্তি দেখিয়ে আকর্ষণ করল জনগণকে।

'ঐশ্বর্য ও মহতী বিদ্যার গুণে আয়ামের সন্তানরা দেশের শাসন কার্যে ঢুকে পড়তে সমর্থ হল। অনেক জাতিকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে তারা তাদের বলল নতুন বিশ্বাসের নামে তারা যেন সহরের ভেতরে ও বাইরে বহুদূরে বিদ্রোহ করে। রক্তাক্ত যুদ্ধে লোপ পেল উরুর রাজবংশ। ক্ষমতা চলে এল আয়ামের সন্তানদের হাতে।

'সেই প্রাচীন যুগে ঘটল পৃথিবীর প্রথম মহাভূমিকম্প। পাহাড়ের অনেক জায়গা দীর্ণ করে ঝলকে উঠল অগ্নিশিখা, ভস্মমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ। অতলান্তিক মহাদেশের দক্ষিণে অনেক বিরাট খণ্ড ডুবে গেল সমুদ্রের অতলে। উত্তরে সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে গিরিবন্ধুর অনেক দ্বীপ ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে ইউরোপীয় সমভূমির গোড়াপত্তন করল।

'উরু বংশ দ্বারা পরাজিত ও নির্বাসিত অনেক জাতির মধ্যে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে আয়ামের সন্তানদের শক্তি ও শাসন। যুদ্ধে আসক্তি ছিল না আয়ামের সন্তানদের। "নিদ্রিত নিগ্রো মাথা"র প্রতীকে জাহাজ সাজিয়ে, মশলা, কাপড়, সোনা ও হাতির দাঁতে বোঝাই করে ধর্মবিশ্বাসীরা সওদাগর ও চিকিৎসকের বেশে জাহাজে করে যেত দূর দূরান্তরে। ব্যবসা করত, মন্ত্র ও তুকতাকের সাহায্যে আরোগ্য করত অসুস্থ ও পঙ্গুদের। পণ্যদ্রব্য রক্ষার জন্য তারা প্রতি দেশে

পিরামিডের মতো বড়ো বড়ো বাড়ি বানিয়ে সেখানে রেখে দিত "নিদ্রিত নিগ্রোর মাথা"। এভাবে নিজেদের ধর্মপ্রচার করত তারা। তাদের আগমনের বিরুদ্ধে লোকে প্রতিবাদ করলে জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসত ব্রোঞ্জের বর্মাবৃত লোহিত সৈনিকেরা, মাথায় উঁচু শিরস্ত্রাণ, হাতে পালক সুশোভিত ঢাল, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত লোকেরা।

'এভাবে জেম্‌জের প্রাচীন দেশের সীমানা বেড়ে সুদৃঢ় হল। তখন তার নতুন নাম—অতলান্তিস। সুদূর পশ্চিমে, লোহিত জাতিদের দেশে, গড়ে উঠল দ্বিতীয় একটি বিরাট নগরী — প্তিৎলিগুয়া। অতলান্তিকীয়দের পণ্যবাহী জাহাজ পূবে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যায়, সেখানে তখনো কৃষ্ণজাতির শাসন চলেছে। এশিয়ার পূর্ব উপকূলে অতলান্তিকীয়রা পীতচর্ম চেপটামুখ দানবদের প্রথম দেখে। জাহাজের দিকে পাথর ছুঁড়েছিল দানবেরা।

'"নিদ্রিত নিগ্রোর মাথা"—এ ধর্ম অবারিত ছিল সকলের জন্য। সে ধর্ম হল শক্তি ও শাসনের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু এর অর্থ এর গূঢ় তত্ত্ব ঢাকা ছিল রহস্যের গভীরে। জেম্‌জের জ্ঞানের বীজের চর্চা করেছিল বটে অতলান্তিকীয়রা, কিন্তু তখনো তারা শুধু সেই পথের শুরুতে যে পথ শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতিকে নিয়ে যায় ধ্বংসের মুখে।

'তারা বলত:

'"সত্যিকার জগত দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না,

শোনা যায় না, তার কোনো স্বাদ বা ঘ্রাণ নেই। সত্যিকার জগত হল বুদ্ধির গতি। সে গতির প্রাথমিক ও শেষ লক্ষ্য অনির্বচনীয়। বুদ্ধি হল বস্তু, পাথরের চেয়ে কঠিন, আলোর চেয়ে ক্ষিপ্রগতি। শান্তির সন্ধানে সমস্ত বস্তুর মতো বুদ্ধি কালক্রমে জড়ত্ব দশায় পড়ে, গতি হয়ে আসে শ্লথ। একে বলে বস্তুতে বুদ্ধির রূপান্তর প্রাপ্তি। গভীর জড়ত্ব দশার কোনো একটি পর্যায়ে বুদ্ধির রূপান্তর ঘটে আগুনে, বাতাসে, জলে ও মাটিতে। এই চতুর্ভূতে দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি। বস্তু হল বুদ্ধির সাময়িক সংহতি। সংহত বুদ্ধির মূলকেন্দ্র হল বস্তু, ঠিক বিদ্যুতের গোলকের মতো, যার মধ্যে সংহত হয় বজ্রগর্ভ হাওয়া।

'"স্ফটিকের মধ্যে বুদ্ধির অবস্থিতি চরম স্থিরতায়। গ্রহাকাশে বুদ্ধির অবস্থান চরম গতিতে। বুদ্ধির এই দুটি চরম পর্যায়ের সেতু হল মানুষ। মানুষের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধির স্রোত ভেসে আসে দৃশ্যমান পৃথিবীতে। মানুষের পা'র উৎস হল স্ফটিক, তার পেট হল সূর্য, তার চোখ নক্ষত্র, তার মাথা সেই পেয়ালা যার কিনারা ছড়িয়ে পড়েছে নিখিল বিশ্বে।

'"মানুষ হল পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডকর্তা। তার পদসেবা করে মৌলিক পদার্থ আর বেগ। সমস্ত কিছুকে সে শাসন করে যে শক্তিতে সে শক্তি উৎসারিত বুদ্ধি থেকে, ঠিক যেমন মাটির পাত্রের ফাটল দিয়ে উৎসারিত হয় আলোর রশ্মি।"

'এসব বলত অতলান্তিকীয়রা। সাধারণ মানুষ বোঝেনি তাদের ধর্মকথা। তাদের কেউ উপাসনা করত জন্তু জানোয়ার-দের, কেউ বা প্রেতচ্ছায়ার, কেউ বিগ্রহের, কেউ আবার রাত্রির ফিসফিসানির, বজ্র বা বিদ্যুতের, কিম্বা মাটির কোনো গর্তের। অসংখ্য কুসংস্কারের বিরোধিতা করা অসম্ভব, বিপজ্জনক।

'তখন অতলান্তিকীয়দের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ যারা সেই পুরোহিতেরা বুঝল যে এমন একটি ধর্ম চাই যা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য ও গ্রাহ্য। স্বর্ণালঙ্কৃত বিশাল নানা মন্দির গড়ে তারা নিবেদন করল সূর্যদেবকে, যিনি সকল জীবের পিতা ও প্রভু, রুদ্র সেই জীবনদাতাকে যিনি মৃত্যুলোক থেকে প্রাণলোকে আসেন বারম্বার।

'সূর্যপূজা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে দ্রুত গতিতে। বিশ্বাসীদের হাতে প্রাণ হারাল অনেক লোক। সুদূর পশ্চিমে, লোহিত জাতিদের মধ্যে, সূর্য রূপ নিল পক্ষীনাগের। সুদূর পূবে, প্রেতলোকের ছায়ার অধীশ্বর সূর্য রূপ নিল মানুষের, যার মাথা পাখির মাথার মতো।

'পৃথিবীর মর্মস্থানে, শত স্বর্ণদ্বার নগরীতে, ধাপে ধাপে গড়া হল একটি মেঘচুম্বি পিরামিড, তার ভেতরে রাখা হল "নিদ্রিত নিগ্রোর মাথা"। পিরামিডের পাদদেশে, স্কোয়ারে তৈরি করা হল একটি ডানাওয়ালা স্বর্ণ বৃষভ, মাথা তার মানুষের আর থাবা সিংহের। তলায় জ্বালানো হল অনির্বাণ আগুন।

‘বিষুবের দিনগুলোতে ঢাক বাজত, চলত নগ্ন মেয়েদের উন্মত্ত নাচ, আর জনতার সম্মুখে প্রধান পুরোহিত, যিনি সূর্যের সন্তান ও মহাশাসক, তিনি নগরীর সবচেয়ে সুন্দর তরুণকে বলি দিয়ে তার অগ্নি সংকার করতেন ষাঁড়ের পেটে।

‘নগরী ও দেশের মহাধিরাজ ছিলেন সূর্যের সন্তান। বাঁধ বসাতেন তিনি, জমির সেচ চালাতেন। পণ্য দোকান থেকে বিলি করতেন খাদ্য ও পরিধেয়, ঠিক করে দিতেন কাকে কত জমিজমা ও গরুবাছুর দিতে হবে। তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করত অসংখ্য সর্দার। কেউ বলতে পারত না, “এটা আমার”, কেননা সব কিছু সূর্যের। কাজকে মনে করা হত পূত। অলস লোকের প্রাণদণ্ড হত। বসন্তকালে সূর্যের সন্তান বলদদের নিয়ে যেতেন ক্ষেতে, জমিতে হাল দিয়ে বীজ বপন করতেন।

‘শস্য, বস্ত্র ও মশলায় ভরাট মন্দিরগুলি। অতলান্তিকীয়দের জাহাজ টকটকে লাল পাল উড়িয়ে যেত সাত সমুদ্রে। তাদের গায়ে আঁকা একটি সাপের মূর্তি, সাপের মুখে সূর্য। শান্তির দীর্ঘ পর্ব শুরু হয়েছে তখন। কী করে তরবারি ধরতে হয় ভুলে গেল লোকে।

‘তারপর পূব থেকে ঝোড়ো মেঘ ঘনিয়ে এল অতলান্তিসের উপর।

‘এশিয়ার পূব দিকের মালভূমিতে থাকত পীতবর্ণ, তেরছা-চোখ পরাক্রান্ত একটি জাতি, নাম তার উচ্‌কুর। তারা মেনে

চলত একটি ভূতসিদ্ধ স্ত্রীলোককে। তার নাম সু খুতাম লু, যার মানে "চাঁদের সঙ্গে যে কথা বলে।"

'উচ্‌কুরদের বলল সু খুতাম লু:

'"তোমাদের নিয়ে যাব এমন দেশে যেখানে পাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাতে সূর্য অস্ত যায়। সেখানে তারার মতো অগণন ভেড়া চরে, সেখানে বয় অশ্বিনীর দুধের নদী, সেখানে তাঁবুগুলো এত বিরাট যে প্রত্যেকটার মধ্যে গোটা একটা ভেড়ার পাল থাকতে পারে। সেখানে এখনো পড়েনি তোমাদের ঘোড়ার খুরের ছাপ, সেখানকার নদীর জল এখনো খাওনি তোমাদের শিরস্ত্রাণ ভরে।"

'মালভূমি থেকে নেমে উচ্‌কুররা আক্রমণ করল অসংখ্য পীতবর্ণ যাযাবর উপজাতিকে, তাদের জয় করে হল তাদের সেনাপতি। বিজিতদের বলল, "সূর্যের যে দেশের কথা আমাদের জানিয়েছেন সু খুতাম লু, সে দেশে চল আমাদের পিছু পিছু।"

'তারা-উপাসক যাযাবররা ছিল নির্ভীক স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁবু তুলে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে চলল তারা পশ্চিমে। যাত্রা চলল অনেক দিন, বছরের পর বছর। সামনের উচ্‌কুর ঘোড়সওয়াররা সহর আক্রমণ করে ধ্বংস করত। ঘোড়সওয়ারদের পিছনে ভেড়ার পাল আর নারী ও শিশু বোঝাই শকট। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তারা গিয়ে দলে দলে পড়ল ইউরোপীয় সমভূমির পূব ভাগে।

'সেখানে অনেকে রয়ে গেল নানা হ্রদের ধারে। সবচেয়ে শক্তিমানেরা এগিয়ে চলল পশ্চিম দিকে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অতলান্তিকীয়দের প্রথম বসতি ধ্বংস করে বিজিতদের কাছ থেকে জেনে নিল সূর্যের দেশ কোথায়। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে সু খুতাম লু'র। তার খুলি থেকে চামড়াসুদ্ধ চুল নিয়ে দীর্ঘ খুঁটিতে লাগিয়ে সেই পতাকার সঙ্গে সমুদ্র তীর হয়ে এগিয়ে চলল তো চলল উচ্‌কুররা। অবশেষে ইউরোপ শেষ হয়ে এল, পাহাড় চূড়া থেকে দেখা গেল প্রতিশ্রুত দেশ। মালভূমি থেকে নেমে যাত্রা শুরু করার পর তখন একশ বছর কেটে গেছে।

'যাযাবররা জঙ্গল গাছ কেটে ভেলা বানিয়ে পার হল লবণাক্ত উষ্ণ নদী। প্রতিশ্রুত অতলান্তিসের মাটিতে পা দিয়ে তারা আক্রমণ করল তুলে'র পূত নগরী। খাড়া দেয়ালের ওপর দাঁড়াতে নগরীতে বাজতে শুরু করল ঘণ্টাধ্বনি। সে ঘণ্টাধ্বনি এত সুমধুর যে পীতদেহরা সহর ধ্বংস করল না, ছেড়ে দিল অধিবাসীদের, লুঠ করল না মন্দির। শুধু জামাকাপড় ও খাবারের রসদ নিয়ে চলল আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে। পশুপাল আর শকটের ধূলোয় ঢাকা পড়ল সূর্য।

'শেষ পর্যন্ত যাযাবরদের পথ রুখে দাঁড়াল লোহিত জাতির সৈন্যরা। সোনা ও রকমারি রঙের পালকে তারা সবাই ভূষিত, সকলের চেহারা পেলব সুন্দর। উচ্‌কুর ঘোড়সওয়ারদের হাতে তারা পরাজিত হল। অতলান্তিকীয়দের রক্তের স্বাদ একবার পেয়ে সব করুণা উবে গেল পীত যাযাবরদের অন্তর থেকে।

'শত স্বর্ণদ্বার নগরী থেকে দূত পাঠানো হল পশ্চিমে লোহিত জাতিদের কাছে, দক্ষিণে নিগ্রোদের, পূবে আয়ামের সন্তানদের আর উত্তরে দানবদের কাছে। মানুষ বলি দেওয়া হল। মন্দির চূড়ায় দিবারাত্রি জ্বলতে লাগল অগ্নিশিখা। নগরীর লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এল রক্ত বলিদান দেখতে, চড়কের নাচ নাচল তারা, গা ঢেলে দিল উন্মত্ত সুরাপানে, উজাড় করে দিল নিজেদের রত্নভাণ্ডার।

'অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হল পুরোহিত ও দার্শনিকেরা। পাহাড়ের গুহায় গিয়ে তাদের বেদগ্রন্থ মাটিতে পুঁতে রাখল।

'শুরু হল যুদ্ধ। ফলাফল তো অনিবার্য: ভোগবিলাসে শান্ত অতলান্তিকীয়রা কোনোক্রমে চেষ্টা করল শুধু ধনসম্পত্তি বাঁচাবার। আর যাযাবরদের মধ্যে জাগ্রত ছিল আদিম লোভ, নিজেদের ভবিতব্যে বিশ্বাস। তবু যুদ্ধ চলল বহুদিন ধরে, রক্তাক্ত সে যুদ্ধ। উৎখাতে গেল দেশ। শুরু হল দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। সৈন্য সামন্তরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে চালাল লুঠপাট। ভীষণ আক্রমণে অধিকৃত হল শত স্বর্ণদ্বার নগরী। ভেঙে গেল তার প্রাচীর। পিরামিডের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সূর্যের সন্তান প্রাণ দিলেন। মন্দির চূড়ায় নিভে গেল অগ্নিকুণ্ড। জ্ঞানী লোকেদের কয়েকজন আর কয়েকজন ভক্ত পালিয়ে আশ্রয় নিল পাহাড়ের গুহায়। বিলুপ্ত হল সভ্যতা।

'মহান নগরীর ধ্বংসসার প্রাসাদগুলির মাঝে চওড়া রাস্তায় ঘাসের ওপর ভেড়া চরে, পীতদেহ মেষপালকেরা বিষণ্ণ গান গায়

সেই মহান প্রতিশ্রুত দেশের বিষয়ে, স্তেপে মরীচিকার মতো সেই দেশের বিষয়ে, যেখানে মাটি ছিল নীল আর আকাশ সোনালি।

'নিজেদের সর্দারদের শুধালো যাযাবরা, "এখন কোথায় যেতে হবে?" তারা বলল, "তোমাদের তো নিয়ে এসেছি প্রতিশ্রুত দেশে, এখানে এখন শান্তিতে বসবাস করো।" কিন্তু অনেকে তাদের কথায় কান না দিয়ে পশ্চিমমুখো যাত্রা করে পেঁছল "পক্ষীনাগের" রাজ্যে। সেখানে তারা পরাজিত হল রাজা প্তিৎলিগুয়ার হাতে। যাযাবর অন্য জাতিরা গেল বিষুবরেখার কাছে, সেখানে তাদের ধ্বংস করল নিগ্রোরা, হাতির পাল আর জলাভূমির জ্বর।

'পীতদেহ উচ্‌কুর সর্দাররা নিজেদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বিজ্ঞ লোককে নির্বাচন করে তাকে বিজিত দেশের রাজা বলে ঘোষণা করল। তার নাম তুবাল। সে আদেশ দিল প্রাচীর মেরামত করো, বাগান সাফ করো, চাষবাস শুরু করা চাই, চাই বাড়িঘরদোর তোলা। অনেক বিজ্ঞ ও সহজ আইন চালু করল সে। পাহাড়ের গুহায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল সেই সব জ্ঞানী ও পুরোহিতদের নিজের কাছে তলব করে তাদের বলল, "আমার চোখ আর কান জ্ঞানের জন্য সর্বদা খোলা।" তাদের পরামর্শদাতা করে নিয়ে মন্দির খোলার অনুমতি দিল, চারিদিকে দূত পাঠাল এই জানাতে যে সে শান্তি চায়।

'এইভাবে শুরু হল অতলান্তিকীয় সভ্যতার তৃতীয় ও সর্বোচ্চ অধ্যায়। কৃষ্ণ, লোহিত, জলপাই ও শ্বেতবর্ণ বহু সংখ্যক অতলান্তিকীয় জাতির রক্তের সঙ্গে মিশল স্বপ্নালু, মাতালের মতো রগচটা এশীয় যাযাবরদের রক্ত, যে যাযাবররা ছিল তারা-উপাসক, ভূতসিদ্ধ ‍সু খুতাম লু'র বংশধর যারা।

'অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে অতি শীঘ্র মিশে গেল যাযাবররা। তাদের তাঁবু, পশুর পাল আর বন্য আচারের কিছু রইল না, শুধু রইল গান ও ইতিবৃত্ত। দেখা দিল আর একটি জাতি, বলিষ্ঠ দেহ, কৃষ্ণকেশ, রঙ তাদের ঘোর পীত। সহরের অভিজাতবর্ণ হল উচ্‌কুররা, ঘোড়সওয়ার ও সেনাপতিদের বংশধর যারা। তারা বিজ্ঞান, চারুশিল্প ও বিলাসপ্রিয়। নতুন প্রাচীর ও সাত-কোণা গম্বুজে সহর সাজাল তারা, বিরাট পিরামিডের একুশটি কিনারা সোনা দিয়ে সাজাল, বানাল পয়োনালী, স্থাপত্যের ইতিহাসে এই প্রথম তারা নির্মাণ করল স্তম্ভ।

'যে সব দেশ ও সহর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে তাদের আবার পরাজয় ঘটল। দক্ষিণে যুদ্ধ চলল সাইক্লপ্‌দের সঙ্গে, জেম্‌জের সেই বন্য উত্তর পুরুষদের সঙ্গে যারা অন্য জাতির সঙ্গে মেশেনি। মহান দিগ্বিজয়ী রাম ভারতে গিয়ে আর্যদের কনিষ্ঠ শাখাগুলিকে রা'র রাজ্যভুক্ত করল। অতলান্তিসের সীমানা এভাবে আবার

বিস্তার, অভূতপূর্ব বিস্তার লাভ করে দূরতর হল — পক্ষীনাগের দেশ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এশীয় উপকূল পর্যন্ত, যেখান থেকে একদা পীতবর্ণ দানবেরা পাথর ছুঁড়েছিল জাহাজে।

'বিজেতাদের স্বপ্নবিবাগী অস্থির মন জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল। জেম্‌জের প্রাচীন পুঁথি ও আয়াম সন্তানদের বেদগ্রন্থের পাঠ আবার শুরু হল। শেষ হল কালের একটি চক্র, শুরু হল আর একটি। পাহাড়গুহায় আবিষ্কৃত হল "নিদ্রিতের সাতটি পাপিরাস্"এর জীর্ণ অবশিষ্টাংশ। এ আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানের বিকাশ দ্রুত বেড়ে গেল। আয়াম সন্তানদের যা ছিল না — সৃজনী শক্তির আগ্রহ, জেম্‌জের জাতিদের অভাব ছিল যার — ক্ষুরধার স্বচ্ছ বুদ্ধি — তা বলবৎ ছিল অস্থির আবেগপ্রবণ উচ্‌কুরদের মধ্যে।

'নব্য জ্ঞানের মূলকথা ছিল এই:

'"পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি যেটা — বিশুদ্ধ বুদ্ধির শক্তি — তা সুপ্ত আছে মানুষের মধ্যে। ঠিক হাতে ধনুক থেকে তীর ছুঁড়লে যেমন লক্ষ্যভেদ হয়, ঠিক তেমনি ইচ্ছাশক্তির ধনুকে জ্ঞানী হাতের গুণে ছাড়াতে পারে সুপ্ত বুদ্ধিকে। সঠিক জ্ঞানের শক্তি অপার।"

'জ্ঞান বিজ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত হল: প্রাথমিক হল দেহ, ইচ্ছাশক্তি ও মানসবৃত্তির বিকাশ; আর মৌলিক বিভাগ হল প্রকৃতি, পৃথিবী ও নানা রীতির বিষয়ে জ্ঞান, যার ফলে প্রকৃতিকে বশে আনা যায়।

'জ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষ আর সংস্কৃতির বিকাশ, যার তুলনা পৃথিবীতে পরে কখনো মেলেনি, চলল এক শতাব্দী ধরে, মহাপ্লাবনের আগে, অর্থাৎ অতলান্তিসের ধ্বংসের আগে ৪৫০তম শতাব্দী থেকে ৩৫০তম শতাব্দী পর্যন্ত।

'পৃথিবীতে তখন শান্তির অপ্রতিহত রাজত্ব। জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত ও বিকশিত পৃথিবীর নানা শক্তি দরাজ হাতে মানুষের সেবা করে চলেছে। বাগানে ও মাঠে অপর্যাপ্ত ফসল, গৃহপালিত পশুদের সংখ্যাবৃদ্ধি, কাজ কঠিন নয়। পুরোনো যুগের নানা আচার ও উৎসবের কথা মনে পড়ে গেল মানুষের। বিনা বাধায় সে বাঁচতে পারে, পারে ভালোবাসতে, জন্ম দিতে, আনন্দ করতে। ইতিবৃত্তে এ সময়ের নাম **স্বর্ণযুগ**।

'এ সময় পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয় স্ফিনক্সের মূর্তি যার এক দেহে চতুর্ভূতের সংস্থান, সুপ্ত বুদ্ধির রহস্যালোকের প্রতীক যে মূর্তি। গড়ে উঠল পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিস: গোলোকধাঁধা, ভূমধ্যসাগরের কলোসাস্, জিব্রলটারের পশ্চিমে স্তম্ভ রাশি, পসিইদনে নক্ষত্রদ্রষ্টাদের মিনার, তুবালের উপবিষ্ট মূর্তি ও প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে লেমুতদের সহর।

'জ্ঞানের আলো গিয়ে পৌঁছল কৃষ্ণজাতিদের কাছে, যারা এতদিন বিতাড়িত ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলের জলাভূমিতে। অতি দ্রুত সভ্যতা লাভ করে নিগ্রোরা মধ্য আফ্রিকায় বানাল বিরাট বিরাট নগর।

'জেম্‌জের জ্ঞানের বীজে আশ্চর্য ফসল ফলল। কিন্তু অতিজ্ঞানীরা তখন ভাবতে শুরু করলেন যে সভ্যতার মূলে আছে আদিম পাপ। জ্ঞানের আরো বিকাশ ঘটলে ধ্বংস অনিবার্য: মানুষ নিজেকে ধ্বংস করবে, ঠিক যেমন মহানাগ নিজের পুচ্ছ দংশন করে।

'অস্তিত্বের, পৃথিবীর ও সমস্ত জীবদেহের প্রাণ মানুষের বুদ্ধি প্রসূত — এই ধারণা হল আদিম পাপের মূলে। পৃথিবী অনুধ্যান করে মানুষ শুধু নিজের অনুধ্যান করেছে। বুদ্ধি হল একমাত্র বাস্তব, পৃথিবী তার ধারণাপ্রসূত, শুধু মায়া। এ ধারণার বশে প্রত্যেক মানুষের মনে হতে পারে যে সে হল একমাত্র প্রাণী। পৃথিবীর বাকি সবকিছু কল্পনার বিকার ছাড়া কিছু নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হবে এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিবিশেষের জন্য লড়াই, সকলের সাথে সকলের সংগ্রাম আর মনুষ্যজাতির ধ্বংসপ্রাপ্তি, মানুষের দেখা স্বপ্ন যেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এর স্বাভাবিক পরিণতি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরাগ, জীবন যেন দুঃস্বপ্ন মাত্র।

'জেম্‌জের জ্ঞানের প্রাথমিক ত্রুটি ছিল এটি।

'জ্ঞানীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল ভাবল পাপ থেকে নিস্তারের কোনো সম্ভাবনা নেই, বলল পাপ হল একমাত্র শক্তি, জীবসৃষ্টির মূলে সেটা। এরা নিজেদের "কালা" বলত কেননা তাদের জ্ঞান আসে কৃষ্ণজাতিদের কাছ থেকে।

'অন্য দল ভাবল পাপের উৎস প্রকৃতির বাইরে, পাপ হল

স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বুদ্ধির বিচ্যুতি। তারা সন্ধান করতে লাগল পাপের প্রতিরোধকের।

'তারা বলল, "সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়ে, লোপ পায়, আবার নবজন্ম লাভ করে পৃথিবীর ফলেফুলে: এই হল জীবনের মূল বিধি।" বুদ্ধির গতির রূপ হল ঠিক এমনি: অবতরণ, যজ্ঞে বলি, তারপর জীবদেহে জন্মান্তর। আদিম পাপ হল বুদ্ধির একাকীত্ব — সেটাকে জয় করা যেতে পারে দৈহিক পাপে। বুদ্ধিকে মর দেহে অবতরণ করে মৃত্যুর প্রাণদ্বার অতিক্রম করতে হবে। এই দ্বার হল লিঙ্গ। যৌন আকাংক্ষায়, অর্থাৎ কামরসে, বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটে।

'তাত্ত্বিকেরা নিজেদের "ধলা" বলে পরিচয় দিত, কারণ তারা পরত কাপড়ের কিরীট—রতির প্রতীক। তারা বাসন্তী উৎসব ও বামাচার চালু করল। সে সব তন্ত্র চলত প্রাচীন সূর্যমন্দিরের লাস্যভরা বাগানে। বুদ্ধির প্রতীক হত এমন কোনো তরুণ যে সঙ্গম করেনি, স্ত্রীলোক হত মরণশীল দেহদ্বারের প্রতীক, আর সাপ হত প্রতীক রতির। লীলাখেলা দেখতে আসত লোকে দেশবিদেশ থেকে।

'তাত্ত্বিকদের দু'দলের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। শুরু হল সংঘাত। এ সময় একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ঘটল। গাছপালার বীজের মধ্যে যে প্রাণশক্তি সুপ্ত তাকে কাজে লাগাতে শিখল মানুষ। এই শক্তি, চঞ্চল অগ্নি-হিম এই শক্তি ছাড়া পেয়ে তীব্রবেগে উঠল ঊর্ধ্বাকাশে। সংঘাত ও সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে

এটিকে কাজে লাগাল কালারা। বিরাট উড়ন্ত জাহাজ বানিয়ে সৃষ্টি করল সন্ত্রাসের। উড়ন্ত ড্রাগনের উপাসনা শুরু করে দিল বন্য জাতিরা।

'ধলারা বুঝল পৃথিবীর অন্তিমকাল আসন্ন, প্রস্তুত হতে লাগল তার জন্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে শুদ্ধ ও বলিষ্ঠ তাদের বাছাই করে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল উত্তর ও পূবে। পাহাড়ে তাদের দিল চারণভূমি, যেখানে তারা থাকতে পারে আদিম যুগের মানুষের মতো।

'যে অমঙ্গলের কথা ধলারা ভেবেছিল সেটা ঘটল। স্বর্ণযুগ অবনতির দিকে, অতলান্তিসের সহরে সহরে ভোগবিলাসের ক্লান্তি। অদ্ভুত উচ্ছৃংখল সব স্বপ্ন, বিকার ও বুদ্ধি বিকৃতি রোখার সাধ্য কারো ছিল না। মানুষ যে সব শক্তিকে করায়ত্ত করেছিল তারা গেল মানুষের বিপক্ষে। অমোঘ সর্বনাশের মুখে মানুষ হয়ে পড়ল ভয়ংকর, জিঘাংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর।

'শেষের সে দিন এসে পড়ল। তার সূচনা হল ভয়ঙ্কর একটি দুর্বিপাকে: ভূমিকম্পে নড়ে উঠল শত স্বর্ণদ্বার নগরীর মধ্যভাগ; মাটির অনেকখানি নিমজ্জিত হল সমুদ্র গর্ভে, অতলান্তিক মহাসাগর চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দিল পক্ষীনাগের দেশকে।

'কালারা বলল ধলারা মন্ত্র পড়ে অগ্নি ও পৃথিবীর অশান্ত আত্মাকে ছাড়ান দিয়েছে। লোকে ক্ষেপে গেল। রাত্রিবেলায় সহরে কালারা হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত করল — বস্ত্র

কিরীটধারীদের অর্ধেকের বেশী ধ্বংস হল। বাকিরা পালাল অতলান্তিস ছেড়ে।

'কালা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়োলোকদের নাম ছিল "মাগাৎসিৎল", অর্থাৎ "নির্মম"; তারা সহর দখল করে বলল, "মানুষকে শেষ করে দেব আমরা, কেননা মানুষ হল কু-বুদ্ধির সন্তান।"

'মৃত্যুলীলা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তারা সমস্ত দেশে উৎসব ও নানা খেলাধূলোর ঘোষণা করল, খুলে দিল সরকারের ধনাগার ও দোকান বাজার, উত্তর থেকে "ধলাদের" মেয়েদের আনিয়ে তাদের সঁপে দিল লোকের হাতে। মন্দির দ্বার খুলে দেওয়া হল বিকৃত ভোগবিলাসীদের জন্য, ফোয়ারাগুলোতে কানায় কানায় ঢালা হল মদ, রাস্তায় সেঁকা হল মাংস। লোকেরা তখন পাগল। এটা ঘটে হেমন্তের দিনে, আঙুর ঘরে তোলার সময়।

'রাত্রে পথে ঘাটে আগুনের খেলা, মদ, মেয়েমানুষ, নাচ আর ভূরিভোজে উন্মত্ত সবাই, তখন দেখা দিল মাগাৎসিৎলরা। ধারালো চিরুনি বসানো উচ্চ শিরস্ত্রাণ মাথায়, কোমরে ধাতুর বেল্ট, কিন্তু ঢাল নেই। ডান হাতে তারা ছুঁড়ল ব্রোঞ্জের বোমা, ফেটে গিয়ে সেগুলো থেকে বেরুল হিম সর্বনেশে অগ্নিশিখা, আর বাঁ হাতে তরবারি বসাল মাতাল ও উন্মত্তদের বুকে।

'ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ছেদ পড়ল সে রক্তাক্ত লীলায়। তুবালের মূর্তি পড়ে গেল, চিড় ধরে গেল দেয়ালে, পয়োনালীর

থাম ধ্বসে পড়ল, মাটির গভীর ফাটল থেকে উৎসারিত হল অগ্নিশিখা, ভস্মরাশিতে ভরে গেল আকাশ।

'ভোর বেলায় করাল লাল সূর্যের আলো পড়ল ছিন্নভিন্ন, ধিকি ধিকি আগুন-জ্বলা বাগানে, ভূরিভোজে শ্রান্ত উন্মত্ত জীবন-বিরাগী লোকের উপর, শবদেহের স্তূপের উপর। ডিমের মতো দেখতে উড়ো-জাহাজে লাফিয়ে উঠে মাগাৎসিৎলরা পৃথিবী ছেড়ে চলল। উড়ে গেল গ্রহাকাশে, বিমূর্ত বুদ্ধিলোকে।

'হাজার হাজার যন্ত্র উড়ছে, তখন চতুর্থবারের মতো ভূমিকম্প হল, আগের চেয়ে ভয়াল। দক্ষিণে ধূসর অন্ধকার থেকে সমুদ্রের বিরাট ঢেউ উঠে গড়িয়ে গেল পৃথিবীর বুকে, শেষ হল প্রাণীলোক।

'ঝড় উঠল, বজ্রপাতে দীর্ণ হল মাটি আর ঘরবাড়ি। মুষলধারে বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরির পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়তে লাগল।

'নগরীর বিরাট প্রাচীরের আশ্রয়ে তখনো ঝাঁকে ঝাঁকে মাগাৎসিৎল উড়ছে সোনার পাত-দেওয়া পিরামিডের শিখর থেকে। মুষলধারে বৃষ্টি, ধোঁয়া আর ধূলোর মধ্যে চলেছে নক্ষত্রলোকে। তখন পর পর আরো তিনটি ভূমিকম্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতলান্তিস। শত স্বর্ণদ্বার নগরী মিলিয়ে গেল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে।'

নগরীদর্শন

ইখার অবস্থা কাহিল। গুসেভ যা বলে তৎক্ষণাৎ তাই করে, তার দিকে প্রেমে গদগদ চোখে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা হাস্যকর ও করুণ। তার সঙ্গে গুসেভের ব্যবহার কড়া কিন্তু সঠিক। আবেগের ভারে ইখার অবস্থা যখন বেজায় কাহিল হয় তখন তাকে কোলে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, কানের পেছনটা দেয় চুলকিয়ে আর মজার মজার গল্প শোনায়। আর ইখা শোনে আবেশে।

সহরে কেটে পড়ার স্থির ফন্দি করেছে গুসেভ। এখানে অবস্থাটা ইঁদুর কলে ধরা পড়ার মতো — বিপদে আপদে আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না, পালাবার পথ নেই। লস ও সে যে বিপদের মুখে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। লসের সঙ্গে বার্তাচিত করে কোনো লাভ নেই। লস শুধু ভুরু কোঁচকায়, তুস্কুবের মেয়ের স্কার্ট ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু তার চোখে পড়ে না।

'আপনি ব্যস্তবাগীশ মশাই। আমাদের মেরে ফেলবে? তা মারুক গে। আমরা কি মৃত্যুকে ডরাই? তাহলে তো পেত্রগ্রাদে বসে থাকলেই হত, সেখানে বিপদআপদ নেই।'

উড়ো-জাহাজগুলোর হাঙ্গারের চাবি ইখশ্‌কাকে দিয়ে আনিয়ে নিল গুসেভ। টর্চ হাতে সেখানে গিয়ে সারা রাত একটা ছোট, দু'ডানাওয়ালা উড়ো-নৌকোর পেছনে পড়ে রইল।

যন্ত্রের গঠন সহজ। ছোট এঞ্জিনটা চলে সাদা কী একটা ধাতুর গুঁড়োয়, বিজলীর স্ফুলিঙ্গে অসম্ভব দ্রুতগতিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় গুঁড়োগুলো। যন্ত্রটি বিজলী শক্তি পায় আবহাওয়া থেকে। দুটো মেরুর দুটো স্টেশন সারা মঙ্গলগ্রহে ছড়ায় সুতীব্র বৈদ্যুতিক শক্তি। (খবরটা দিয়েছিল আএলিতা।)

উড়ো-নৌকোটাকে একেবারে হাঙ্গারের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গুসেভ চাবি ফিরিয়ে দিল ইখাকে। দরকার হলে ভারি তালাটা হাতের জোরে খোলা বিশেষ কঠিন হবে না।

এরপর সে ঠিক করে ফেলল সয়াৎসেরা সহরকে আনতে হবে হাতের মুঠোয়। মায়া-মুকুর চালানোর কায়দা শিখিয়ে দিল ইখা। তুস্কুবের বাড়ির এই কথা-বলা আয়নাটা একতরফা চালানো যায় — নিজেকে কেউ দেখতে বা শুনতে পাবে না, অথচ সবকিছু দেখা ও শোনা যাবে।

আয়নায় সহরটি খুঁটিয়ে দেখে নিল গুসেভ। রাস্তাঘাট, দোকান এলাকা, কলকারখানা, শ্রমিকদের বসতি। মায়া-মুকুরের বুকে তার সামনে প্রসারিত হল বিচিত্র জীবন।

কলকারখানার ইটের তৈরি ঘরগুলো নিচু, ধুলোভরা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে স্তিমিত আলো। শ্রমিকদের ফাঁকা চোখ কোটরগত, মুখ বিশীর্ণ বিষণ্ণ। সর্বদা বিরামহীন চলেছে লেদ আর যন্ত্রপাতি, মানুষের আনত দেহ আর কাজের ছক বাঁধা নির্ভুল গতি। বিষণ্ণ, আশাহীন, পিঁপড়ের মতো জীবন।

শ্রমিকদের মহালের রাস্তাগুলো সটান একঘেয়ে চলে গেছে, সেখানে চোখে পড়ে সেই বিষণ্ন মূর্তি, নতশির শ্লথগতি মানুষের দল। পরিষ্কার তকতকে ইটের রাস্তাগুলো সব সমান, তা থেকে ভেসে আসে হাজার বছরের ক্লান্তি ও অবসাদ। মনে হয় এখানকার লোকেদের সব আশা উবে গেছে।

আয়নায় দেখা গেল সহরের প্রধান রাস্তাগুলো: ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো ওঠা বাড়ি, ঝলমলে সবুজ লতানে গাছ, জানলার শার্সিতে সূর্যের আলো, সুসজ্জিতা মেয়েরা; রাস্তার মাঝখানে ছোট ছোট টেবিল, সংকীর্ণ ফুলদানি, ফুলের বাহার; সুসজ্জিত জনতার বিক্ষুব্ধ ভিড়, পুরুষদের কালো আলখাল্লা, বাড়িঘরদোরের সামনের দিক — সবকিছু প্রতিফলিত রাস্তার সবুজাভ পার্কেটে। উড়ে চলেছে সোনালি সব নৌকো ডানার ছায়া বিছিয়ে, দেখা যায় হাসি হাসি মুখ উপর দিকে তাকিয়ে আছে, পাতলা রঙীন কত স্কার্ফ ...

সহরের জীবন চলেছে দ্বিধারায়। ভালো করে ব্যাপারটা ঠাহর করে নিল গুসেভ। অত্যন্ত ঘোড়েল ব্যক্তির মতো আঁচ করে নিল যে দেখা দুটো দিক ছাড়া আর একটা দিক আছে নিশ্চয়, সেটা গোপন। জমকালো রাস্তায় আর বাগানে সর্বত্র নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়ায় ছন্নছাড়া পোষাক-পরা তরুণেরা। বিনা কাজে তারা ঘোরে পকেটে হাত গুঁজে, চোখ তাদের সজাগ। দেখে ভাবল গুসেভ, 'তোমাদের মতো ছোঁড়া চিনতে বাকি নেই আমার।'

ইখশ্‌কা সবকিছু সবিস্তারে গুসেভকে বুঝিয়ে দিল — একটা জিনিসে শুধু রাজী হল না — ইঞ্জিনিয়ারদের সর্বোচ্চ পরিষদের দালান কিছুতেই সে মায়া-মুকুরে আনল না।

আতঙ্কিত হয়ে, লাল চুল নেড়ে হাতদুটো বুকে রেখে বলত:

'আমাকে ওটা করতে বলবেন না, আকাশ-সন্তান, তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলুন তাও ভালো, দোহাই আপনার।'

চতুর্দশ দিনে সকালে আগেকার মতো আরাম-চেয়ারে বসে গুসেভ কোলে সুইচবোর্ডটা রেখে দড়িতে টান দিল।

মায়া-মুকুরে ভেসে এল অদ্ভুত একটি দৃশ্য: সহরের সবচেয়ে বড়ো স্কোয়ারে উৎকণ্ঠিত লোকেরা জটলা পাকিয়ে কানাকানি করছে। ছোট ছোট টেবিলগুলো উধাও, উধাও ফুল আর মেয়েদের ঝকঝকে সব ছাতা। দেখা গেল তিন-কোণা সারিতে এগিয়ে আসছে সৈন্যরা, পাথরমুখো ভয়ংকর পুতুলের মতো। আরো দূরে দোকান এলাকায় ভিড় করে ছুটে এল জনতা; ধস্তাধস্তির মধ্য থেকে একটি লোক ডানাওয়ালা যন্ত্রে ঘুরপাক খেয়ে উঠল আকাশে। বাগানেও ঠিক তেমনি উত্তেজিত লোকেদের জটলা ও ফিসফিসানি। একটা কারখানায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে মজুরেরা, তাদের বিষণ্ণ মুখ উত্তেজনায় লাল, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি চোখে।

সহরে নিশ্চয় অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। ইখশ্‌কার

কাঁধে ধাক্কা দিয়ে গুসেভ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ?' কোনো উত্তর দিল না ইখশ্কা, তার দিকে চেয়ে রইল গদগদ ঝাপসা দৃষ্টিতে।

তুস্কুব

অস্থির উত্তেজনা সহরে। আয়নার টেলিফোনের অবিরত গুঞ্জন আর ঝিলিক। রাস্তাঘাটে বাগানে লোকের ভিড়, কানাঘুষা। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখছে, কীসের প্রতীক্ষায় আছে সবাই। শোনা গেল কোথায় যেন শুকনো ফনিমনসার গুদামে আগুন লেগেছে। দুপুরবেলায় সহরে কল খুলে দেওয়াতে জলের তোড় ঢিমে রইল, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়... দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্ফোরণের শব্দ অনেকে শুনেছে। আড়াআড়িভাবে জানলায় জানলায় কাগজের টুকরো লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উত্তেজনার উৎসটা হল সহরের কেন্দ্রস্থল, ইঞ্জিনিয়ারদের সর্বোচ্চ পরিষদের দালানটা।

বলাবলি চলেছে, তুস্কুবের পতন হল বলে, নানা রদবদল আসন্ন।

নানা গুজব আগুনের ফুলকির মতো ইন্ধন জোগাচ্ছে উত্তেজনায়:

'সব আলো নিভে যাবে রাত্রি হলে।'

'মের্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রগ্লো বন্ধ করে দিচ্ছে।'

'চুম্বক-ক্ষেত্র থাকবে না আর।'

'সর্বোচ্চ পরিষদের মাটির তলাকার ঘরে কাদের যেন গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে।'

সহরের উপকণ্ঠে, কলকারখানায়, শ্রমিকদের বসতিতে, দোকান বাজারে এসব গ্জবের প্রভাবটা অন্য রকম। মনে হয় সেখানকার লোকজন কী ঘটছে সে বিষয়ে আরো ওয়াকিবহাল। আক্রোশে আনন্দে উৎকণ্ঠায় বলাবলি চলেছে যে ১১ নং বিরাট জলাধারটা উড়িয়ে দিয়েছে মাটির নিচে যারা কাজ করে তারা, সরকারের গ্প্তচররা সর্বত্র খ্ঁজে বেড়াচ্ছে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটি, তুস্কুব সৈন্য জড়ো করেছে সয়াৎসেরায়।

দ্প্রবেলায় কাজকর্ম প্রায় একেবারে বন্ধ। আরো অনেক লোক জমায়েৎ হয়ে কী ঘটবে দেখার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আড়চোখে তাকাচ্ছে ছন্নছাড়া পোষাক-পরা, পকেটে হাত-গোঁজা বিজ্ঞ চেহারার তর্ণদের দিকে। কোথা থেকে তারা এসে জ্টেছে কেউ জানে না।

বিকেলের দিকে সহরের উপরে উড়তে লাগল সরকারের নৌকো, সাদা লিফলেট ঝাঁকে ঝাঁকে নামল রাস্তাঘাটে।

সরকার থেকে বলা হল বাজে গ্জবে লোকে যেন কান না দেয় — এ সব গ্জব রটাচ্ছে শত্র্রা। বলা হল সরকারের শক্তি কস্মিনকালে এত প্রখর ও দৃঢ় ছিল না।

একটু স্থিরতা ফিরে এল বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আবার নানা গুজব রটল, একটা অন্যটার চেয়ে ভয়ঙ্কর। একটা জিনিসের বিষয়ে শুধু কোনো সন্দেহ নেই: সন্ধ্যেবেলায় ইঞ্জিনিয়ারদের সর্বোচ্চ পরিষদে আজ তুস্কুবের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাত বাঁধবে সয়াংসেরার মজুরদের নেতা, ইঞ্জিনিয়ার গরের।

সন্ধ্যার মুখে সর্বোচ্চ পরিষদের দালানের সামনের বড়ো চত্বরটা ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত। সিঁড়ি, প্রবেশদ্বার ও ছাদে পাহারা দিচ্ছে সৈন্যদল। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে এনেছে কুয়াশার মেঘ, ভিজে অন্ধকারে দুলে দুলে লণ্ঠনগুলো ছড়াচ্ছে বিষণ্ণ লাল আভা। দালানের গম্ভীর দেয়ালগুলো অস্পষ্ট পিরামিডের মতো অন্ধকারে উদ্যত। প্রতিটি জানলায় আলো।

. . . .

সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যরা বসে আছে এ্যামফিথিয়েটারের গোল হল-ঘরে, জগদ্দল খিলানের নিচেকার বেঞ্চে। প্রত্যেকের মুখে সজাগ সতর্ক একটা ভাব। দেয়ালে অনেক উঁচুতে ছায়া-দর্পণে দ্রুত গতিতে ভেসে আসছে সহরের দৃশ্য একটার পর একটা: কলকারখানার ভেতর দিক, রাস্তার বাঁকে এদিকে ওদিকে কুয়াশায় ছুটে চলেছে লোক, জলাশয়, বিদ্যুৎ-চুম্বক কেন্দ্রের গম্বুজ আর বিরাট একঘেয়ে ভাঁড়ারের সারি, পাহারা দিচ্ছে সৈন্যরা। সহরের সবকটা নিয়ন্ত্রণী দর্পণের সঙ্গে পর পর যোগস্থাপন করল সর্বোচ্চ পরিষদের দর্পণ। দেখা গেল সর্বোচ্চ

পরিষদের দালানের সামনের চত্বর, সেখানে কুয়াশার মেঘ আর লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় জন সমুদ্র। হল-ঘর ভরিয়ে দিল জনতার অশুভ গুঞ্জন।

হুইসলের তীক্ষ্ন আওয়াজে সভা সজাগ হল। নিভে গেল আয়নাটা। এ্যামফিথিয়েটারের সামনে কালো ও সোনালি ব্রোকেডে মোড়া মঞ্চে উঠল তুস্কুব। মুখ তার বিবর্ণ শান্ত গম্ভীর।

বলল, 'সহরে অশান্তি। তার কারণ গুজব রটেছে আজ আমার বিরোধিতা করা হবে। রাষ্ট্রের ভিত্তি কেঁপে ওঠার পক্ষে এমন একটা গুজব যথেষ্ট। এ পরিস্থিতি আমার কাছে অসুস্থ ও অশুভ মনে হয়। উত্তেজনার মূলে যা তা চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেওয়া দরকার। আমি জানি আমাদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা রাত্রে আমার কথাগুলো সহরের সর্বত্র রটিয়ে দেবে। স্পষ্ট কথা বলি: সহরে এখন অরাজকতা। আমার গুপ্তচরদের কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় সহরে ও দেশে এ অরাজকতা রোধ করার মতো শক্তি নেই। পৃথিবীর সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত।'

এ্যামফিথিয়েটারে মুখর গুঞ্জন। বিরস হাসি এল তুস্কুবের মুখে।

'সহর থেকে উৎসারিত হচ্ছে অরাজকতা, বিশ্ব শৃংখলার সর্বনাশ ঘটিয়ে। মনের শান্তি, বাঁচবার সহজাত ইচ্ছা, মানুষের ভাবাবেগ, সমস্ত কিছু এখানে লোপ পাচ্ছে খেলো

আমোদপ্রমোদে, অর্থহীন আনন্দে। খাভ্‌রার ধূপ হল সহরের প্রাণ — ধোঁয়া আর প্রলাপ, আর কিছু নয়। আমাদের সব জমকালো রাস্তা আর সোরগোল, সোনালি নৌকায় বিহার হিংসে জাগায় তাদের যারা নিচে থেকে চেয়ে দেখে। নগ্নপিঠ, নগ্নোদর মেয়েরা, শরীরে মাতাল-করা পুষ্পসারের সৌরভ, গণিকালয়ের সামনে বাহারে আলোর ঝিলিক, রাস্তার ওপরে ভেসে চলা রেস্তরাঁ-বোট — এই তো হল সহর! মনের শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। উচ্ছৃংখল লোকেদের মনে শুধু একটা ইচ্ছে — একটা বাসনা — সেটা হল উন্মত্ততায় গা ঢেলে দেওয়া ... রক্ত কেবল জাগাতে পারে এই উন্মত্ততা।'

আঙুল সজোরে নাড়িয়ে এ কথা বলল তুস্কুব... হলে শ্রোতারা সতর্কভাবে নড়েচড়ে বসল। তুস্কুব বলে চলল:

'মূর্তিমান অরাজকতার জন্য পথ সাফ করে দিচ্ছে আমাদের সহর। তার একমাত্র বাসনা ও সংকল্প হল ধ্বংস। লোকে ভাবছে অরাজকতার মানে স্বাধীনতা। মোটেই তা নয়। অরাজকতার লক্ষ্য শুধু অরাজকতা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল অরাজক লোকেদের বিরোধিতা করা — এই হল কানুন! শৃংখলা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আমাদের উচিত অরাজকতা দাবানো। দেশে যাদের মাথা এখনো ঠিক আছে তাদের জড়ো করে অরাজকতার বিরুদ্ধে লাগানো চাই, দেখা চাই বেশী লোকসান যাতে না হয়। অরাজকতার বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম আমরা ঘোষণা করব। নিরাপত্তার বিধিগুলি অবশ্য সাময়িক।

এমন সময় এসে পড়বে যখন পুলিসের দুর্বল দিকটা আর চাপা থাকবে না। সে সময় পুলিসের চরের সংখ্যা হয়ত আমরা দুগুণ বাড়াব, কিন্তু অরাজক লোকেদের সংখ্যা বেড়ে যাবে চারগুণ। তাই প্রথমেই আমাদের আক্রমণ চালানো উচিত, কঠোর অলঙ্ঘনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সহর ধ্বংস না করলে চলবে না।'

এ্যামফিথিয়েটারের অর্ধেক লোক চেঁচিয়ে বেঞ্চ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তাদের মুখ বিবর্ণ, চোখ জ্বলছে। তুস্কুবের চাউনিতে আবার চুপ করে গেল তারা।

'এভাবে না হোক, অন্যভাবে সহরের বিনাশ অনিবার্য। সে বিনাশের আয়োজন আমাদের নিজেদের করা দরকার। পরে, সহরে যাদের শুভবুদ্ধি এখনো আছে তাদের গ্রামে পাঠানোর একটা প্রস্তাব আমি করব। সে জন্য লিজিয়াজিরা পেরিয়ে যে দেশটি আছে, গৃহযুদ্ধের ফলে এখন যেটা জনশূন্য, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। বিরাট কাজ পড়ে আছে আমাদের সামনে, সে কাজের উদ্দেশ্য মহৎ। অবশ্য সহর লোপাট করেও সভ্যতা রক্ষা আমরা করতে পারব না, সভ্যতার বিনাশ পেছিয়ে দেওয়া আমাদের অসাধ্য। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের লোকেরা যাতে শান্তিতে ও মর্যাদার সঙ্গে বিলোপ পেতে পারে, তাই আমরা করব।'

'কি বলছে ও?' ক্রুদ্ধ জনতা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল।

'আমাদের মরবার দরকারটা কী শুনি?'

'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে!'

'তুস্কুব নিপাত যাক!'

তুস্কুবের ভ্রূকুণ্ঠনে এ্যামফিথিয়েটারে আবার শৃংখলা ফিরে এল।

'মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস শেষ হতে চলেছে। আমাদের গ্রহের জীবনে ঘুণ ধরেছে। জন্ম ও মৃত্যুর হারের কথা তো তোমরা জানো। আর কয়েক শতাব্দী পরে ছানি-পড়া চোখে মঙ্গলগ্রহের শেষ অধিবাসীরা শেষ সূর্যাস্ত দেখবে। বিলোপ রোখার শক্তি আমাদের নেই। শুধু জীবনের শেষ কটি দিন যাতে আরামে ও আনন্দে কাটে তার জন্য বিজ্ঞ লোকের মতো দৃঢ় ব্যবস্থা না করলে চলবে না। তার জন্য প্রথমে ও প্রধানত সহর লোপাট করা চাই। সহর থেকে যা পাবার তা পেয়েছে সভ্যতা, এখন সভ্যতার অবনতি ঘটাচ্ছে সহর; সহরের বিলোপ না করে উপায় নেই।'

এ্যামফিথিয়েটারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠল গর, চওড়া মুখ যে যুবকটিকে গুসেভ দেখেছিল মায়া-মুকুরে।

কণ্ঠস্বর তার নিচু, খস্‌খসে। তুস্কুবের দিকে আঙুল হেলিয়ে সে বলল:

'মিথ্যে কথা! ও সহরকে কেন লোপাট করতে চাইছে? নিজের ক্ষমতা রাখার জন্য। আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে যাতে ক্ষমতা বজায় থাকে। ও জানে যে লক্ষ লক্ষ লোককে যমের দুয়ারে পাঠালে শুধু ক্ষমতা বজায় থাকবে। ও জানে ওকে কী

ঘৃণা করে তারা যারা সোনার নৌকোয় চড়ে না, যারা জন্মায় আর মরে মাটির নিচেকার কলকারখানায়, উৎসবের দিনে যারা আনমনে ঘুরে বেড়ায় ধূলিধূসর অলিগলিতে, হতাশায় হাই তুলে যারা অভিশপ্ত খাভ্‌রার ধূপে পাগলের মতো বিলুপ্তি খোঁজে। তুস্কুব তো আমাদের জন্য মৃত্যুশয্যা বিছিয়েছে — ও নিজে শুয়ে পড়ুক তাতে। আমরা মরতে চাই না। বেঁচে থাকার জন্য আমরা জন্মেছি। বিপদের কথা, মঙ্গলগ্রহের বিনাশের কথা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের রক্ষাকর্তার অভাব নেই। আমাদের বাঁচাবে পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, স্বাস্থ্যদীপ্ত সেই জাতি যার শিরায় উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। দুনিয়ায় তাদেরি সবচেয়ে বেশী ভয় পায় ও। তুস্কুব, তুমি নিজের বাড়িতে পৃথিবীর দুজন মানুষকে লুকিয়ে রেখেছ। আকাশ-সন্তানদের ডরাও তুমি। দুর্বল যারা, খাভ্‌রার ধোঁয়াখোর যারা শুধু তাদেরি মধ্যে তুমি শক্তিশালী। উষ্ণ রক্ত যাদের, যারা বলিষ্ঠ তারা আসামাত্র তুমি নিজে ছায়ার মতো, দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে, উধাও হয়ে যাবে ছায়ামূর্তির মতো। এটা তুমি সবচেয়ে বেশী ডরাও! অরাজকতা নিয়ে তত্ত্বকথা বেশ মাথা ঘামিয়ে বানিয়েছ বটে, ঝোঁকের মাথায় খসড়া করেছ সহর ধ্বংসের পরিকল্পনা। তুমি চাও আকণ্ঠ রক্তপান করতে। যে দুজন দুঃসাহসী মানুষ আমাদের সাহায্য করতে এসেছে তাদের অলক্ষিতে সরানোর জন্য তোমার দরকার সকলের মন

অন্যদিকে ফেরানো। আমি জানি, তুমি এরিমধ্যে হুকুম জারি করেছ যে...'

মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল গর। কষ্টে মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। ভুরুর নিচে থেকে কঠোর দৃষ্টিতে তার চোখে চোখ রাখল তুস্কুব।

'...আমাকে থামিও না বলছি!.. আমি চুপ করব না!' খস্‌খসে স্বরে বলল গর। 'জানি পিশাচসিদ্ধির ছলাকলা তোমার রপ্ত ... কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে ডরাই না আমি...'

চওড়া হাতের তালুতে বহু কষ্টে কপালের ঘাম মুছল গর। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, পা তার টলছে। এ্যামফিথিয়েটারে রুদ্ধশ্বাস নির্বাক লোক তাকিয়ে আছে, বেঞ্চে বসে পড়ল গর, মাথাটা হেলে পড়ল হাতে। দাঁত কড়মড়ের আওয়াজ শোনা গেল তার।

ভুরু তুলে শান্তভাবে বলে চলল তুস্কুব:

'পৃথিবী থেকে আসা লোকেতে বুঝি তোমার ভরসা? দেরী হয়ে গেছে। আমাদের শিরায় আবার টাটকা রক্ত আনা? দেরী হয়ে গেছে। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে, নিষ্ঠুর ব্যাপার সেটা। আমাদের গ্রহের যন্ত্রণার জের টেনে চলা শুধু। তাতে আমাদের দুর্ভোগ বাড়বে, কেননা তাহলে বিজেতাদের গোলাম হতে হবে, না হয়ে উপায় নেই। সভ্যতার শান্ত ও মহান

সূর্যাস্তের বদলে তাহলে কালচক্রের ক্লান্ত প্রদক্ষিণে আবার নিজেদের সঁপে দিতে হবে। কিন্তু কেন? আমরা ভঙ্গুর ও জ্ঞানী লোক, কেন আমরা সেবা করব বিজেতাদের? প্রাসাদ ও বাগান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবে জীবনলোভী বর্বরেরা, আমাদের দিয়ে বানাবে নতুন জলাশয়, তোলাবে আকরিক, মঙ্গলগ্রহের উপত্যকায় আবার ধ্বনিত হবে যুদ্ধের হুঙ্কার, সে জন্য? সহরগুলো আবার ভরে উঠবে বিপথগামী বিকৃতমস্তিষ্ক গড্ডলিকায়, সে জন্য? না, তা চলবে না। বাসার দোরগোড়ায় শান্তিতে মরতে হবে আমাদের। দূর থেকে পড়ুক তালৎসেৎলের লাল আভা। বিদেশীদের আবার কাছে ডেকে আনব না। মেরুতে মেরুতে নতুন কেন্দ্র বানাব, আমাদের গ্রহ ঘিরে ফেলব দুর্ভেদ্য আবরণে। সয়াৎসেরাকে, অরাজকতা ও পাগল স্বপ্নের এই আস্তানাকে উৎখাত করব — ওখানেই তো গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কুফন্দি। সহরের রাস্তায় চালাব লাঙল। জীবন ধারণের জন্য দরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু রেখে দেব, সেখানে খাটাব আসামীদের, মদ্যপায়ীদের, মাথা খারাপ যাদের ও যারা দিবাস্বপ্নের ঘোরে সময় কাটায় তাদের। শেকলে বেঁধে রাখব তাদের। তাদের বেঁচে থাকতে দেব, কেননা তারা বেঁচে থাকতে উৎসুক। যারা আমাদের কথা মেনে চলবে তারা গ্রামে বাড়ি পাবে, পাবে অন্নসংস্থান, পাবে সুখসুবিধে। বিশ হাজার বছর কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমরা বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করেছি,

অধিকার পেয়েছি শান্তিতে আরামে থাকার, চিন্তা করার। সভ্যতার সমাপ্তি হবে স্বর্ণযুগের গৌরব শিখরে। সাধারণ উৎসব ও অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হবে। এমন হতে পারে শান্তিতে থাকলে আমরা আরো কয়েক শ বছর জীবনের জের টেনে যেতে পারব।'

এ্যামফিথিয়েটারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিস্তব্ধতা। তুস্কুবের মুখে ছোপ ছোপ দাগ। চোখ বুজে যেন দেখছে অনাগতকে। বাক্যের মাঝখানে ছেদ পড়েছে ...

... খিলান-দেওয়া হল-ঘরে ভেসে এল বাইরের জনতার বহুকণ্ঠ গুরুগুরু আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল গর। মুখ তার বিকৃত। টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল তুস্কুবের দিকে বেঞ্চগুলি হয়ে। তুস্কুবের টুঁটি চেপে ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ব্রোকেড-ঢাকা মঞ্চ থেকে। তেমনি ভাবে হাত বাড়িয়ে আঙুল ফাঁক করে ফিরে দাঁড়াল এ্যামফিথিয়েটারের দিকে। হাঁফ-ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'বেশ! মরতে যদি চাও তাহলে মরো — তোমরাই মরো! মরো তোমরা, আমরা লড়ে যাব ...'

বেঞ্চি থেকে অনেকে হৈচৈ করে নেমে পড়ল, কয়েকজন ছুটে গেল ধরাশায়ী তুস্কুবের দিকে।

এক লাফে দ্বারের কাছে গিয়ে গর কনুই-এর ধাক্কায় সরিয়ে দিল প্রহরীকে। স্কোয়ারে যাবার দরজায় ঝলকে উঠল

কালো আলখাল্লার প্রান্তদেশ। দূর থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর। হাওয়ার হুঙ্কারের মতো তার প্রতিধ্বনি জাগল জনতার মধ্যে।

লস একাকী

'বিপ্লব, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, গোটা সহরটা ক্ষেপে গেছে! কী মজা!'

লাইব্রেরীতে কথা বলছে গুসেভ। তার সাধারণত ঘুম-জড়ানো চোখে ফুর্তির ঝিলিক। নাক কুঁচকে গেছে, গোঁফ খাড়া। চামড়ার বেল্টের নিচে হাত বেশ খানিকটা গুঁজে বলল:

'উড়ো-নৌকোয় সবকিছু জড়ো করে রেখেছি — খাবারদাবার হাত-বোমা, সব। একটা বন্দুক পর্যন্ত বাগিয়েছি। বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জলদি চলুন।'

সোফার কোণে পা গুটিয়ে বসে লস দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আএলিতার আসার অপেক্ষায় এরি মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক কেটেছে, দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনেছে, কিন্তু আএলিতার ঘরগুলোতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সোফার কোণে আশায় বসে রয়েছে, কখন শোনা যাবে আএলিতার পদধ্বনি। সে জানত, সেই লঘু পদধ্বনিতে হৃদয়ে ঝড় বয়ে যাবে। সে আসবে, বরাবর যেমন, কল্পনার চেয়ে অপরূপ, বাঞ্ছনীয়; আসবে উঁচু সূর্যালোকিত জানলার নিচ

দিয়ে, কাঁচের মতো ঝকঝকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে তার কালো গাউন। আর তখন লসের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠবে, সমস্ত অন্তর শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে যাবে, ঝড়ের আগে যেমন।

'জ্বর হয়েছে নাকি আপনার, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ? হাঁ করে বসে আছেন কেন? বলছি চলুন, সব তৈয়ার, আমি চাই আপনি মঙ্গলগ্রহের কমিসার হন। ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ।'

গুসেভের দৃষ্টি এড়াবার জন্য মুখ নিচু করে অস্ফুট কণ্ঠে শুধাল লস:

'সহরে কী চলেছে?'

'শয়তান জানে। রাস্তায় অনেক লোক, হৈ হট্টগোল। জানলা ভাঙছে।'

'আপনি যান আলেক্সেই ইভানভিচ, কিন্তু রাত্তিরে ফিরে আসা চাই। কথা দিচ্ছি, আপনাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করব, যা চান তাই হবে। বিপ্লব পাকান, আমাকে কমিসার বানিয়ে দিন, দরকার হলে আমাকে গুলি করে মারুন। কিন্তু দোহাই আপনার, আজ আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন। রাজী?'

'বেশ,' গুসেভ বলল। 'এঃ, স্ত্রীলোকগুলো কী গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে, গোল্লায় যাক বেটারা। সপ্তম স্বর্গে উড়ে এলাম, সেখানেও কিনা মেয়েমানুষ! ফুঃ! মাঝরাতে ফিরে আসব। ইখশ্কা দেখবে আমার ব্যাপারটা কেউ যেন টের না পায়।'

গুসেভ চলে গেল। আবার বই হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল লস:

'কীসে এ সবের সমাপ্তি? প্রেমের এ তুফান কি শান্ত হবে? তা হবে না। হঠাৎ আলোর, অপরূপ আলোর ঝলকানির প্রতীক্ষায় এই যে বসে থাকা মৃত্যুর মতো যন্ত্রণায়, আমি কি তাই চেয়েছিলাম? আনন্দ ছিল না, বিষণ্ণতা ছিল না, স্বপ্ন সাধ বা তৃপ্তি ছিল না কোনো ... কিন্তু আএলিতার সান্নিধ্যে মনে হল হিম নিঃসঙ্গ শরীরে প্রাণের স্রোত বইছে। কাঁচের মতো ঝকঝকে মেঝেতে দীপ্ত জানলাগুলোর নিচ দিয়ে লঘু চরণ ফেলে এল জীবন। কিন্তু এও-তো স্বপ্ন। আমি চেয়েছিলাম আমার কামনা পূর্ণ হোক। তাহলে প্রাণের স্রোত বইবে ওর-ও অন্তরে। কম্পিত, রূপান্তরিত দেহে পূর্ণ হয়ে উঠবে আএলিতা। তখন আমার আবার শুরু হবে নিঃসঙ্গ ব্যাকুলতা।'

এর আগে কখনো এত পরিষ্কারভাবে প্রেমের আশাহীন ব্যাকুলতা অনুভব করেনি লস, প্রেমের ভ্রান্তির কথা এভাবে কখনো বোধগম্য হয়নি তার—নারীর কাছে আত্মদান, কী ভয়ঙ্কর সে বলি! পুরুষ জাতির অভিশাপ সেটা। হাত বাড়িয়ে, হাত ছড়িয়ে তারায় তারায় নারীর প্রতীক্ষায় থাকা। সবকিছু নিয়ে নারী রইল বেঁচে। আর প্রেমিক ও পিতা ছায়ামূর্তির মতো হাত বাড়িয়ে আছে তারায় তারায়।

ঠিক বলেছিল আএলিতা। সত্যি এর মধ্যে সে বৃথায়

অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, চেতনায় তার বড়ো বেশী জানার ভার। তার শরীরে, আকাশ-সন্তানের শরীরে এখনো উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, অস্থির প্রাণের বীজ এখনো পূর্ণ করে রেখেছে তার সত্তাকে। কিন্তু বুদ্ধি তার সুদূর প্রসারী, হাজার বছর এগিয়ে আছে: এইখানে, অন্য একটি লোকে, যা জানার কোনো দরকার ছিল না তা ধরা পড়েছে তার কাছে। বুদ্ধি তার সামনে খুলে দিয়েছে তুষার মরুভূমি। কী আবিষ্কার করেছে তার বুদ্ধি? মরুভূমি, আর তার সীমানা পেরিয়ে নতুন রহস্যলোক।

উষ্ণ আলোয় সরেস উচ্ছ্বাসে চোখ বুজে গান গাওয়া পাখিকে মানুষের জ্ঞানের কণাটুকু বোঝাবার চেষ্টা করুন, মরে পড়ে যাবে সে।

জানলার বাইরে ছেড়ে-দেওয়া উড়ো-নৌকাটার হুইসল শোনা গেল। তারপর লাইব্রেরীতে মুখ বাড়িয়ে ইখা বলল:

'আকাশ-সন্তান, খেতে চলুন ...'

তাড়াতাড়ি খাবার ঘরে গেল লস, সাদা গোল সেই ঘরটায় যেখানে এ কটা দিন আএলিতার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছে। ঘরটা গরম। থামের পাশে উঁচু ফুলদানিগুলিতে উগ্র সৌরভ। কেঁদে কেঁদে রাঙা চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে ইখা বলল:

'আজ আপনাকে একলা খেতে হবে, আকাশ-সন্তান।' আএলিতার প্লেটটা সাদা ফুলে ঢাকা দিয়ে দিল।

অন্ধকার বেজার মুখে লস বসল টেবিলে। খাবার ছুঁল না

কিন্তু, শুধু রুটি নাড়াচাড়া করে কয়েক গেলাস মদ খেল। টেবিলের ওপর কাঁচ-লাগানো গম্বুজ, তা থেকে অন্য দিনকার মতো নিঃসারিত হচ্ছে সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ। দাঁতে দাঁত চিপল লস।

গম্বুজ থেকে উৎসারিত হচ্ছে দুটি আওয়াজ, একটি তারের, অন্যটি পেতলের যন্ত্রের। সুর দুটি অঙ্গাঙ্গি হয়ে মিলে এমন সব স্বপ্নের জের টেনে চলেছে যেগুলো কখনো সত্যি হবে না। মুমূর্ষু খাদে পোঁছিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসছে নিখাদে, মৃতলোক থেকে ব্যাকুলভাবে ডেকে বলছে মিলনের কথা, বারবার মিশে যাচ্ছে দুটো সুর, ঘুরপাক খাচ্ছে, অতি পুরাতন ওয়াল্‌জের মতো।

মদের সরু গেলাস দৃঢ় মুঠিতে চেপে বসে রইল লস। থামের আড়ালে গিয়ে ইখা পোষাকের খুঁট দিয়ে মুখ ঢাকল, কাঁধদুটো থরথর করে কাঁপছে। ন্যাপকিন ছুঁড়ে ফেলে লস উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ সঙ্গীত, ফুলের গুমোট গন্ধ, উগ্র মদ— সবকিছু একেবারে অর্থহীন।

ইখার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আএলিতার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

মুখ না খুলে লাল চুল ঝাঁকিয়ে ইখা জানাল, 'না'। তার কাঁধ চেপে ধরে শুধাল লস:

'কী হয়েছে? ওর অসুখ করেছে? ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার আমার।'

লসের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাল ইখা। থামের কাছে মেঝেতে পড়ে গেল একটা ফটোগ্রাফ। চোখের জলে ভেজা ছবিটা গ্নুসেভের, সামরিক পোষাকে আপাদমস্তক সজ্জিত, কাপড়ের শিরস্ত্রাণ, কাঁধের বেল্ট বুক বরাবর নেমেছে, এক হাত তরবারির বাঁটে, অন্য হাতে রিভলভার। পেছনে ফেটে-পড়া হাত-বোমা। ছবিতে লেখা: 'চির জনমের স্মৃতি হিসেবে আদরের ইখশ্‌কাকে।'

ফটোটা ফেলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে লস চলল ঘাস-মাঠ হয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে, বড়ো বড়ো পা ফেলে। নিজের অজ্ঞাতসারে সে বেশ লাফিয়ে চলেছে আর বিড়বিড় করছে:

'দেখা করতে যদি না চায়, বেশ। নতুন একটা পৃথিবীতে অসম্ভব সাধন করে এসেছি কেন? সোফার কোণে বসে যাতে প্রতীক্ষায় থাকি, কখন, কখন অবশেষে তিনি আসবেন ... পাগলের প্রলাপ! ঠিক বলেছে গ্নুসেভ। আমি জ্বরের ঘোরে আছি, তুক করেছে আমাকে। মিষ্টি চাউনির জন্য বসে আছি, যেন তা না হলে পৃথিবী লোপ পেয়ে যাবে... গোল্লায় যাক সব!..'

ব্যথায় মুচড়ে উঠছে মন। দাঁতের ব্যথায় যেন কাতরে উঠল লস। আপনা থেকে বেশ উঁচুতে লাফিয়ে কোনক্রমে টাল সামলে দাঁড়াল। হাওয়ায় উড়ছে সাদা চুল। নিজের ওপর ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে।

হ্রদের কাছে দৌড়িয়ে এল লস। কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল। নীল-কালো বুকে আলোর ঝিলিক। গরম পড়েছে। মাথা আঁকড়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল লস।

টকটকে লাল গোলপানা সব মাছ হ্রদের স্বচ্ছ গভীর জল থেকে অলসভাবে উঠে লম্বা কানকো নাড়িয়ে উদাসীন জোলো চোখে চেয়ে রইল লসের দিকে।

নিচু গলায় লস বলল, 'শোনো হে তোমরা, ড্যাবডেবে চোখ মাছেরা, শোনো তোমরা, আমি শান্ত, প্রকৃতিস্থ হয়ে কথা বলছি। আগ্রহ আমাকে অস্থির করে তুলেছে, কালো বেশে ও যখন আসে তখন ওকে বাহু বন্ধনে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমি শুনতে চাই ওর হৃৎপিন্ডের স্পন্দন ... অদ্ভুত গতিতে ও নিজে আসে আমার কাছে ... আমি দেখব কেমন করে ওর চোখে আসে বুনো অস্থির ভাব ... দেখছ তো তোমরা, আমি চলৎশক্তিহীন, আমি থেমে পড়েছি, কিছু ভাবছি না আমি, ভাবতে চাই না। যাক, যথেষ্ট হয়েছে। ছিঁড়ে গেছে সুতো, সব শেষ। কাল যাব সহরে। লড়াই শুরু হবে—চমৎকার। মৃত্যু হবে—চমৎকার। শুধু যেন সঙ্গীত না থাকে, না থাকে ফুল বা কোনো ধূর্ত প্রলোভন। এ গুমোট আবহাওয়া আর সহ্য হয় না আমার। ওর হাতের সেই মায়া-গোলক গোল্লায় যাক, গোল্লায় যাক। সব ঝুট, সব মায়া।'

লস উঠে বড়ো একটা পাথর ছুঁড়ে মারল মাছের ঝাঁকে। মাথা ফেটে যাচ্ছে। চোখে বিঁধছে আলো। দূরে ঝোপজঙ্গল

পেরিয়ে উদ্যত হয়ে উঠেছে তুষারাবৃত একটি পাহাড়ের ঝকঝকে চূড়া। 'ঠান্ডা হাওয়া খাওয়া দরকার।' পাহাড়ের হীরক চূড়ার দিকে চোখ কুঁচকিয়ে তাকিয়ে লস নীল কুঞ্জের মধ্য হয়ে চলল, সে দিকে।

গাছপালা শেষ, সামনে একটা খাঁ খাঁ পাহাড়ে মালভূমি। তার দূর প্রান্তে তুষারাবৃত চূড়াটি। পায়ের তলায় ধাতুমল আর ভাঙা পাথর। চারিদিকে পরিত্যক্ত খনির খোঁদল। দূরে জ্বলন্ত সেই তুষার স্তূপে দাঁত বসাতে হবে স্থিরসংকল্প করেছে লস।

একদিকে ফাঁকা একটা জায়গায় তামাটে রঙের ধূলোর মেঘ উঠল। উষ্ণ হাওয়ায় ভেসে এল বহু কণ্ঠের ধ্বনি। একটা টিলার ওপর থেকে লসের চোখে পড়ল মঙ্গলগ্রহবাসীদের বড়ো একটা দল মরা খালের গর্ভে কষ্ট করে চলেছে। হাতে শাবল আর কয়লা তোলার হাতুড়ি, লম্বা লাঠির ডগায় ছুরি আটকানো। হোঁচট খেতে খেতে চলেছে, অস্ত্র আস্ফালন করে হিংস্র হুঙ্কারে। ধূলোর মেঘের ওপরে পাক খেয়ে উড়ছে শিকারী পাখি।

সহরে গন্ডগোলের বিষয়ে কিছুক্ষণ আগে গুসেভ যা বলেছিল মনে পড়ে গেল লসের। ভাবল, 'বেঁচে থাকা, লড়াই চালানো, জয়লাভ করা আর ধ্বংস পাওয়া—বেশ, কিন্তু অস্থির অশান্ত হৃদয়কে শেকলে বেঁধে রাখা চাই।'

ছোট পাহাড়গুলোর ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা,

চিন্তার তাড়নায় লস দ্রুত পদক্ষেপে আবার চলতে শুরু করল উত্তেজনায়। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে তাকাল। নীল আকাশ থেকে নামছে একটি উড়ো-নৌকো। আলোয় ঝকঝকিয়ে মাথার ওপর পাক খেয়ে ক্রমশ নিচে এসে অবশেষে নামল।

ধবধবে সাদা ফার গায়ে জড়ানো কে যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে নৌকোয়। ফারের মধ্যে থেকে, চামড়ার শিরস্ত্রাণের মধ্যে থেকে লসের দিকে উৎকণ্ঠিত তাকিয়ে আছে আএলিতা। লসের বুকে হাতুড়ির ঘা যেন। নৌকোর কাছে যেতে নিশ্বাস প্রশ্বাসে আর্দ্র ফার মুখ থেকে সরিয়ে দিল আএলিতা। কালো হয়ে যাওয়া চোখে তার দিকে চেয়ে রইল লস। আএলিতা বলল:

'তোমার জন্য এসেছি। সহরে গিয়েছিলাম। আমাদের পালিয়ে যেতে হবে। তোমার জন্য ভেবে ভেবে আমি সারা।'

নৌকোর গা চেপে ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল লস।

মোহ

আএলিতার পেছনে বসেছে লস। চালক, লোহিতদেহ ছোকরা একজন, অনায়াসে উড়ো-নৌকো চালিয়ে নিয়ে উঠল আকাশে।

মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। আএলিতার সাদা ফার কোটে পাহাড়ে ঝড় আর বরফের গন্ধ। লসের দিকে ফিরে তাকাল সে, মুখ তার আরক্তিম।

'বাবার সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি তোমাকে এবং তোমার বন্ধুকে বিষ খাওয়াবার হুকুম দিলেন।' সাদা দাঁত তার ঝিকঝিকিয়ে উঠল, হাতের শক্ত মুঠি খোলাতে দেখা গেল আংটিতে পাথরের ছোট একটা শিশি ঝুলছে। 'বাবা বললেন, "ওদের শান্তিতে মরতে দাও, শান্তিতে মরার অধিকার ওদের আছে।"'

ধূসর চোখ আএলিতার জলে ভরে গেল। কিন্তু তক্ষুণি হেসে উঠে আংটি খুলে নিল। তার হাত চেপে ধরল লস।

'ফেলে দিও না', শিশিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিতে দিতে বলল, 'এটা তোমার উপহার, আএলিতা। বিষের কালো ফোঁটা, ঘুম আর শান্তি। এখন তো তুমি জীবন ও মরণ দুই-ই, আএলিতা।' তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'যখন নিঃসঙ্গতার সেই ভয়াবহ মুহূর্ত আবার আসবে তখন বিষের ফোঁটায় স্বাদ পাব তোমার।'

কী বলছে বোঝার চেষ্টায় চোখ বুজে আএলিতা লসের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। কিন্তু তাতে ফল হল না কোনো, বোঝা গেল না কিছু। হাওয়ার হুঙ্কার, পিঠে লসের উষ্ণ বুকের ছোঁয়াচ, কাঁধে সাদা ফারের মধ্যে তার হাত—মনে হল দুজনের রক্ত বয়ে চলেছে একই ধমনীতে, একই উচ্ছ্বাসে, একই দেহে দুজনে উড়ে চলেছে উজ্জ্বল কোন জাতিস্মর লোকে। বুঝে কী লাভ? বোঝার উপায় নেই!

মিনিটখানেক কেটে গেল। তুস্কুবের বাগানের কাছে এসে

পড়েছে উড়ো-নৌকো। মুখ ফিরিয়ে তাকাল চালক: কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে আএলিতা ও আকাশ-সন্তানকে! চোখের মণিতে ঝিকঝিক করছে আলোর টুকরো। হাওয়ায় এলোমেলো আএলিতার কোটের ধবধবে সাদা ফার। ব্যাকুল বিধুর চোখ মেলে দিয়েছে আএলিতা আলোর অপরূপ সাগরে।

ছোকরা-চালক কলারে খাড়া নাক ডুবিয়ে চুমকুড়ি দিয়ে হাসল নিঃশব্দে। উড়ো-নৌকোটাকে একটা ডানায় হেলিয়ে ছোঁ মেরে হাওয়া চিড়ে সটান নেমে এল আএলিতার বাড়ির পাশে।

মোহ ভেঙে গেল আএলিতার। কোট খোলার চেষ্টায় পাখির মাথা আঁকা বোতাম হাতড়াতে লাগল। নৌকো থেকে তাকে তুলে ঘাসে নামিয়ে লস ঝুঁকে দাঁড়াল তার ওপর। ছোকরা-চালককে আএলিতা বলল:

'ঢাকনা-দেওয়া নৌকোটা নিয়ে এস।'

নজরে তার পড়ল না ইখশ্কার কেঁদে-কেঁদে রাঙা চোখ বা বাড়ির ভয়ার্ত সরকারের কুমড়োর মতো হলদে মুখ। যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবে মৃদু হেসে লসের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তাকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছন দিকটায় নিজের মহালে।

এই প্রথম লস দেখল আএলিতার ঘরদোর: নিচু সোনার থাম, দেয়ালগুলোয় সিলউয়েট্ আঁকা, চীনে ছাতায় যেমন ছবি থাকে তেমন। উষ্ণ ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা ঘোরে।

আএলিতা শান্ত কণ্ঠে বলল:

'বোসো।'

লস আসন গ্রহণ করাতে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে আএলিতা কোলে মাথা রাখল, তার বুকে হাত রেখে স্থির হয়ে রইল।

লস সস্নেহে চেয়ে দেখল তার চূড়ো করে বাঁধা ছাইরঙা চুল, হাতের ওপর হাত রাখল তার। আএলিতার গলা থরথর করে কাঁপছে। লস ঝুঁকে পড়াতে আএলিতা বলল:

'আমার সঙ্গ হয়ত তোমার সইছে না? মাফ করো। আমি এখনো ভালোবাসতে শিখিনি। আমার কাছে সবকিছু এত ঝাপসা অস্পষ্ট। ইখাকে বলেছিলাম তুমি যখন একলা তখন খাবার ঘরে যেন আরো ফুল রাখে, আর উল্লা যেন বেজে চলে তোমার জন্য।'

লসের হাঁটুতে কনুই-এর ভর রাখল আএলিতা। তার মুখে স্বপ্নের ঘোর।

'উল্লার ধ্বনি শুনেছ? বুঝেছ কিছু? আমার কথা কি তুমি ভাব?'

'তুমি তো জানো,' লস জবাব দিল, 'যখন তোমাকে দেখি না তখন উৎকণ্ঠায় মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর যখন দেখি তোমাকে আরো ভয়ঙ্কর সে উৎকণ্ঠা। এখন মনে হয় তোমার জন্য ব্যাকুলতাই আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে নক্ষত্রলোক পেরিয়ে।'

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আএলিতা। তার মুখে সুখের ছাপ।

'বাবা তো আমাকে বিষ দিলেন, কিন্তু দেখলাম আমাকে বিশ্বাস করেন না। বললেন, "তোদের দুজনকেই মেরে ফেলব।" আমাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে মুহূর্তগুলি ছড়িয়ে পড়ছে অসীম আনন্দে, অন্তহীন মুহূর্তগুলি।'

লসের চোখ দৃঢ় সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠল, শক্ত হয়ে উঠল মুখের ভাঁজ। দেখে চুপ করে গেল আএলিতা।

'বেশ,' বলল লস, 'আমি লড়ব।'

কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল আএলিতা:

'তুমি হলে আমার শৈশব স্বপ্নের সেই বিরাট পুরুষ। কী সুন্দর, কী বলিষ্ঠ তুমি, আকাশ-সন্তান! তুমি নির্ভীক, সদয়। তোমার হাত লোহায় গড়া, তোমার হাঁটু পাথরের। কী সাংঘাতিক তোমার দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে মেয়েদের বুক ভারি হয়ে ওঠে।'

লসের কাঁধে আলতোভাবে রয়েছে আএলিতার মাথা। তার কথা অস্পষ্ট হয়ে এল, প্রায় শোনা যায় না। তার মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল লস।

'কী হল?'

গভীর আবেগে আএলিতা তার গলা জড়িয়ে ধরল, শিশুর মতো। চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল সরু গাল বেয়ে। বলল:

'আমি ভালোবাসতে শিখিনি, ভালোবাসা কাকে বলে

কখনো জানিনি... আমাকে দয়া করো, ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে বলব শোনার মতো ইতিহাস। করাল ধূমকেতু, হাওয়াই জাহাজের যুদ্ধ, পাহাড়ের ওদিকে সুন্দর দেশের বিলোপের কাহিনী শোনাব। আমাকে ভালোবেসে একঘেয়ে তোমার লাগবে না। আমাকে কেউ কখনো সোহাগ করেনি। তোমাকে প্রথম দেখে ভেবেছিলাম, একে তো আমি দেখেছি ছেলেবেলায়, এতো সেই বিরাট পুরুষ, আমার আপন জন। সাধ হল তুমি আমাকে বাহু ডোরে বেঁধে নিয়ে যাও এখান থেকে। এখানে নিরানন্দ, আশা নেই কোনো, মৃত্যু, শুধু মৃত্যু। সূর্য আর উত্তাপ দেয় না। মেরুদেশে বরফ গলে না। শুকিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র। শেষহীন মরুভূমি, তামাটে বালুতে ঢাকা পড়ছে তুমা... পৃথিবী, পৃথিবী... আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে চল, আদরের বিরাট মানুষ। আমি দেখতে চাই সবুজ পাহাড় আর জলপ্রপাত আর মেঘ, প্রকাণ্ড সব জন্তুজানোয়ার আর বিরাট মানুষ... মরতে চাই না আমি...'

চোখের জল ফেটে পড়ল। একেবারে ছোট্ট মেয়ের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বিরাট মানুষদের কথা বলার সময় যে ভাবে হাততালি দিল সেটা মজার ও মধুর।

অশ্রুসিক্ত তার চোখে চুমু খেল লস। শান্ত হল সে, ঠোঁট ফুলে উঠল। আকাশ-সন্তানের দিকে সোহাগ-ভরা চোখে তাকিয়ে রইল, যেন রূপকথার বিরাট মানুষকে দেখছে।

হঠাৎ ঘরের আধো-অন্ধকারে শোনা গেল নিচু শিসের শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে আএলিতার ড্রেসিং-টেবিলের ওপরের লম্বাটে মায়া-মুকুর মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেখা গেল তুস্কুবের সন্ধানী মুখ চেয়ে আছে।

'তুই এখানে?' শুধাল সে।

বেড়ালের মতো গালিচায় লাফিয়ে নেমে আএলিতা ছুটে গেল আয়নার দিকে।

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আকাশ-সন্তানরা এখনো বেঁচে আছে?'

'না বাবা, আমি ওদের বিষ দিয়েছি, ওরা মরে গেছে।'

ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ন গলায় কথাটা বলল আএলিতা। লসের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছে পর্দা আড়াল করে।

'আমার কাছে আর কী চাও, বাবা?'

জবাব দিল না তুস্কুব। আএলিতার কাঁধ কাঁপছে, মাথা হেলে পড়েছে পেছনে। ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জিয়ে উঠল তুস্কুব:

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস! আকাশ-সন্তান সহরে। ও-ই তো বিদ্রোহের পাণ্ডা।'

টলে উঠল আএলিতা। বাবার মাথা আর দেখা গেল না।

পুরোনো দিনের গান

চার-ডানা একটা নৌকোয় লিজিয়াজিরা পাহাড়ের দিকে উড়ে চলেছে আএলিতা, ইখশ্‌কা ও লস।

তার লাগানো মাস্তুল অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে। সেটা

হল বিদ্যুত চুম্বক তরঙ্গের রিসিভার। ছোট পর্দার ওপর ঝুঁকে একমনে আএলিতা শুনছে, দেখছে।

মঙ্গলগ্রহের চুম্বক ক্ষেত্রে টেলিফোনে পাগলের মতো নানা বার্তা, সাড়া। চেঁচামেচি ও উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার হট্টগোলে কিছু ঠিকমতো ধরা মুশকিল। তবু সমস্ত কিছু বিশৃংখলা ছাপিয়ে দাবিয়ে প্রায় এক-টানা শোনা যাচ্ছে তুস্কুবের ইস্পাত-কঠিন গলা। মায়া-মুকুরে ইতস্তত ভেসে চলেছে বিক্ষুব্ধ একটি দুনিয়ার নানা ছায়ামূর্তি।

কয়েকবার হৈ হট্টগোলের মধ্যে আএলিতার কানে এল কে যেন অদ্ভুত কঠোর গলায় বলছে:

'...কমরেড্‌গণ, লোকের কানাঘুষোতে কান দেবেন না... কোনো অনুগ্রহ আমরা চাই না... বন্ধুগণ, হাতিয়ার ধরুন, চরম মুহূর্ত এসে পড়েছে... সমস্ত ক্ষমতা সোভি... সোভি... সোভি...।'

আএলিতা ইখশ্‌কার দিকে ফিরে বলল:

'তোমার বন্ধু বেশ বেপরোয়া দুঃসাহসী লোক দেখছি। খাঁটি আকাশ-সন্তান বটে। তার জন্য ডরিও না তুমি।'

ছাগলের মতো পা ঠুকে লাল চুল ঝাঁকাল ইখশ্‌কা। আএলিতা বুঝল যে তাদের পালানোর কথা ধরা পড়েনি। ইয়ার-ফোনদুটো খুলে হাতের তালু দিয়ে ঘুলঘুলির বাষ্পে-ঝাপসা কাঁচ মুছে লসকে বলল:

'আমাদের পিছু পিছু ইখি উড়ছে দেখ।'

মঙ্গলগ্রহের অনেক উঁচুতে চলেছে নৌকোটা। ছোপ ছোপ তামাটে পালকের জোড়া ডানা মেলে উদগ্র আলোতে দুপাশে উড়ছে দুটো বাদামী লোম পাখি। চেপটা বাঁকা লম্বা দাঁতওয়ালা ঠোঁট ঘুলঘুলির দিকে ফেরানো। লসকে দেখে একটা পাখি বোঁ করে নিচে নেমে ঠোক্কর মারল ঘুলঘুলির কাঁচে। লস ঝট করে মাথা সরিয়ে নেওয়াতে হেসে উঠল আএলিতা।

আজোরা পেছনে পড়ে রইল। নিচে লিজিয়াজিরা পাহাড়ের খাড়া শিখর। নৌকো সয়াম হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে নামল গভীর খাদের পারে একটি প্রশস্ত উদ্‌গত শৈলস্তবকে।

নৌকো গুহায় টেনে নিয়ে গেল লস ও চালক। জিনিসপত্র ঘাড়ে চাপিয়ে তারা মেয়েদের পেছন পেছন চলল গিরিখাতের দিকে একটি প্রায় অদেখা, জীর্ণ সিঁড়ি ধরে। আগে লঘু দ্রুতপায়ে চলেছে আএলিতা। পাহাড়ের উদ্যত দেয়ালে ভর দিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাল সে লসের দিকে। লসের মস্ত বড়ো পায়ের নিচে পাথর সরে সরে ছিটকিয়ে যাচ্ছে, খাদে উঠছে প্রতিধ্বনি।

'এখানেই পশমের ফেটি লাগানো লাঠি নিয়ে এসেছিল মাগাৎসিৎল,' আএলিতা বলল। 'যেখানে পূত আগুন জ্বলত সে জায়গাটা এক্ষুনি দেখতে পাবে।'

খাদের মাঝামাঝি সিঁড়িটা নেমে গেছে সঙ্কীর্ণ সুরঙ্গে। সোঁদা গন্ধ সুরঙ্গের অন্ধকারে। পাহাড়ে কাঁধ ঘষে, একেবারে

নিচু হয়ে লস অতি কষ্টে চলেছে ঝকঝকে দেয়ালগুলোর মধ্য দিয়ে। হাতড়ে পেল আএলিতার কাঁধ, তক্ষুনি ঠোঁটে লাগল তার নিশ্বাস। রুশীতে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'সোনা আমার।'

অর্ধালোকিত একটি গুহায় সুরঙ্গের শেষ। ব্যাসল্টের থামের দীপ্তি চারিদিকে। গুহায় ওদিকে বাস্পের পাতলা মেঘ। কোথায় যেন জলের কলকল ধ্বনি, অন্ধকারে অলক্ষ্য থামগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল চুঁইয়ে পড়ছে একটানা।

আগে আগে চলেছে আএলিতা। কালো কেপ আর খাড়া হুড কখনো দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপর, কখনো বা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বাস্পের মেঘে। অন্ধকারে আএলিতা বলে উঠল, 'সাবধান', তারপর তাকে দেখা গেল প্রাচীন সেতুর সংকীর্ণ খাড়া খিলানের ওপর। লস টের পেল পায়ের নিচে সেতুর খিলান কেঁপে কেঁপে উঠছে, কিন্তু আধো-অন্ধকারে ভাসমান পাতলা কেপ ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না।

অন্ধকার কমে এল। মাথার উপর স্ফটিকের ঝকঝকে দীপ্তি। গুহার শেষে নিচু পাথরের স্তম্ভশ্রেণী। তাদের পেরিয়ে দেখা গেল সন্ধ্যার সূর্যালোকে স্নাত লিজিয়াজিরার গিরিশিখর ও পাহাড়ে জলাশয়ের পরিপ্রেক্ষিত।

স্তম্ভশ্রেণীর অন্য দিকে চওড়া বারান্দা, লাল শেওলায় ঢাকা। বারান্দার পরেই অতল গহ্বর। প্রায় অলক্ষ্য সিঁড়ি আর পথ উপরে চলে গেছে গুহা-সহরে। বারান্দার মাঝখানে পবিত্র দ্বারদেশ, অর্ধেকটা মাটিতে বসে গেছে, অর্ধেক শেওলায় ঢাকা।

এটা হল বড়ো বড়ো সোনার পাতে তৈরি শবাধার। চারপাশে পশু পক্ষীর স্থূলভাবে আঁকা ছবি। উপরে নিদ্রিত মঙ্গলগ্রহবাসীর মূর্তি। এক হাত মাথার নিচে, অন্য হাতে বুকে চেপে রেখেছে উল্কা। বিচিত্র এই ভাস্কর্যের চারিধারে স্তম্ভশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ।

পবিত্র দ্বারদেশের সামনে নতজানু হয়ে বসে আএলিতা নিদ্রিত মঙ্গলগ্রহবাসীর বুকে চুম্বন করল। উঠে যখন দাঁড়াল, মুখে কোমল চিন্তার ছাপ। ইখাও নিদ্রিত মঙ্গলগ্রহবাসীর পা জড়িয়ে ধরে মুখ ছোঁয়াল তাতে।

বাঁ দিকে পাথুরে দেয়ালে অর্ধ-বিলুপ্ত লিপি, দেয়ালের গায়ে একটি সোনালি ত্রিকোণ দরজা। শেওলার স্তূপ সরিয়ে লস কষ্টে দরজাটা খুলল। পবিত্র দ্বারদেশের তত্ত্বাবধান যে করত তার প্রাচীন বাসা—পাথরের বেঞ্চি বসানো অন্ধকার গুহা, অগ্নিকুণ্ডের জায়গা আছে, আর আছে গ্রানিটে খোদাই সোফা। এখানে জিনিসপত্রের ঝোড়াগুলো নিয়ে আসা হল। মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে ইখা বিছানা পাতল আএলিতার জন্য, ছাদের নিচে একটা বাতিতে তেল ঢেলে জ্বালাল সেটা। ছোকরা-চালক গেল নৌকো পাহারা দিতে।

খাদের পারে গিয়ে বসল আএলিতা ও লস। খাড়া গিরিশিখরের পারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গভীর চিড়-ধরা পাহাড়ের গায়ে দীর্ঘ কালো ছায়ার প্রসার। নিরানন্দ অনুর্বর বন্য

জায়গাটা। এখানে অনেক কাল আগে আশ্রয় নিয়েছিল প্রাচীন আওলেরা।

'এক কালে পাহাড়গুলোতে গাছপালা জন্মাত,' আএলিতা বলল। 'খাশির পাল চরত, গিরিখাতে শোনা যেত জলপ্রপাতের আওয়াজ। তুমা এখন মরণের মুখে। হাজার হাজার বছরের কালচক্রে ছেদ পড়তে চলেছে। হয়ত আমরাই হলাম শেষ মঙ্গলগ্রহবাসী। আমরা যাবার পর প্রাণ থাকবে না তুমায়।'

চুপ করে গেল আএলিতা। কাছের ড্র্যাগন-পিঠ পাহাড়গুলোর পেছনে সূর্য অস্ত গেল। ঘোর রক্তাভা মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে একাকার হয়ে গেল পাটল বর্ণের গোধূলির সঙ্গে।

'কিন্তু আমার অন্তর বলে অন্য কথা,' আএলিতা উঠে খাদের পার হয়ে যেতে যেতে শুকনো শেওলা আর কাঠি তুলে নিতে নিতে বলল। কেপের প্রান্তদেশ ভরে লসের কাছে ফিরে এসে আগুন জ্বালাবার স্তূপ করল। তারপর গুহা থেকে একটি বাতি এনে হাঁটু গেড়ে বসে তার শিখায় শেওলায় আগুন ধরাল।

তখন বসে, কেপ থেকে ছোট্ট একটি উল্লা বের করে আএলিতা হাঁটুতে কনুই রেখে তারে টান দিল। ভ্রমরের গুনগুনানির মতো মধুর একটা সুর। রাত্রের অন্ধকারে দপদপে তারার দিকে মুখ তুলে গান ধরল মৃদু বিষণ্ণ গলায়:

শুকনো ঘাস আর গোবর আর ভাঙা ডাল কুড়িয়ে,
জড়ো করো গুছিয়ে,
পাথরে পাথর ঠোকো, দুটি প্রাণের অধীশ্বরী হে নারী !
জ্বালাও চকমকি, জ্বলে উঠবে আগুন।
পাশে বসে আগুনের, হাত রাখো উত্তাপে।
লেলিহান অগ্নিশিখার ওদিকে বসে আছে তোমার স্বামী।
নক্ষত্রগামী ধোঁয়ার মধ্য থেকে
পুরুষের চোখ চেয়ে আছে তোমার জঠরের অন্ধকারে,
তোমার অন্তরের গভীরে।
চোখ তার তারার চেয়ে দীপ্ত, উষ্ণ আগুনের চেয়ে,
চা'র জ্বলন্ত চোখের চেয়ে দুঃসাহসী।
জেনে রেখো, সূর্য পরিণত হবে অঙ্গারে,
আকাশ থেকে খসে পড়বে তারা,
পৃথিবীর উপর আর জ্বলবে না অশুভ তালৎসেৎল, —
কিন্তু তুমি, নারী, মৃত্যুহীন আগুনের পাশে বোসো,
হাত মেলে দাও অগ্নিশিখার কাছে,
কান পেতে শোনো তাদের কণ্ঠস্বর যারা এখনো জন্মায়নি,
তোমার জঠরের অন্ধকারে শোনা তাদের কণ্ঠস্বর।

নিভে গেল আগুন। কোলে উল্লা নামিয়ে আএলিতা চেয়ে রইল কয়লার দিকে, উষ্ণ লাল আভায় আলো হয়ে উঠেছে তার মুখ।

কঠোর সুরে বলল, 'আমাদের প্রাচীন প্রথামতো, স্ত্রীলোক যদি উল্লার গান শোনায় কোনো পুরুষকে, তাহলে তার স্ত্রী হয় সে।'

গুসেভের সাহায্যে

মাঝরাতে তুস্কুবের বাড়ির আঙিনায় উড়ো-নৌকো থেকে নামল লস। বাড়ির জানলাগুলো অন্ধকার। তার মানে, গুসেভ এখনো ফেরেনি। তেরছা দেয়ালে তারার আলো, জানলার কালো শার্সিতে নক্ষত্রের নীলাভ দীপ্তি। ছাদের কার্ণিশে বিচিত্র একটি ছায়া দাঁড়িয়ে কোণাকুণিভাবে। ভালো করে দেখল লস—কী হতে পারে এটা?

ছোকরা-চালক উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে সাবধান করে দিল:

'ওখানে যাবেন না।'

খাপ থেকে রিভলভার বের করল লস। ঠাণ্ডা বাতাসে নাসারন্ধ্র কাঁপছে। মনে পড়ছে খাদের উপরে সেই আগুন, জ্বলন্ত ঘাসের গন্ধ, আএলিতার দীপ্ত চোখ... আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সে, 'তুমি ফিরে আসছ তো? কর্তব্য যা তা কোরো, লড়াই কোরো, জয়ী হও, কিন্তু ভুলো না যেন, এ সবকিছু শুধু স্বপ্নের মতো, শুধু ছায়া... এখানে, আগুনের পাশে তুমি বেঁচে থাকবে, মরবে না। ফিরে এসো, ভুলো না যেন...' আরো কাছে সরে এসেছিল আএলিতা। কাছাকাছি তার সেই চোখজোড়া মনে হল তারার ধুলোভরা অতল আকাশে খুলে গেছে। 'ফিরে এসো, ফিরে এসো আমার কাছে, আকাশ-সন্তান...'

ঝলসে-দেওয়া সেই স্মৃতি নিভে গেল, রিভলভারের খাপ খোলার জন্য যতটুকু সময় লেগেছিল তার বেশী থাকেনি। বাড়ির অন্যদিকে ছাদের উপরে সেই অদ্ভুত ছায়ার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে লসের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল, বুকে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ — লড়াই, এবার লড়াই শুরু।

লঘু পায়ে বাড়ির দিকে দৌড়ল সে, মুহূর্তের জন্য থেমে কান পেতে শুনে গুঁড়ি মেরে গেল পাশের দেয়াল বরাবর, তারপর উঁকি মেরে দেখল কোণে। বাড়ির প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি এক পাশে হেলে পড়ে আছে একটা ভাঙাচোরা উড়ো-নৌকো। একটা ডানা ছাদের উপর উঁচিয়ে আছে তারার দিকে... থলের মতো কয়েকটা জিনিস ঘাসে পড়ে আছে লসের চোখে পড়ল। সেগুলো লাস। বাড়িতে অন্ধকার, সাড়াশব্দ নেই কোনো।

'এর মধ্যে গুসেভ নেই তো?' শবদেহগুলির কাছে দৌড়িয়ে গেল লস। 'না, শুধু এখানকার লোক দেখছি।' মুখ থুবড়ে একজন পড়ে আছে সিঁড়িতে। আর একজন উড়ো-নৌকোর ভাঙা স্তূপে। দেখে মনে হয় বাড়ি থেকে ছোঁড়া গুলিতে মারা গিয়েছে।

সিঁড়িতে দৌড়িয়ে গেল লস। দরজাটা একটু খোলা। বাড়িতে ঢুকে ডাকল:

'আলেক্সেই ইভানভিচ!'

সাড়া নেই কোনো। আলো জ্বালাতে গোটা বাড়িটা ঝকঝক করে উঠল। ভাবল একবার, 'বিপদ হতে পারে', কিন্তু পর মুহূর্তে ভুলে গেল বিপদের কথা। একটা থামের নিচে যেতে পা হড়কে গেল চটচটে কীসে।

'আলেক্সেই ইভানভিচ!' আবার হাঁকল লস।

কান পেতে শুনল: কোনো সাড়া নেই। তখন মায়া-মুকুরের সেই সরু ঘরটায় গিয়ে থুতনি শক্ত করে চেপে বসে রইল একটা আরাম-চেয়ারে। 'এখানে ওর অপেক্ষায় থাকব? না, যাবো ওকে সাহায্য করতে? কিন্তু কোথায় যাই? ভাঙাচোরা উড়ো-নৌকোটা কার? মরা লোকগুলোকে দেখে তো সৈন্য বলে মনে হয় না, বরং মজুরের মতো দেখতে। এখানে কারা লড়াই করেছে? গুসেভ না তুস্কুবের লোকেরা? না, বসে থেকে কোনো লাভ নেই।'

সুইচবোর্ডে নিয়ে প্লাগ্ বসাল 'সর্বোচ্চ পরিষদের স্কোয়ারের' চাবিতে, দড়ি টানাতে কী ভীষণ গর্জন ফেটে পড়ল ঘরে, পিছিয়ে গেল লস। লণ্ঠনের লালচে আভায় ধোঁয়ার মেঘ। লেলিহান অগ্নিশিখা আর স্ফুলিঙ্গ। আন্দোলিত বাহু, রক্তাক্ত মুখ কার যেন মূর্তি হঠাৎ ভেসে এল আয়নার বুকে।

দড়ি টেনে আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়াল লস।

'এ গোলমালের মধ্যে কোথায় ওর হদিস করি তার কোনো খবর রেখে যায়নি, এটা কী সম্ভব?'

পিছনে হাত মুড়ে নিচু-ছাদ ঘরে পায়চারি করতে লাগল

সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চট করে ঘুরে খাপ থেকে টেনে নিল রিভলভারটা। ঠিক মেঝে বরাবর দরজার কাছে একটি মাথা উঁকি মারছে, লাল চুল, তামাটে চামড়া।

লাফিয়ে দরজার কাছে গেল লস। দরজা পেরিয়ে দেয়ালের কাছে রক্তগঙ্গার মধ্যে পড়ে আছে একটি মঙ্গলগ্রহবাসী। তার হাত ধরে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিল লস। লোকটার পেট একেবারে দুখানা হয়ে গেছে।

ঠোঁট চেটে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বিড়বিড় করে বলল সে:

'জলদি যাও, আমরা মরতে বসেছি, আকাশ-সন্তান, বাঁচাও আমাদের... আমার হাতের মুঠো খুলে দাও...'

মুমূর্ষু লোকটার হাতের মুঠো খুলে একটি চিরকুট টেনে নিল লস। তাতে হিজিবিজি করে লেখা:

'আপনার জন্য একটা যুদ্ধ-জাহাজ ও সাতজন ছোকরাকে পাঠাচ্ছি — এরা বিশ্বাসী লোক। সর্বোচ্চ পরিষদের দালান আক্রমণ করতে চলেছি। গম্বুজের পাশে স্কোয়ারে জাহাজ নিয়ে নামবেন। গুসেভ।'

এখানে কী ব্যাপার চলেছে জিজ্ঞেস করার জন্য আহত মঙ্গলগ্রহবাসীর ওপরে ঝুঁকে পড়ে লস। কিন্তু চেয়ারে ছটফট করছে সে, মুখে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ।

লস দুই হাতে তার মাথা ধরাতে ঘড়ঘড়ানি বন্ধ হল। চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে চোখে বিভীষিকা,

তারপর অপরূপ শান্তির ঝিলিক। 'বাঁচাও...' চোখের তারা উল্টে গেল, মুখ গেল বেঁকে।

কোটের বোতাম এঁটে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে লস গেল সদর দরজায়। খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জাহাজটার পেছন থেকে হিসহিসিয়ে উঠল নীল আগুনের ঝিলিক। পাতলা ধারালো আওয়াজ। লসের হেলমেট উড়ে গেল বন্দুকের গুলিতে।

দাঁতে দাঁতে ঘষে সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে নেমে লস ছুটে গেল জাহাজটার দিকে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাহাজের কাঠামোটা ঠেলে উল্টে দিল তার পিছনে লুকোনো লোকগুলোর ওপর।

ধাতুর এবড়ো খেবড়ো স্তূপ ভেঙে পড়ল সশব্দে, শোনা গেল মঙ্গলগ্রহবাসীদের কিচিরমিচির চীৎকার। বিরাট ডানাটা হাওয়ায় দু একবার দুলে পড়ল তাদের ওপর যারা ভগ্নস্তূপের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। কুয়াশায় ঝাপসা ঘাস-মাঠ হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলল আনত দেহ কয়েকটি মূর্তি। এক লাফে সামনে এগিয়ে গুলি ছুঁড়ল লস। কর্ণবধির করা আওয়াজ। সবচেয়ে কাছের লোকটা ধপাস করে পড়ে গেল ঘাসে। আর একজন বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল।

তার রূপোলি কোটের কলার চেপে কুকুর বাচ্চার মতো তুলে ধরল লস। সৈন্য একজন। লস জিজ্ঞেস করল:

'তোকে তুস্কুব পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আকাশ-সন্তান।'

'মেরে ফেলব তোকে।'

'তা বেশ, আকাশ-সন্তান।'

'কিসে করে এসেছিস? জাহাজ কোথায়?'

আকাশ-সন্তানের ভয়াবহ মুখের সামনে ঝুলতে ঝুলতে মঙ্গলগ্রহবাসী আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখের ইসারায় গাছগুলো দেখিয়ে দিল। সেখানে ছায়ায় ছোট একটি যুদ্ধ-জাহাজ।

'সহরে আকাশ-সন্তানকে দেখেছিস? ওকে খুঁজে বের করতে পারবি?'

'তা পারব।'

'তাহলে চল।'

যুদ্ধ-জাহাজে লাফিয়ে উঠল লস। মঙ্গলগ্রহবাসী বসল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলির পিছনে। প্রপেলারের ঘর্ঘর। মুখে লাগছে নৈশ হাওয়ার তীব্র ঝাপট। তমসাবৃত শূন্যে বিরাট বন্য তারাগুলো দুলে উঠল একবার।

গুসেভের কার্যকলাপ

উড়ো-নৌকোয় বিমান মানচিত্র, বন্দুক, খাবারদাবার ও ছটি হাত-বোমা নিয়ে বেলা দশটার সময় গুসেভ রওনা হয়েছিল তুস্কুবের বাড়ি থেকে সয়াৎসেরার দিকে। হাত-বোমাগুলো লসের অজানতে এনেছিল পেত্রগ্রাদ থেকে।

দুপুরবেলায় নিচে দেখা গেল সয়াংসেরা। সহরের প্রধান রাস্তাগুলো পরিত্যক্ত। সর্বোচ্চ পরিষদের সামনে তারকাকারের বিরাট স্কোয়ারে তিনটি এক-কেন্দ্রিক অর্ধবৃত্তে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গী জাহাজ আর সৈন্যদল।

নিচে নামতে শুরু করল গুসেভ। সঙ্গে সঙ্গে লোকের নজরে পড়ল সে। স্কোয়ার থেকে সূর্যালোকে বেশ ঝিলিক মেরে সরাসরি উপরে সশব্দে উঠল একটি ছ-ডানার ঝকঝকে জাহাজ। ডেকে সারি বেঁধে রূপোলি মূর্তি। জাহাজটাকে ঘুরে একটা পাক দিল গুসেভ। ঝোলা থেকে সাবধানে বের করল একটা হাত-বোমা।

জাহাজে রঙীন চাকার ঘূর্ণন, ঝকঝক করছে মাস্তুলের তার।

নিজের জাহাজের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওদের ঘুষি দেখাল গুসেভ। ক্ষীণ আওয়াজ উঠল ওদের জাহাজে। ছোট ছোট বন্দুক তুলে ধরল রূপোলি মূর্তিগুলো। হলদে ধোঁয়ায় গর্জে উঠল বন্দুকগুলো, গুসেভের জাহাজের গায়ে বিঁধল গুলি, বোর্ডের একটুকরো ভেঙে গেল।

ফূর্তিতে বাপান্ত করে গুসেভ একটা লেভার টিপে বোঁ করে নামল জাহাজটার ওপর। তীর বেগে উড়ে যেতে যেতে ছুঁড়ল হাত-বোমা। বিকট একটা বিস্ফোরণ। জাহাজের টাল সামলে ফিরে তাকাল গুসেভ। পাগলের মতো ডিগবাজী খেতে খেতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জাহাজটা ঝনাৎ করে পড়ল নিচে কয়েকটা ছাদের ওপর।

এবার শুরু হল নানা কাণ্ড।

সহরের উপরে উড়ে যেতে যেতে ঠাহর করে গুসেভ চিনতে পারল মায়া-মুকুরে দেখা রাস্তাঘাট, সরকারী দালান, অস্ত্রাগার, মজুরদের এলাকা। কারখানার লম্বা দেয়ালের কাছে বিক্ষুব্ধ উই-এর ঢিবির মতো হাজার হাজার উত্তেজিত মঙ্গলগ্রহবাসীর ভিড়। গুসেভ নামাতে চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল জনতা। একটা ফাঁকা জায়গায় নেমে দন্তবিকশিত করল সে।

লোকে চিনতে পারল তাকে। হাজার হাত উঠল, সুর করে সবাই চেঁচাতে লাগল বারবার, 'মাগাৎসিৎল, মাগাৎসিৎল!' সাবধানে ক্রমশ কাছে ঘেঁসে আসত লাগল জনতা। গুসেভ দেখল তাদের কম্পিত মুখ, মিনতি-ভরা চোখ, মুলোর মতো লাল টেকো মাথা। সবাই মজুর, দীনদরিদ্র গড্ডালিকা।

নৌকো থেকে নেমে কাঁধে থলি ঝুলিয়ে বেশ জোরে হাত নাড়িয়ে গুসেভ বলে উঠল:

'সেলাম, বন্ধুগণ!' তক্ষুনি সবাই চুপচাপ। অবাস্তব সে স্তব্ধতা। ছোটখাটো পলকা মানুষগুলোর মধ্যে গুসেভকে দেখাচ্ছে দানবের মতো। 'আপনারা কি এখানে বাতচিতের জন্য জমায়েৎ হয়েছেন না লড়াই করার জন্য? বাতচিতের জন্য হলে আমি তাতে নেই, বিদায় তাহলে।'

ভিড় থেকে উঠল ভারি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। কয়েকটি মঙ্গলগ্রহবাসী হতাশায় দীর্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আর তার ধুয়া ধরল অন্য সবাই:

'বাঁচাও, বাঁচাও আমাদের, আকাশ-সন্তান!'

'তার মানে, আপনারা লড়তে চান?' জিজ্ঞেস করল গুসেভ। তারপর হেঁড়ে গলায় বলল, 'লড়াই শুরু হয়েছে। এই তো আমাকে জঙ্গী জাহাজ আক্রমণ করেছিল। যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছি। ধরুন হাতিয়ার, চলুন আমার সঙ্গে।' সজোরে হাত নাড়ল গুসেভ, যেন লাগামের ঝাপটা মারছে।

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল গর (দেখামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে গুসেভ)। উত্তেজনায় মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট কাঁপছে। গুসেভের বুক আঁকড়ে বলল:

'কী বলছেন আপনি? কোথায় ডাক দিচ্ছেন আমাদের? আমাদের ওরা শেষ করে দেবে। হাতিয়ার নেই আমাদের। লড়াই-এর অন্য কোনো ফিকির বের করা দরকার...'

গরের হাত সজোরে ছাড়িয়ে দিল গুসেভ।

'সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হল — স্থির সংকল্প। স্থির সংকল্প যার শক্তি তার। এখানে বাতচিত করার জন্য পৃথিবী থেকে আমি উড়ে আসিনি... আমি এসেছি স্থির সংকল্পের তালিম আপনাদের দিতে। আপনারা কি শেওলায় ঢাকা পড়েছেন, বন্ধুগণ। মরতে যাঁরা ডরান না তাঁরা চলুন আমার সঙ্গে! কোথায় আপনাদের অস্ত্রাগার? চলুন হাতিয়ারের তল্লাসে! চলুন সবাই আমার সঙ্গে অস্ত্রাগারে!..'

'আই-ইয়াই!' চীৎকার উঠল মঙ্গলগ্রহবাসীদের মুখে।

শুরু হল ঠেলাঠেলি। হতাশায় গর হাত নাড়ল জনতার দিকে।

বিদ্রোহ শুরু হল এভাবে। নেতা পাওয়া গেছে একজন। মাথা ঘুরছে সক্কলের। অসম্ভবকে মনে হচ্ছে সম্ভব। বিদ্রোহের প্রস্তুতি এতদিন গর করেছে ধীরে সুস্থে, ভেবেচিন্তে, কিন্তু গতকালের কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে ইতস্তত করেছে। আজ সে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। বারোটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা সে দিল, সেগুলো মজুরেরা তাদের এলাকায় শুনল মায়া-মুকুরের মাধ্যমে। অস্ত্রাগারের দিকে ভিড় করে গেল চল্লিশ হাজার লোক। ছোট ছোট দলে তাদের ভাগ করল গুসেভ; দালান আর স্মৃতিস্তম্ভ আর গাছপালার আড়ালে ছুটে চলল তারা। সরকারের সুবিধের জন্য সহরের ঘটনাবলী দেখানো হচ্ছিল যে সব কেন্দ্রীয় মুকুরে তাদের সামনে স্ত্রীলোক ও শিশুদের রাখার বন্দোবস্ত করল, তাদের বলল তুস্কুবের বাপান্ত করতে, অবশ্য খুব বেশী নয়, দোমনাভাবে। প্রাচ্য এই ফিকিরে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ধাপ্পা দেওয়া গেল সরকারকে।

গুসেভের ভয় আকাশ থেকে হামলার। সরকারী পক্ষের মনোযোগ অন্যদিকে কিছুক্ষণ ফেরাবার জন্য সহরের কেন্দ্রে পাঁচ হাজার নিরস্ত্র লোককে পাঠাল। সেখানে গিয়ে তারা গরম কাপড়, রুটি আর খাভ্রার জন্য চেঁচাবে।

'আপনাদের কেউ সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না। মনে রাখবেন সেটা। এবার যান তাহলে।'

এককণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল পাঁচ হাজার লোক, 'আই-ইয়াই!' স্লোগান আঁকা বিরাট সব ছাতা খুলে চলল তারা মরতে, কণ্ঠে তাদের পুরনো করুণ, নিষিদ্ধ গান:

ঝকঝকে ছাদের নিচে
লোহার থামের তলায়
পাথর বাটি থেকে
ওঠে খাভ্‌রার ধুম।
কী আনন্দ, কী আনন্দ আমাদের!
হাতে দাও আমাদের খাভ্‌রার বাটি!
আই-ইয়াই! আমরা আর ফিরব না
খনিতে, পাথর ঘাটায়,
ফিরব না আর
অন্ধকার মুমূর্ষু গলিঘুঁজিতে,
ফিরব না যন্ত্রে, যন্ত্রে ফিরব না।
আমরা চাই বাঁচতে, আই-ইয়াই! চাই বাঁচতে!
হাতে দাও আমাদের খাভ্‌রার বাটি!

বিরাট ছাতা নাড়াতে নাড়াতে, করুণ কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল সংকীর্ণ রাস্তায়।

ছোট একটি সৈন্য দল পাহারা দিচ্ছিল অস্ত্রাগার। সহরের পুরনো অংশে অবস্থিত দালানটা নিচু চৌকোণ। বন্ধ ব্রোঞ্জের ফটকের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে তারা দাঁড়িয়ে, পেছনে পেঁচানো তার, ডিস্ক আর গোলকের তৈরি দুটো অদ্ভুত চেহারার যন্ত্র

(পরিত্যক্ত বাড়িখানায় ঠিক এরকম একটা জিনিস গুসেভ দেখেছিল)। সর্পিল গলিঘুঁজি ধরে বিদ্রোহীরা এসে ঘেরাও করল দালানটাকে। খাড়া দেয়ালগুলো বেশ মজবুত।

এ গাছের তলা থেকে ও গাছে দৌড়িয়ে কোণ থেকে উঁকি মেরে অবস্থাটা ঠাহর করে নিল গুসেভ। বোঝা গেল সামনের ফটক থেকে আক্রমণ চালাতে হবে অস্ত্রাগারে। হুকুম দিল ব্রোঞ্জের একটা সদর দরজা উপড়ে ফেলে দড়ি দিয়ে বাঁধতে। বলল বিদ্রোহীরা যেন ঝাঁকে ঝাঁকে দালানটার ওপরে গিয়ে পড়ে পিলে চমকিয়ে চেঁচায় 'আই-ইয়াই' বলে।

ফটকের সান্ত্রীরা এতক্ষণ অলিগলির ভিড়ের দিকে চেয়েছিল নির্বিকারভাবে, কিন্তু এবার যন্ত্রগুলিকে ঠেলে এগিয়ে আনল। পেঁচের ভেতরে ঝিলিক মারল বেগুনে আলো। চোখ কুঁচকে যন্ত্রগুলো দেখিয়ে মঙ্গলগ্রহবাসীরা সরু তীক্ষ্ন গলায় বলে উঠল, 'সাবধান, আকাশ-সন্তান!'

সময় নষ্ট করা চলে না।

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গুসেভ দড়ি টেনে তুলল ব্রোঞ্জের দরজাটা। বেজায় ভারি, কিন্তু তাতে কী, বহন করা চলে। দেয়ালের আড়ালে থেকে স্কোয়ারের কিনারায় গেল, সেখান থেকে ফটকটা বেশী দূর নয়। ফিসফিসিয়ে 'তৈয়ার' বলে জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, 'এখন সত্যিকার রাগ হলে বেড়ে হত।' দরজা তুলে নিজেকে আড়াল করে অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'চলো এবার অস্ত্রাগারে!.. দফা রফা করি অস্ত্রাগারের!' আর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল সৈন্যদের দিকে।

কয়েকটা বন্দুকের গুলি গুমগুম করে লাগল তার দরজার ঢালে। পা টলে গেল। এবার সত্যি রেগে উঠে পা বাড়িয়ে চলল সৈন্যদের বাপান্ত করতে করতে। চারিদিকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের চীৎকার আর আর্তনাদ, দলে দলে তারা এল রাস্তার কোণ, প্রবেশপথ আর গাছের আড়াল থেকে। হাওয়ায় একটা গোলক ফেটে পড়ল, বিস্ফোরণে কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু বিদ্রোহীদের বন্যা রোখা ভার, তাদের চাপে থেঁতলে গেল সৈন্যরা আর সেই ভয়াবহ যন্ত্রগুলো।

প্রাণখুলে দিব্যি গালতে গালতে গুসেভ ফটকের কাছে গিয়ে তার ব্রোঞ্জের দরজার কোণা দিয়ে মারল তালাটায়। কেঁপে উঠে খুলে গেল ফটক। গুসেভ দৌড়িয়ে ঢুকল চারকোণা চত্বরে। সেখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ডানাওয়ালা জাহাজ।

অস্ত্রাগার দখল। চল্লিশ হাজার মঙ্গলগ্রহবাসীর অস্ত্র মিলেছে। সর্বোচ্চ পরিষদের দালানের সঙ্গে মায়া-মুকুরের টেলিফোনে যোগাযোগ করে গুসেভ দাবী করল তুস্কুব আত্মসমর্পণ করুক।

জবাবে সরকার অস্ত্রাগার আক্রমণ করতে পাঠাল হাওয়াই জাহাজ... নিজের দলের জাহাজ নিয়ে হামলায় উড়ল গুসেভ। সরকারী হাওয়াই জাহাজ রণেভঙ্গ দেওয়াতে তাড়া করে ঘিরে ফেলে পুরোনো সয়াৎসেরার ধ্বংসস্তূপে পেড়ে ফেলল তাদের।

জাহাজগুলো পড়ল মাগাৎসিৎলের বিরাট মূর্তির পায়ের কাছে, চোখ যার নিমীলিত, মুখে যার মৃদুহাসি। তার শল্কময় শিরস্ত্রাণে ঝিকঝিকে আলো সূর্যাস্তের।

আকাশে এখন বিদ্রোহীদের প্রতিপত্তি। পরিষদ দালানের চারিদিকে পুলিস সৈন্য জারি করল সরকার। দালানের ছাদে বসানো হল আগ্নেয়াস্ত্র। বিদ্রোহীদের জাহাজের কয়েকটি নষ্ট হল তাদের আক্রমণে। রাত্রে পরিষদ দালানের স্কোয়ার দখল করে গুসেভ তারার আকারে সেখান থেকে ছড়িয়ে-পড়া রাস্তাগুলোয় ব্যারিকেড বসাল। 'ওহে লালমুখোরা, বিপ্লব কী করে চালাতে হয় তোদের শিখিয়ে দি,' বিড়বিড় করে বলে গুসেভ তাদের দেখিয়ে দিল কী করে ফুটপাথের পাথর সরাতে হয়, ওপড়াতে হয় গাছ, তুলে ফেলতে হয় দরজা আর সার্ট ভরে নিতে হয় বালিতে।

অস্ত্রাগারের আগ্নেয়াস্ত্রদুটির মুখ পরিষদ দালানের দিকে ঘুরিয়ে তারা সরকারী সৈন্যদের ওপর ছুঁড়তে লাগল আগুনের গোলা। বৈদ্যুতিক চুম্বক-ক্ষেত্রের সাহায্যে সরকার রাস্তায় ছড়িয়ে দিল বৈদ্যুতিক প্রবাহ।

তখন সে দিনের মতো শেষ বক্তৃতা দিল গুসেভ, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু জ্বালাময়ী, তারপর ব্যারিকেডের উপর উঠে ছুঁড়ল পর পর তিনটে হাত-বোমা। বিস্ফোরণের শব্দ ভয়ঙ্কর। তিনটি আগুনের ঝিলিক, শূন্যে ছিটকে উঠল ইট পাথর, সৈন্য, ভাঙা যন্ত্রের টুকরো, স্কোয়ার ভরে গেল ধুলোয় আর ঝাঁঝালো

ধোঁয়ায়। হৈ হৈ করে মঙ্গলগ্রহবাসীরা এগিয়ে গেল সামনে। (তুস্কুবের বাড়িতে বসে এ দৃশ্যটাই মায়া-মুকুরে দেখেছিল লস।)

চুম্বক-ক্ষেত্র সরিয়ে নিল সরকার। এবার দু'দিক থেকে জ্বলন্ত গোলক স্কোয়ারের উপর ছুঁয়ে নীল আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ফেটে পড়তে লাগল। ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপতে লাগল অন্ধকার, পিরামিডের মতো বাড়িগুলো।

লড়াই বেশীক্ষণ চলেনি। লাসভর্তি স্কোয়ার পেরিয়ে বাছাই করা একটা দল নিয়ে গুসেভ ছুটে ঢুকল পরিষদ দালানে। কেউ নেই সেখানে। তুস্কুব আর সব ইঞ্জিনিয়ার ভেগেছে।

ঘটনার দিকপরিবর্তন

গরের পরামর্শমতো সহরের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাত্রি। চৌকিতে দাঁড়িয়ে জমে যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহবাসীরা। আগুন জ্বালাবার আদেশ দিল গুসেভ। অভূতপূর্ব কাণ্ড সেটা। কতো হাজার বছর সহরে আগুন জ্বালানো হয়নি। কম্পমান অগ্নিশিখার কথা এতদিন শোনা গেছে শুধু পুরোনো গানে।

ভাঙা আসবাবপত্র দিয়ে পরিষদ দালানের সামনে প্রথম আগুন জ্বালাল গুসেভ। আগুন ঘিরে অস্ফুট কণ্ঠে সুর করে

বলে উঠল মঙ্গলগ্রহবাসীরা, 'উল্লা, উল্লা!' রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠেছে আগুন। আলোর লাল আভা কম্পিত ছায়া ফেলছে বাড়িগুলোর হেলানো দেয়ালে, ঝিকঝিক করে উঠছে জানলার শার্সিতে।

নীলাভ সব মুখ দেখা গেল জানলায় — উৎকণ্ঠায় আর যন্ত্রণায় তারা চেয়ে দেখল এই অদ্ভুত আগুন, বিদ্রোহীদের বিকট ছন্নছাড়া মূর্তি। সে রাত্রে অনেক বাড়ি খালি হয়ে গেল।

সহর নিঝুম। শুধু আগুনের চড়াৎ চড়াৎ শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনানি — মনে হল কতো হাজার বছরের চক্র ফিরেছে নিজের পথে, আবার শুরু করেছে ক্লান্তিকর যাত্রা। এমন কি রাস্তা আর আগুনের উপর ঝাঁকড়া তারাগুলোর চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে। সেই বিস্মৃত, এখন আবার জীবন্ত নক্ষত্র ছকের দিকে আগুনের পাশে বসা লোকেরা মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে। উড়ন্ত আসনে বসে নিজের সৈন্যদের অবস্থান দেখে নিল গুসেভ। তারা-জ্বলা শূন্য থেকে নামল স্কোয়ারে, সেটা পার হয়ে যেতে বিরাট তার ছায়া পড়ল সেখানে। ওকে দেখাচ্ছে সত্যিকার যেন আকাশ-সন্তান, পাথরের বেদী থেকে যেন নেমে এল একটি বিগ্রহ। 'মাগাৎসিৎল, মাগাৎসিৎল,' কুসংস্কারের আতঙ্কে ফিসফিসিয়ে উঠল মঙ্গলগ্রহবাসীরা। অনেকে যারা এই প্রথম তাকে দেখল হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেল তাকে স্পর্শ করার জন্য। অনেকে কেঁদে উঠল শিশুর মতো গলায়, 'এবার

আমরা মরব না… সুখী হব আমরা… আকাশ-সন্তান আমাদের প্রাণ দেবে…'

সবায়ের গায়ে ধূলি-ধূসর এক চেহারার পোষাক; শীর্ণ দেহ, মৃতপ্রায় ছন্নছাড়া মুখ, খাড়া নাক, বিষণ্ণ চোখ, কতো শতাব্দী ধরে যে চোখ দেখেছে শুধু চাকার ঘূর্ণন আর অন্ধকার খনি; অস্থিচর্মসার হাত, যে হাত কখনো জানেনি আনন্দের বা সাহসের গতি; হাত, মুখ আর আগুনের ফুলকিভরা সব চোখ প্রসারিত আকাশ-সন্তানের দিকে।

'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না তোমরা। হাসি আনো মুখে,' তাদের বলল গুসেভ। 'এমন কোনো কানুন নেই যে তোমরা মুখ বুজে শতাব্দী ধরে শুধু যন্ত্রণা পেয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। আমরা জিতব, সুখে থাকব আমরা।'

•

বেশ রাত্রে গুসেভ ফিরে গেল পরিষদ দালানে। বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাণ্ডা লাগছে। খিলান-দেওয়া হলে, সোনালি নিচু থামের নিচে মেঝের ওপর শুয়ে গোটা বিশেক সশস্ত্র মঙ্গলগ্রহবাসী। ঝকঝকে মেঝেতে ছড়ানো চিবোনো খাভ্রার টুকরো। হলের মাঝখানে কার্তুজের টিনের গাদার ওপর বসে গর টর্চের আলোয় লিখছে। টেবিলে ছড়ানো খোলা টিন, ফ্লাস্ক আর রুটির গুঁড়ো।

টেবিলের কিনারায় বসে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করল

গুসেভ। তারপর প্যান্টে হাত মুছে ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক খেয়ে ঘোঁৎ করে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল:

'দুষমনরা গেল কোথায়? সেটা আমার জানা দরকার...'

রাঙা চোখ তুলে গর তাকাল: গুসেভের মাথায় রক্তের ছোপ লাগা নেকড়া বাঁধা, চওড়া চোয়াল শক্ত করে চিবোচ্ছে, গোঁফ খাড়া হয়ে উঠেছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত।

'বুঝে উঠছি না,' গুসেভ বলে চলল, 'কোথায় কোন চুলোয় সরকারী সৈন্যরা সরে পড়েছে। স্কোয়ারে পড়ে আছে শ তিনেক লোক, কিন্তু ওদের মোট সংখ্যা তো পোনেরো হাজারের কম নয়। একেবারে উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু হল কী করে — ওরা তো আর সূচ নয় যে হারিয়ে যাবে। লুকোলে টের পেতাম। গুরুতর ব্যাপার। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের পেছনে হাজির হতে পারে শত্রুরা।'

'তুস্কুব, সরকারের সবাই, বাকি সৈন্যরা আর বাসিন্দেদের একটা অংশ চলে গেছে সহরের নিচে রাণী মাগ্‌রের গোলকধাঁধায়,' বলল গর।

বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠল গুসেভ।

'এতক্ষণ কথাটা বলেননি কেন?'

'তুস্কুবের পিছু ধাওয়া করে কোনো ফয়দা নেই। বসে পড়ুন, খান, আকাশ-সন্তান।' ভুরু কুঁচকে পোষাকের ভেতর থেকে শুকনো খাভ্‌রার একটা মরিচ-লাল মোড়ক বের করে কিছুটা মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগল। চোখ হয়ে

এল ঝাপসা অন্ধকার, মুখের ভাঁজ গেল মিলিয়ে। 'কয়েক হাজার বছর আগে বড়ো বড়ো বাড়ি আমরা বানাতাম না, কেননা সেগুলো গরম করার কোনো উপায় ছিল না, বিজলির কথা তখনো আমাদের কাছে অজানা। শীতকালে লোকেরা সবাই চলে যেত মাটির নিচে অনেক গভীরে। সেখানকার জল দিয়ে খোঁড়া গুহায় আমরা যে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল-ঘর বানাতাম, সেগুলো আর থাম সুরঙ্গ আর চলার রাস্তা সবকিছু গরম হত আমাদের গ্রহের ভেতরকার তাপে। আগ্নেয় গহ্বরের মুখে উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে সেটা বাস্প তৈরির কাজে লাগত। এখনো কয়েকটা দ্বীপে প্রাচীনকালের সে সব বাস্প-ইঞ্জিন কাজ করে। মাটির নিচের সহরগুলোর যোগাযোগকারী সুরঙ্গগুলো ছড়িয়ে আছে প্রায় সমস্ত গ্রহে। সে গোলকধাঁধায় তুস্কুবের খোঁজে ফেরার কোনো মানে হয় না। একমাত্র সেই জানে গোলকধাঁধার ছক আর গোপন পথ। এই গোলকধাঁধা হল রাণী মাগ্‌রের, দুটি পৃথিবীর অধীশ্বরী তিনি ছিলেন সমস্ত মঙ্গলগ্রহের কর্ত্রী। সয়াৎসেরার নিচেকার সুরঙ্গের জটিল জাল গিয়েছে পাঁচ শ বসতি সহরে আর প্রায় হাজারের বেশী মরা সহরে। সর্বত্র অস্ত্রের ঘাঁটি আর হাওয়াই জাহাজের আড্ডা। আমাদের দল তো ছড়ানো, বেশী অস্ত্রশস্ত্র নেই আমাদের। তুস্কুবের আছে বাহিনী, তার দলে আছে জমিদার, খাভ্‌রা বাগানের মালিক আর তারা যারা তিরিশ বছর আগে ভয়ংকর যুদ্ধের পর সহরের বাড়িঘরদোরের মালিকানা পায়। তুস্কুব ধূর্ত, বেইমান লোক।

ও ইচ্ছে করে এ সব কাণ্ড উসকিয়েছে যাতে করে বিরোধিতার রেশটুকু বরাবরের জন্য ঘুচিয়ে দিতে পারে... স্বর্ণযুগ!.. স্বর্ণযুগ বটে!..'

অসাড় মাথাটা কয়েকবার নাড়াল গর। মুখে দেখা দিল বেগনে ছোপ। খাভ্রার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

'তুস্কুব স্বপ্ন দেখে স্বর্ণযুগের, ও চায় মঙ্গলগ্রহের শেষ যুগ চালু করতে — স্বর্ণযুগ সেটা। তাতে প্রবেশের অধিকার থাকবে শুধু বাছাই করা লোকের, অসীম সুখের যোগ্য যারা শুধু তাদের। সাম্য অলীক কথা, সাম্য বলে কোনো চিজ নেই। সকলের সুখ — সেটা তো পাগলের প্রলাপ, খাভ্রাখোরদের বচন। তুস্কুব বলে, "সাম্য ও লোকনির্বিশেষে ন্যায়ের বাসনা সভ্যতার সর্বোচ্চ অবদানের সর্বনাশ ঘটায়।" গরের মুখে লাল ফেনার গেঁজা দেখা দিল। 'দরকার হল পিছু হটা, ফিরে যাওয়া অসাম্যে, অবিচারে! মাছির মতন আমাদের ছেঁকে ধরুক মরা শতাব্দীগুলো। গোলামদের বাঁধো শেকলে, বেঁধে দাও ওদের যন্ত্রপাতিতে, লেদে, ঠেলে ফেলে দাও খনিতে... ওরা থাকুক দুঃখের পাঁকে। আর যারা ধন্য তারা থাকুক সুখের স্বর্গলোকে... এই হল স্বর্ণযুগ! অন্ধকার শুধু আর দাঁত কিড়মিড় করা। গোল্লায় যাক আমার মা-বাপ! কেন মরতে আলোতে আসা! নরকবাস হোক আমার!'

সিগারেটটা বুনোর মতো চিবোতে চিবোতে গরের দিকে তাকিয়ে রইল গুসেভ।

'না বলে পারছি না সত্যি, আপনারা একেবারে গেঁজে গেছেন!..'

কার্তুজের টিনের ওপর গুটিসুটি মেরে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গর। বসে আছে অনেক কালের বুড়োর মতন।

'ঠিক বলেছেন, আকাশ-সন্তান। আমরা, প্রাচীন তুমার লোকেরা, হেঁয়ালির ফয়সলা করতে পারিনি। আজকে আপনাকে লড়তে দেখলাম। আপনি তাজা আগুনের মতো। আপনি স্বপ্ন দেখেন, কী বলিষ্ঠ বেপরোয়া আপনি। আপনারা, পৃথিবীর সন্তানেরা, এ হেঁয়ালির ফয়সলা করতে পারবেন একদিন। আমরা পারব না, বুড়িয়ে গেছি কিনা। আমরা হলাম ছাই-এর গাদা। সময় সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি।'

বেল্ট আঁটল গুসেভ।

'বেশ, বেশ। ছাই-ই বটে! কাল কী করা হবে এখন শুনি।'

'সকালে টেলিফোনে তুস্কুবকে খুঁজে বের করে আপোষ আলোচনা শুরু করা দরকার, দুপক্ষের যাতে সুবিধে হয় ...'

'আপনি মশাই ঝাড়া এক ঘণ্টা বাজে বকেছেন,' কথার মাঝখানে বলে উঠল গুসেভ। 'কালকে কী করতে হবে শুনুন: আপনি মঙ্গলগ্রহে ঘোষণা করবেন, ক্ষমতা চলে এসেছে শ্রমিকদের হাতে। বিনাসর্তে বশ্যতা দাবী করবেন। কয়েকটি ছোকরা বেছে নিয়ে হাওয়াই জাহাজে আমি সটান যাব মেরুদেশে, বিদ্যুৎ-চুম্বক কেন্দ্রগুলি দখল করে নেব। তারপর

বিনা বিলম্বে পৃথিবীতে তারবার্তা পাঠাব, তারবার্তা পাঠাব মস্কোতে যে আমাদের যত শীগগির পারে লোকবল যেন পাঠায়। যন্ত্র তৈরি করতে ওদের মাস ছয়েক লাগবে, আর এখানে আসতে...'

পা টলে গিয়ে ধপাস করে টেবিলে বসে পড়ল গুসেভ। কেঁপে উঠল গোটা বাড়িটা। অন্ধকার খিলানগুলো থেকে খসে পড়ছে খোদাই-করা কারুকার্য। মেঝেতে যারা ঘুমোচ্ছিল তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। আর একটা ধাক্কায়, আগের চেয়ে জোরালো ধাক্কায়, বাড়িটা কাঁপতে লাগল। ভাঙা কাঁচের টুকরো পড়ছে ঝনঝনিয়ে। হাট হয়ে খুলে গেল দরজাগুলো। নিচু একটা গুরু গুরু গভীর আওয়াজে ভরে গেল হল-ঘর। স্কোয়ারে মানুষের চীৎকার, গুলির শব্দ।

দৌড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে জটলা পাকিয়ে দাঁড়াল মঙ্গলগ্রহবাসীরা, তারপর হটে এল হঠাৎ। ভেতরে ঢুকল আকাশ-সন্তান — লস। তাকে চেনা ভার: বড়ো বড়ো চোখ কালো হয়ে বসে গেছে, সে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অদ্ভুত দীপ্তি। তার কাছ থেকে হটে এসে উবু হয়ে বসে পড়ল মঙ্গলগ্রহবাসীরা। লসের সাদা চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

'সহর ঘেরাও,' ভারি দৃঢ় গলায় জানাল লস। 'হাওয়াই জাহাজের আগুনে ছেয়ে গেছে আকাশ। তুস্কুব শ্রমিকদের ঘরদোর উড়িয়ে দিচ্ছে।'

পাল্টা আক্রমণ

লস ও গর দৌড়িয়ে থামের নিচে বাড়ির সদর সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখন বাতাস দীর্ণ হল দ্বিতীয় বিস্ফোরণে। সহরের উত্তর দিকে পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ল নীল অগ্নিশিখা। ধোঁয়া আর ছাইয়ের মেঘ স্পষ্ট দেখা গেল। গুরু গুরু আওয়াজের পর ঝড়ের ঝাপটা। টকটকে লাল আভায় উদ্ভাসিত অর্ধ-আকাশ।

সৈন্য বোঝাই তারকাকারের স্কোয়ারে কোনো সাড়া নেই এখন। মঙ্গলগ্রহবাসীরা নিঃশব্দে চেয়ে আছে রক্তাভার দিকে। আগুনে পুড়ে যাচ্ছে তাদের ঘরদোর, তাদের আপনজন। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে উবে যাচ্ছে তাদের শেষ আশা।

লস ও গরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর গুসেভ হাওয়াই জাহাজগুলোকে যুদ্ধের জন্য তৈয়ার করার ব্যবস্থা করতে লাগল। সবকটা জাহাজ অস্ত্রাগারে। শুধু পাঁচটা প্রকাণ্ড গঙ্গাফড়িঙের মতো জাহাজ পড়ে আছে স্কোয়ারে। সেগুলোকে গুসেভ পাঠাল গতিক দেখে আসার জন্য। আকাশে ওড়াতে আগুনের আভায় ঝিকঝিক করে উঠল ডানাগুলো।

অস্ত্রাগার থেকে খবর দিল নির্দেশ ওরা পেয়েছে, হাওয়াই জাহাজে উঠতে শুরু করেছে সৈন্যরা। কিছুক্ষণ কাটল অনিশ্চয়তার মধ্যে। ধোঁয়া আর আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। আতঙ্ক আর থমথমে স্তব্ধতা সহরে। প্রতি মিনিট গুসেভ

মায়া-মুকুরের টেলিফোনে মঙ্গলগ্রহবাসীদের বলছে তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠতে। নিজে স্কোয়ারে ছুটোছুটি করছে বিরাট ছায়া ফেলে, হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে, এলোমেলো বিশৃংখল সৈন্যদের দাঁড় করাচ্ছে লাইন বেঁধে। সিঁড়িতে ফিরে এসে গম্ভীর মুখে চোমরাচ্ছে গোঁপ।

'অস্ত্রাগারের ওদের বলুন তো,' (পরের কথাটির মানে ধরতে পারল না গর) 'জলদি, জলদি ...'

টেলিফোনে গেল গর। টেলিফোনে শেষমেষ খবর এল যে সৈন্যরা সবাই জাহাজে চেপেছে, জাহাজগুলো ছাড়ছে। সত্যিসত্যি কয়েক মুহূর্ত পরে ঘন ধোঁয়ার মধ্যে সহরের উপর দেখা গেল গঙ্গাফড়িঙের মতো জাহাজগুলো। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে গুসেভ চেয়ে রইল বলাকার মতো লাইনের দিকে। ঠিক সে সময় ধ্বনিত হল তৃতীয় এবং সবচেয়ে জোরালো বিস্ফোরণ।

জাহাজের পথ জুড়ল নীলাভ আগুনের লেলিহান শিখা। জাহাজগুলো ঝট করে উঠে ঘুরপাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, পেছনে রেখে গেল রাশি রাশি ছাই আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

থামগুলোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল গর। মাথা ঝুলে পড়েছে। মুখ কাঁপছে, ঠোঁট ফাঁক। বিস্ফোরণের আওয়াজ থেমে গেলে বলল:

'অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়েছে। হাওয়াই জাহাজের বহর আর নেই।'

শুকনো গলায় একটা আওয়াজ করে গুসেভ গোঁপ চিবোতে লাগল। থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লস তাকিয়ে আছে অগ্নিকাণ্ডের দিকে। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁচের মতো চোখে উঁকি মেরে বলল গর:

'যারা আর্জ টিকে যাবে তাদের দুর্দশার সীমা থাকবে না।'

চুপ করে রইল লস। একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়িয়ে গুসেভ গেল স্কোয়ারে। কী একটা আদেশ দিল, আর সারে সারে মঙ্গলগ্রহবাসী স্কোয়ার হয়ে চলল ব্যারিকেডের দিকে।

পরমুহূর্তে গুসেভের উড়ন্ত ডানাওয়ালা ছায়া পড়ল স্কোয়ারে, আসনে বসে সে হাঁকছে:

'জলদি, জলদি! জোরে পা চালা, শয়তানের বেটারা!'

শূন্য হয়ে গেল স্কোয়ার। সহরের অনেকটা অংশে ছড়িয়ে পড়া বিরাট আগুনের আভায় এবার দেখা গেল বিপরীত দিক থেকে উড়ে আসা হাওয়াই জাহাজের দল। দিগন্ত রেখা থেকে উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। তুস্কুবের বহর।

গর বলে উঠল:

'পালান, আকাশ-সন্তান, এখনো নিজেদের বাঁচাতে পারেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল শুধু লস। কাছে এসে পড়ে জাহাজগুলো নামছে। অন্ধকার স্কোয়ার থেকে ছুটল আগুনের গোলা, একটা, দুটো, তিনটে। আগ্নেয়াস্ত্র চালাচ্ছে বিদ্রোহীরা। উড়ো-জাহাজগুলো স্কোয়ারের উপরে একটা চক্কর দিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে ভেসে চলল বিভিন্ন দিকে রাস্তা আর ছাদের

উপর। অবিরাম গুলিবর্ষণে জাহাজের পাশগুলো আলো হয়ে উঠেছে। একটা জাহাজ ডিগবাজি খেয়ে পড়াতে ডানা দুটো আটকে গেল দুটো বাড়ির ছাদের মাঝখানে। অন্যগুলো নামল স্কোয়ারের কিনারায়, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এল রুপোলি জ্যাকেট-পরা সৈন্যদল। নেমেই তারা ছুটল রাস্তায়। জানলা আর কোণ থেকে গুলি ছুটল তাদের দিকে। পাথর বৃষ্টি হচ্ছে। আরো জাহাজ আসছে, আরো জাহাজ, স্কোয়ারে অবিরাম জ্বলন্ত ছায়া ফেলে।

লস দেখল কিছু দূরে একটি বাড়ির ধাপে ধাপে বারান্দায় উঠছে চওড়া কাঁধ গুসেভ। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছটা জাহাজ পাক খেয়ে ঘুরল তার দিকে। মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলে গুসেভ সেটা ছুঁড়ে মারল সবচেয়ে কাছের জাহাজটায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে ডানার দঙ্গলে তাকে আর দেখা গেল না।

তখন স্কোয়ার হয়ে সেদিকে ছুটল লস, প্রায় উড়ে চলল, যেন স্বপ্নে! মাথার উপরে গর্জিয়ে পাক খাচ্ছে জাহাজগুলো, চলেছে অগ্নিবৃষ্টি। দাঁতে দাঁত চেপে চলল লস, খুঁটিনাটি সমস্ত তীক্ষ্ণ নজরে রেখে।

কয়েক লাফে স্কোয়ার পার হয়ে লস আবার গুসেভকে দেখল কোণের বাড়ির বারান্দায়। চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে মঙ্গলগ্রহবাসীরা, তাদের সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ভালুকের মতো তার গা ফুলে উঠছে ওদের হুটোপাটি খাওয়া হাত পা'র নিচে, ঝাঁকিয়ে ফেলে দিচ্ছে তাদের, মারছে ঘুষি। গলা থেকে

একজনকে ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে, বাকিদের টেনে নিয়ে চলল বারান্দায়। তারপর পড়ে গেল।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল লস। বাড়িগুলোর আলসেতে হাত রেখে উঠল বারান্দায়। তালগোল পাকানো মানুষের ভিড়ে আবার চোখে পড়ল গুসেভের বিস্ফারিত চোখ আর রক্তাক্ত মুখ। কয়েকটি সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল লসের উপর। বিতৃষ্ণায় তাদের ছাড়িয়ে সে ছুটে গেল দেহপিণ্ডের দঙ্গলে, গুসেভের উপর থেকে সৈন্যদের একটার পর একটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। লোকগুলো রেলিং ডিঙিয়ে টপটপ করে পড়ছে কুটোটির মতন। বারান্দা ফাঁকা। ওঠবার চেষ্টা করল গুসেভ, কিন্তু মাথা ঝুলে পড়ল। তাকে তুলে নিয়ে খোলা দরজা হয়ে এক লাফে একটা ছোট ঘরে ঢুকে গালিচার উপর শুইয়ে দিল লস। বাইরের আগুনের আভা এসে পড়েছে সেখানে।

গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গুসেভের। দরজার দিকে চলে গেল লস। বারান্দা বরাবর উড়ে যাচ্ছে জাহাজ, খাড়া-নাক মুখ সব তাকিয়ে দেখছে সেগুলো থেকে। আবার হামলা চালাবে নিশ্চয়।

'মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ,' গুসেভ ডাকল। মাথা চেপে উঠে বসেছে, রক্ত-মাখা থুথু ফেলল। 'আমাদের সবাই মারা পড়েছে... মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, ভাবতে পারেন? ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে আমাদের মেরে ফেলছে মাছির মতো... যারা মরেনি তারা লুকিয়েছে। আর আমি শুধু একলা পড়ে রয়েছি... কী

সর্বনেশে ব্যাপার!' গ্রুসেভ উঠে টলতে টলতে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির সামনে, কোনো সুখ্যাত মঙ্গলগ্রহবাসীর মূর্তি সেটা। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!' মূর্তিটা তুলে ছুটল দরজার দিকে।

'কী করছেন, আলেক্সেই ইভানভিচ!'

'অসহ্য। আমাকে যেতে দিন।'

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। উড়ন্ত জাহাজের ডানার নিচ থেকে ঝলকে উঠল অগ্নিশিখা। তারপর ধপ করে পড়ার আওয়াজ।

'হায়!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রুসেভ।

তাকে ঘরে এনে দরজা টেনে দিল লস।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, কেন বুঝতে পারছেন না যে আমরা হেরে গেছি, সব খতম... আএলিতাকে বাঁচানো দরকার।'

'তাই বটে। আপনার যতো দুশ্চিন্তা শুধু ওই মেয়েটাকে নিয়ে...'

চট করে বসে গ্রুসেভ মুখ চেপে নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করল, পা ঠুকল মাটিতে। অন্ধ রাগে ফেটে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল:

'বেশ, শালারা আমার ছালচামড়া তুলে নিক! দুনিয়ায় ন্যায় বলে কিস্সু নেই। এ গ্রহটায় ঠিক নেই কিস্সু, চুলোয় যাক এটা! ওরা সব পায়ে পড়ে বলল, "বাঁচাও, বাঁচাও আমাদের, আমরা বাঁচতে চাই!.." বাঁচা বটে!... কিন্তু আমি কী করব?..

নিজের রক্তপাত তো করেছি। কিন্তু হারিয়ে দিল। ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, কী অপদার্থ আমি, কিন্তু এ সহ্য করব না... দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব বেটাদের...'

আবার ঘোঁৎ করে উঠে দরজার দিকে গেল সে। তার কাঁধ চেপে ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা চোখে চোখ রাখল লস।

'কী হচ্ছে, এ সব পাগলামি আর প্রলাপ। চলুন। হয়ত আমরা ফিরতে পারব। ফিরতে পারব ঘরে, আমাদের পৃথিবীতে।'

রক্ত আর ময়লা মুখে মাখামাখি করে গুসেভ বলল:

'চলুন।'

ঘর ছেড়ে দুজনে এসে পড়ল চওড়া সুরঙ্গের উপর একটা গোল চত্বরে। ঘোরানো সিঁড়ি চলে গেছে তলদেশে। কাঁচের ছাদ দিয়ে বাইরের আগুনের অস্পষ্ট আভা পড়েছে সুরঙ্গের গহ্বরে, এত গভীর সে গহ্বর যে মাথা ঘোরে।

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নামছে লস ও গুসেভ। নিচে কোনো সাড়াশব্দ নেই। উপরে গুলির খরখর আওয়াজ আরো বেড়ে চলেছে, জাহাজের তলা বাড়ির ছাদে লাগার ঘষঘষ শব্দ। মনে হল আকাশ-সন্তানদের এই সর্বশেষ আস্তানার উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে।

ক্ষিপ্র পায়ে নামছে লস ও গুসেভ, সিঁড়ির পেঁচের আর শেষ নেই। ক্ষীণ হয়ে এল আলো। হঠাৎ চোখে পড়ল নিচে একটি লোকের ছোটখাট চেহারা। ওদের দিকে আসছে প্রায়

হামাগুড়ি দিয়ে। থেমে গেল লোকটা, ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বেরোল:

'যে কোনো মুহূর্তে ওরা এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি করুন। নিচে গোলকধাঁধায় ঢোকার দরজা।'

লোকটি গর। মাথায় চোট লেগেছে। ঠোঁট চেটে বলল:

'বড়ো সুরঙ্গগুলো হয়ে যাবেন। দেয়ালের চিহ্নগুলো লক্ষ্য রাখবেন। বিদায়। যদি পৃথিবীতে ফিরে যান, আমাদের কথা জানিয়ে দেবেন। হয়ত পৃথিবীতে সুখী হবেন আপনারা। কিন্তু আমাদের কপালে শুধু তুষার মরুভূমি, মৃত্যু আর যন্ত্রণা... উঃ, আমরা সময়সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি... উচিত ছিল জীবনকে গভীরভাবে, ব্যগ্রভাবে ভালোবাসা...'

উপর থেকে ভেসে এল হৈচৈ-এর শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামল গুসেভ। লস ভাবল গরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চিপে রেলিংটা চেপে ধরল।

'আপনারা যান। আমি মরতে চাই।'

গুসেভের পিছু পিছু দৌড়ল লস। এসে পড়ল শেষ গোল চত্বরে। সেখান থেকে খাড়া ধাপ নেমেছে গহ্বরের তলায়। সেখানে দুজনের চোখে পড়ল আংটা বসানো বড়ো একটা টালি পাথর। কষ্টে সেটা তোলাতে অন্ধকারের ফাঁক থেকে ভেসে এল শুকনো হাওয়ার স্রোত।

সে ফাঁকে প্রথমে নামল গুসেভ। মাথার উপরে পাথরের

ঢাকনাটা আবার বসিয়ে দিতে গিয়ে লস দেখল গোল চত্বরের লালচে অন্ধকারে সৈন্যদের অস্পষ্ট মূর্তি।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে তারা। তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গর, পদাঘাতে পড়ে গেল।

রাণী মাগ্‌রের গোলকধাঁধা

স্যাঁৎসেঁতে গুমোট অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছে লস ও গুসেভ।

'এখানটায় একটা বাঁক, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ...'

'খুব সরু?'

'না, চওড়া। হাতের নাগালে কিছু নেই।'

'আবার থাম দেখছি। দাঁড়ান! এ আবার কোথায় এলাম...'

...গোলকধাঁধাতে নামার পর অন্তত ঘণ্টা তিনেক কেটেছে। দেশলাই আর নেই। লড়াই-এ গুসেভের টর্চ পড়ে গিয়েছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ হাতড়ে আবার চলা।

একটার পর একটা সুরঙ্গ, কখনো মিলছে, আবার সরে যাচ্ছে দূর অন্ধকারে। কখনো কখনো ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার পরিষ্কার একঘেয়ে শব্দ। দুজনের বিস্ফারিত চোখে ধরা পড়ছে অস্পষ্ট ধূসর নানা ছায়া; ঝাপসা সে ছোপগুলো শুধু দৃষ্টি বিভ্রম, অন্ধকারে যেমনটা হয়।

'দাঁড়ান!'

'কেন?'

'তল পাচ্ছি না।'

দুজনে কান পেতে শুনতে লাগল। মুখে শুকনো ফুরফুরে হাওয়া লাগছে। অনেক, অনেক নিচুতে দূরে কোথায় যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ। অজানা একটা আতঙ্কে ওদের বোধ হল যে সামনে পা রাখার মতো কিছু নেই। পায়ের কাছে হাতড়ে একটা পাথর তুলে গুসেভ সেটা ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে। কয়েক মুহূর্ত পরে পাথর পড়ার ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল ওদের।

'একটা কুয়ো।'

'কার নিঃশ্বাসের শব্দ?'

'কী করে বলি?'

ঘুরে আসাতে একটা দেয়ালের গায়ে এসে পড়ল দুজন। দুধারে হাতে ঠেকছে ঝুরঝুরে ফাটল আর খিলান। অদৃশ্য কুয়োটার কিনারা দেয়ালের খুব কাছে, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, আবার ডাইনে। ওরা বুঝতে পারল যে খালি ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসছে, যে সুরঙ্গ দিয়ে সংকীর্ণ কার্ণিসে এসেছে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

খড়খড়ে দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দুজনে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল কুয়োর গভীরে সেই বিচিত্র নিঃশ্বাসের শব্দ।

'এই কি শেষ, আলেক্সেই ইভানভিচ?'

‘তাই তো মনে হচ্ছে, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। সব শেষ।’

একটু চুপ করে থেকে লস জিজ্ঞেস করল নিচু, অদ্ভুত গলায়:

‘দেখুন, কিছু দেখতে পারছেন এখন?’

‘না তো।’

‘বাঁ দিকে, দূরে।’

‘না, কিছু না।’

মনে মনে ফিসফিসিয়ে কী একটা বলে এ পায়ের ভর অন্য পায়ে রাখল লস।

‘জীবনকে ভালোবাসা চাই ব্যগ্র ব্যাকুলভাবে... আসল কথা হল এই...’

‘কার কথা বলছেন?’

‘ওদের কথা। আমাদেরো।’

পায়ের ভর বদলে গুসেভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

‘ওই শুনুন নিঃশ্বাসের আওয়াজ!’

‘কার? মৃত্যুর?’

‘শয়তান জানে কার!’ গুসেভ বলে চলল, যেন আপন মনে। ‘অনেক দিন কথাটা ভেবেছি, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। বন্দুক হাতে মাঠে শুয়ে আছি উপুড় হয়ে। বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার। যে কথাই ভাবুন না কেন, ঘুরে ফিরে সবকিছু আসে মৃত্যুর চিন্তায়। মনে মনে কল্পনা করি, রাস্তার ধারে পড়ে আছি মরা ঘোড়ার মতো, শরীর জমাট, দাঁত এসেছে বেরিয়ে। জানি না

মৃত্যুর পর কী হয়, আমার জানা নেই সেটা। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার জানা দরকার—আমি মানুষ না ঘোড়ার মাংসের একটা পচা টুকরো? না দুই-ই সমান, কোনো তফাৎ নেই? চোখ বুজে যখন মরব, দাঁত-কপাটি লাগবে, প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাবে, তখন কি আমার চোখে-দেখা গোটা বিশ্বটা ওলটপালট হয়ে যাবে, না যাবে না? কী ভয়ঙ্কর বলুন তো — আমি ছিলাম এত জীবন্ত, তিন বছর বয়স থেকে সব কথা মনে আছে — সেই আমি দাঁত-কপাটি মরে পড়ে আছি আর দুনিয়ার সবকিছু চলেছে আগেকার মতো! কথাটা আমার মাথায় ঢোকে না। ১৯১৪ সাল থেকে মানুষ মারা আমাদের কাছে ডালভাতের মতো। মানুষ কী চিজ? দাও বসিয়ে একটা গুলি, ব্যস সব খতম! এই তো হল মানুষ। ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। একবার আহত হয়েছিলাম, রাত্তিরে গাড়িতে শুয়ে তারার দিকে তাকিয়েছিলাম। মনটা মুষড়ে ছিল। ভাবলাম, মানুষ হই, উকুণ হই, কী এসে যায়, তফাৎটা কী? উকুণের ক্ষিধে তেষ্টা আছে, আমারো তাই। উকুণের মরণ কঠিন, আমারো তাই। শেষটা তো এক। ঠিক সে সময় দেখলাম তারাগুলো দবদব করে উঠল যবের মতো। তখন হেমন্ত, অগস্ট মাস। আমার আমূল কেঁপে উঠল থরথর করে। ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, মনে হল সবকটা তারা আমার ভেতরে আছে। না, আমি উকুণ নই। কখনো নই। চোখদুটো জলে ভরে এল। সবকিছু এমন কেন? মানুষ তো উকুণ নয়। মানুষের

খুলি উড়িয়ে দেওয়াটা ভয়ঙ্কর জিনিস, মহাপাপ। আর লোকে কিনা মাথা খাটিয়ে বিষাক্ত গ্যাস বের করেছে। আমি বাঁচতে চাই, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ। এ হতচ্ছাড়া অন্ধকার আমার অসহ্য... যাক গে, এভাবে দাঁড়িয়ে আছি কেন বলুন তো?..'

'শুনুন!' আগেকার মতো অদ্ভুত গলায় লস বলল।

ঠিক সে মুহূর্তে দূরে কী একটা ফাটার শব্দে গুমগুম করে উঠল অগণন সুরঙ্গগুলি। দেয়াল আর পায়ের নিচে কার্নিস উঠল কেঁপে। অন্ধকারে পাথর পড়ার শব্দ। গুরু গুরু আওয়াজ তরঙ্গিত হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে। সপ্তম বিস্ফোরণ এটি। তুস্কুব নিজের কথা রেখেছে। বিস্ফোরণের দূরত্ব থেকে আঁচ করা যায় সয়াংসেরা পড়ে আছে দূরে পশ্চিমে।

কিছুক্ষণ ধরে পাথর পড়ার ঝুপঝুপ শব্দ। তারপর চুপচাপ, আরো চুপচাপ। গুসেভই টের পেল প্রথমে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ থেমে গেছে গভীরে। এখন অদ্ভুত নতুন শব্দ উঠছে কুয়োর তলা থেকে—হিসহিসানি আর টগবগানি, যেন পাতলা তরল একটা জিনিস টগবগিয়ে ফুটে উঠছে। অসহ্য লাগল গুসেভের, হাত বাড়িয়ে দেয়াল ধরে সরে যেতে লাগল সে, চেঁচিয়ে, গাল পেড়ে, পাথরে লাথি মেরে।

'কার্নিসটা পাক খেয়ে গেছে। শুনতে পারছেন? বেরোবার রাস্তা আছে নিশ্চয়। উঃ, মাথা ঠুকে গেল!' কিছুক্ষণ চুপচাপ হাতড়ে হাতড়ে ও চলল, তারপর লসের সামনে কোথা থেকে যেন শোনা গেল তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'মস্তিস্লাভ

সের্গেয়েভিচ! একটা হাতল এখানে! একটা সুইচ! কেয়াবাৎ! একটা সুইচ!' লস দেয়ালের কাছে নিসাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনো।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ একটা। নিচু ইটের ছাদের তলায় জ্বলে উঠল ধূসর আলো। খিলান-ছাদের থামগুলো একটা কার্ণিসের সঙ্কীর্ণ কিনারায় দাঁড়িয়ে—তার পরেই, ব্যাসে প্রায় দশ মিটার একটি গোল গহ্বর।

গুসেভ তখনো সুইচের হাতলটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে, আর লস গহ্বরের অন্য দিকের দেয়াল ধরে, গম্বুজের খিলানের নিচে। তীব্র আলো চোখে বিঁধছে বলে হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করেছে সে। তারপর গুসেভ দেখল লস হাত সরিয়ে তাকাল নিচের দিকে, গহ্বরে। চোখ মেলে ঝুঁকে পড়ে দেখল। হাত থরথর করে কেঁপে উঠল, যেন আঙুল থেকে কী একটা ঝেড়ে ফেলতে চায়। মুখ তুলল যখন তখন সাদা চুলের ডগা খাড়া হয়ে গেছে, চোখ বিস্ফারিত, মৃত্যুর মতো আতঙ্কে।

চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল গুসেভ:

'কী দেখেছেন?' আর তখনি নিজে ইটের দেয়াল-দেওয়া গহ্বরটার ভেতরে চোখ মেলে তাকাল। তলায় কালো বাদামি একটা চামড়া পাক খাচ্ছে মুচড়িয়ে। সে চামড়া থেকে উঠছে হিসহিসানি, ক্রমশ ভয়াবহ শোনাতে লাগল বুদ্‌বুদের মতো আওয়াজ। চামড়াটা ফুলে উপরে উঠছে। গোটা চামড়াটায়

ঘোড়ার চোখের মতো ছোপছোপ দাগ আলোয় তীব্র হয়ে উঠেছে, দেখা যাচ্ছে ঝাঁকড়া পা ...

'মৃত্যু!' চেঁচিয়ে উঠল লস।

গুড়িমারা মাকড়সার বিরাট গাদা। গহ্বরের উষ্ণ আবহাওয়ায় বোধহয় ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়েছে। বিস্ফোরণে শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় তারা এখন উঠে আসছে গহ্বরের গা বেয়ে দল বেঁধে, হিসহিসিয়ে, খসখস আওয়াজ তুলে... এই তো একটা গুড়ি মেরে এসে পড়েছে কার্ণিসে।

কার্ণিসের মুখটার বেশ কাছে দাঁড়িয়ে লস। গুসেভ চেঁচিয়ে উঠল:

'পালান!' তারপর বিরাট একটা লাফে গহ্বর পেরিয়ে উবু হয়ে পড়ল, মাথা ঘষে গেল গম্বুজের ছাদে। লসের হাত আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল সুরঙ্গের প্রবেশপথের দিকে। যতো জোরে পারে দৌড়ল দুজনে।

সুরঙ্গের ছাদের নিচে অনেক বাদে বাদে ক্বচিৎ কখনো ধূসর বাতি জ্বলছে। মেঝেতে, থাম আর মূর্তির টুকরোয়, সরু দরজার চৌকাঠে ধুলোর পুরু আস্তরণ। দরজাগুলো অন্যান্য সুরঙ্গে গিয়ে পড়েছে। বারান্দা হয়ে বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর দুজনে এসে পড়ল একটি হল-ঘরে। সমান ছাদ আর নিচু নিচু থাম। মাঝখানে মাংসল, করাল মুখ একটি মেয়ের ভাঙা মূর্তি। মূর্তি ছাড়িয়ে অন্ধকার কয়েকটি কুলুঙ্গি।

সবখানে ধুলো, রাণী মাগ্‌রের মূর্তিতে, বাসনকোষণের ভাঙা টুকরোয়, সর্বত্র।

লস দাঁড়াল, চোখ তার বিস্ফারিত কাঁচের মতো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বলল:

'এ জিনিস কোটি কোটি আছে এখানে। অপেক্ষা করে আছে, কবে সময় এলে মঙ্গলগ্রহ ছেয়ে ফেলে নিজেদের দাপটে আনবে...'

গুসেভ তাকে টেনে নিয়ে গেল হল থেকে সবচেয়ে চওড়া যে সুরঙ্গ বেরিয়ে গেছে সেটাতে। ক্বচিৎ কখনো বাতির টিমটিমে আলো। অনেকক্ষণ যাবার পর চওড়া একটা কূপের উপর খিলান-দেওয়া সাঁকো ছাড়িয়ে গেল তারা। তলায় পড়ে আছে বিরাট সব যন্ত্রের কঙ্কাল। ধূলি ধূসর দেয়াল চলেছে তো চলেছে। হতাশায় দুজনের বুক অবসন্ন। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। কয়েকবার লস নিচু গলায় বলে উঠল:

'ছেড়ে দিন আমাকে, শুয়ে পড়ি।'

হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে যেন। ভয়াবহ যন্ত্রণায় জর্জরিত, লস টলতে টলতে চলেছে গুসেভের পেছন পেছন, ধুলোতে পা দিয়ে। বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘামে মুখ ভরে গেছে। যেখান থেকে ফেরা কখনো সম্ভব নয়, সে মৃত্যুলোক দেখেছে লস, তবু দুর্বার একটি শক্তি সেখান থেকে তাকে সরিয়ে আনছে, তাই ফাঁকা অন্তহীন বারান্দা হয়ে সে চলতে থাকল আধ মরার মতো।

হঠাৎ একটা মোড় খেল সুরঙ্গ। গুসেভ চেঁচিয়ে উঠল। সুরঙ্গের অর্ধবৃত্ত দিয়ে চোখে পড়ল ঝকঝকে গভীর নীল আকাশ আর সেই পাহাড়ের তুষারাবৃত দীপ্ত শিখর, যার কথা মনে আছে লসের। গোলকধাঁধা থেকে দুজনে বেরিয়ে এল তুস্কুবের বাড়ির কাছে।

খাও

কে যেন নিচু গলায় ডাকল, 'আকাশ-সন্তান, আকাশ-সন্তান!'

ঝোপজঙ্গলের দিক থেকে লস ও গুসেভ তুস্কুবের বাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। নীল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে খাড়া নাক ছোট একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে। এ হল আএলিতার সেই ছোকরা-চালক, পরনে ধূসর কোট। হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করে দিল ছোকরা, মুখে এত ভাঁজ পড়ল যেন গন্ডারের মুখ। ডালপালা সরিয়ে ও দেখাল ভাঙা জলাশয়ের মাঝে লুকোনো একটা ডানাওয়ালা নৌকো।

বলল রাত্রিটা কেটেছে নির্ঝঞ্ঝাটে, ভোরের ঠিক আগে দূরের বিস্ফোরণ কানে আসে, দেখে আগুন আর ধোঁয়া। মনে হয় যে আকাশ-সন্তানরা মারা পড়েছে। তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে যায় আএলিতার আস্তানায়। বিস্ফোরণ আএলিতাও শুনেছিল, পাহাড় চূড়া থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল অগ্নিকান্ড। ছোকরাকে বলেছিল, 'বাগানে ফিরে গিয়ে আকাশ-সন্তানদের জন্য

অপেক্ষা করিস। যদি তুস্কুবের লোকে তোকে ধরে তাহলে মুখ বুজে প্রাণ দিস। আকাশ-সন্তান যদি মারা পড়ে তাহলে তার দেহ খুঁজে দেখবি একটা ছোট পাথরের শিশি, সেটা আমার কাছে নিয়ে আসবি।'

দাঁতে দাঁত চেপে ছোকরার কথা শুনল লস। তারপর লস ও গুসেভ হ্রদে গিয়ে দেহের রক্ত আর ধুলো ধুয়ে ফেলল। একটা শক্ত গাছ থেকে গুসেভ একটা লাঠি বানিয়ে নিল, ওপরটা মোটা, নিচের দিকটা সরু, প্রায় ঘোড়ার পায়ের মতো দেখতে। নৌকোয় চেপে উঠল ঝকঝকে নীল আকাশে।

নৌকোটাকে গুহায় টেনে রেখে গুসেভ ও চালক প্রবেশপথের কাছে শুয়ে একটা ম্যাপ খুলে দেখছে, ঠিক সে সময় পাহাড় থেকে তরতর করে নেমে এল ইখা। গুসেভকে দেখে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রেমে গদগদ চোখ থেকে নামল জলের ধারা। গুসেভের মুখে খুশির হাসি।

একা লস নেমে চলল গিরিখাত হয়ে পবিত্র দ্বারদেশে। খাড়া ধাপ বেয়ে, সরু বারান্দা আর ছোট সাঁকো পার হয়ে চলেছে এত জোরে যেন হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আএলিতার কী হবে, কী আছে নিজের কপালে? পালাতে পারবে না মরবে? ভেবে ঠিক করতে পারল না লস। এক একটি চিন্তা মাথায় এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, এক্ষুণি আবার দেখা হবে তার সঙ্গে 'নক্ষত্রের আলোয় জন্ম যার।'

চোখে পড়বে তার সরু নীল মুখ, আপনাকে ভুলে যাবে আনন্দের উচ্ছ্বাসে।

গুহা হ্রদের সাঁকোতে নিচ থেকে বাষ্পের মেঘ উঠছে, তার মধ্য দিয়ে অধীর আগ্রহে যেতে যেতে আগেকার মতো লস দেখল নিচু থামের ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ের পরিপ্রেক্ষিত। সাবধানে গিরিখাতের আলসেতে এসে পড়ল। অস্পষ্ট সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পবিত্র দ্বারদেশ।

হাওয়া গরম, সবকিছু চুপচাপ। কোমল মধুর আবেগে লসের মনে হল চুমু খায় তামার বরণ শেওলায়, প্রেমের এই শেষ আশ্রয়ের পদচিহ্নে।

নিচে খাড়া বেরিয়ে আছে পাহাড়ের রিক্ত কিনারাগুলো। গভীর নীলের গায়ে ঝকঝক করছে বরফ। অন্তরে কী ব্যাকুলতা! এই তো আগুনের ছাই, এই তো সেই পায়ে দলা শেওলা যেখানে আএলিতা উল্লার গান গেয়েছিল। ড্রাগন-পিঠ একটা গিরগিটি পাথরের উপর হিসহিসিয়ে ছুটে কিছু দূর গিয়ে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পাহাড়ের সেই তিনকোণা দরজাটা খুলে নিচু হয়ে গুহায় ঢুকল লস।

সাদা বালিশের মাঝে ঘুমোচ্ছে আএলিতা ছাদ থেকে ঝোলা একটি বাতির আলোয়। মাথার কাছে হাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ছোট সরু মুখ বিষণ্ণ মধুর। নিমীলিত চোখের পাতা কাঁপছে। স্বপ্ন দেখছে নিশ্চয়।

কৌচের মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে লস সুখদুঃখের এই সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে রইল উচ্ছ্বাসে আর উত্তেজনায়। এই প্রিয় মুখে যাতে দুঃখের আঁধার কখনো না নামে, এই সৌন্দর্য, এই ভরা যৌবনের বিনাশ যাতে না ঘটে, কুমারীসুলভ নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যাহত না হয় তার জন্য কতো না অসীম যন্ত্রণা সহ্য করতে সে রাজী! নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আএলিতার গালের উপর পড়া এক গাছি ধূসর চুল উঠছে আর নামছে।

লসের মনে পড়ে গেল তাদের কথা, গোলকধাঁধার অন্ধকারে যারা নিশ্বাস ফেলেছে, খসখস করেছে, হিসহিসিয়ে উঠেছে গভীর গহ্বরে, ওৎ পেতে বসে আছে যারা। ভয়ে আর ব্যাকুলতায় গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জেগে উঠল আএলিতা। মুহূর্তখানেক তাকিয়ে দেখল লসকে অবুঝ চোখে। তারপর অবাক হয়ে ভুরু তুলল উপরে। দু'হাতে বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসল।

স্নিগ্ধ শান্ত স্বরে বলল, 'আকাশ-সন্তান, আমার সন্তান, আমার ভালোবাসার জন...'

নিজের নগ্নতা ঢাকল না আএলিতা, শুধু লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল মুখ। লসের মনে হল তার নীলাভ কাঁধ, সবে কুঁড়ি-ধরা বুক, সরু ঊরু নক্ষত্রের আলো দিয়ে তৈরি। বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে রইল লস, আনন্দের তীব্র উচ্ছ্বাসে নির্বাক হয়ে শুধু চেয়ে রইল প্রিয়তমার দিকে। দেহের তিক্ত-মধুর গন্ধ ঝোড়ো অন্ধকারের মতো আচ্ছন্ন করেছে তাকে।

'স্বপ্নে দেখেছি তোমায়,' আএলিতা বলল। 'তুমি আমাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছ কাঁচের সিঁড়ি বেয়ে উঁচুতে, আরো উঁচুতে। আমার কানে বাজছে তোমার হৃৎস্পন্দন। রক্তের তালে তোমার বুক উঠছে আর নামছে। অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। অপেক্ষা করে আছি কখন তুমি থামবে, কখন অবসাদের অবসান হবে। ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানতে চাই। আমি শুধু জানি অবসাদের গুরু ভয়ংকর বোঝা... তুমি জাগিয়ে দিয়েছ আমায়।' আএলিতা চুপ করল, ভুরুজোড়া উঠে গেল আরো উপরে। 'তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওগো আমার বিরাট মানুষ!'

তাড়াতাড়ি আএলিতা বিছানার ওধারে সরে গেল। ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে, কোণ-ঠেসা জন্তুর মতো যেন আত্মরক্ষা করতে চায়। ভাঙা গলায় লস বলল:

'আমার কাছে এসো।'

মাথা নাড়ল আএলিতা।.

'তোমাকে চা'র মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে।'

লস হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। নিজেকে সামলাবার তীব্র প্রয়াসে হাত কাঁপছে। কিন্তু সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে, অগ্নিশিখা ঘিরেছে তাকে। লস হাত সরাতে শান্ত কণ্ঠে আএলিতা শুধাল:

'কি?'

'ভয় পেও না।'

কাছে সরে এসে আএলিতা আবার ফিসফিস করে বলল:

'খাও-কে ভয় পাই। মারা যাব আমি।'

'ভয় পেও না। খাও — সে তো হল আগুন, সে তো জীবন... খাও-কে ভয় পেও না। কাছে এসো, আমার প্রিয়!'

হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। অস্ফুট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আএলিতা, চোখের পাতা নেমে এল, মুখে একাগ্র টান টান ভাব। তারপর হঠাৎ উঠে ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল।

আঙুলগুলো ডুবে গেছে লসের সাদা চুলে...

গুহার দরজার বাইরে কীসের আওয়াজ, অনেক মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। কিন্তু লস বা আএলিতা শোনেনি সেটা। গুঞ্জন প্রখরতর হয়ে উঠল। গিরিখাত থেকে অতিকায় গুবরে পোকার মতো দেখতে জঙ্গী জাহাজ একটি উঠে এল, পাথরে গলুই ঘষটে।

আলসে বরাবর ঝুলে রয়েছে জাহাজটা। পাশ দিয়ে একটি মই ঝুলিয়ে দেওয়া হল। নেমে এল তুস্কুব ও বর্মাবৃত, লোহার শিক-দেওয়া টুপি-পরা সৈন্যদল।

গুহার সামনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াল তারা। তিনকোণা দরজাটার দিকে এগিয়ে তুস্কুব লাঠির ডগা দিয়ে বাড়ি মারল একটা।

লস ও আএলিতা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সৈন্যদের দিকে ঘুরে তুস্কুব লাঠি দিয়ে গুহামুখ দেখিয়ে আদেশ করল:

'পাকড়াও ওদের।'

পলায়ন

জঙ্গী জাহাজ পবিত্র দ্বারদেশের গিরিচূড়ার উপর কিছুক্ষণ পাক খেয়ে আজোরার দিকে উড়ে গিয়ে কোথায় যেন নামল। শুধু তখনি নিচে আসতে পারল ইখা ও গুসেভ। গুহামুখের কাছে ওরা দেখল রক্তগঙ্গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লস।

তাকে তুলে ধরল গুসেভ — নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে না, চোখ বোজা, বুকে মাথায় চাপ-চাপ রক্ত। আএলিতার কোনো চিহ্ন নেই। আএলিতার জিনিসপত্র জড়ো করতে করতে বিলাপ করতে লাগল ইখা। হুড-দেওয়া কেপটা শুধু পাওয়া গেল না, মৃত বা জীবিত আএলিতাকে নিশ্চয় ওটাতে জড়িয়ে নিয়ে গেছে জাহাজে।

'নক্ষত্রের আলোয় জন্ম যার' তার পড়ে-থাকা বাকি জিনিসগুলো পোঁটলা বেঁধে নিল ইখা। লসকে কাঁধে চাপাল গুসেভ। তারপর তারা চলল ফিরে, সাঁকোগুলোর উপর দিয়ে। নিচে অন্ধকারে জলের শব্দ। চলল অন্ধকার গিরিখাতের ধাপে পা রেখে। এই পথ ধরে এককালে এসেছিল মাগাৎসিৎল, তার সঙ্গে ছিল চরকা আর আওল কুমারীর অ্যাপ্রন — শান্তি ও জীবনের প্রতীক।

উপরের গুহা থেকে নৌকো টেনে বের করে গুসেভ চাদরে মোড়া লসকে বসিয়ে দিল। বেল্ট এঁটে, হেলমেটটা চোখের উপরে টেনে বলল কঠিন সুরে:

'জ্যান্ত আমাকে ধরতে পারবে না। যদি পৃথিবীতে পৌঁছতে পারি... এখানে আবার ফিরব...' (তারপর যে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করল তার মানে বোঝা গেল না।) নৌকোয় উঠে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সজোরে চেপে ধরল। 'আর তোমরা ঘরে বা অন্য কোথাও ফিরে যাও। আমাদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু মনে রেখো না।' ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করে বিদায় নিল চালক ও ইখার কাছ থেকে। 'তোমাকে সঙ্গে নিলাম না, ইখশ্‌কা, জানি না এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পাব কিনা। আমাকে ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। এ সব কথা কখনো ভোলে না আকাশ-সন্তানরা। বিদায়।'

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল একবার, তারপর নৌকো ছেড়ে দিল। উড়ে চলে-যাওয়া আকাশ-সন্তানের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ইখা ও ধূসর কোট-পরা চালক। নজরে পড়ল না যে দক্ষিণ থেকে, চন্দ্রালোকিত পাহাড় থেকে তার পথ রোখার জন্য একটি ডানাওয়ালা ছোপ আকাশে উঠেছে। সূর্যের আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল গুসেভ। তখন শেওলা ভরা পাথরে এমন হতাশায় আছড়ে পড়ল ইখা যে চালক ভয় পেয়ে গেল — বিষণ্ণ তুমা ছেড়ে কি ও-ও চলে গেছে?

'ইখা, ইখা,' ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'খো তুয়া মির্‌রাতুয়া মুর্‌রা...'

তাকে বাধা দেবার জন্য উড়ে-আসা জাহাজটি গুসেভের চোখে পড়েনি প্রথমে। ম্যাপ সঠিকভাবে দেখে, লিজিয়াজিরার

ভেসে-যাওয়া পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে সে পুবে চলেছে ফনিমনসা ক্ষেতের দিকে, যেখানে তাদের যন্ত্র লুকোনো।

পেছন দিকে নৌকোয় হেলে বসানো লসের দেহ। চট্‌চটে চাদরটা ফৎফৎ করে হাওয়ায় উড়ছে। দেহ একেবারে নিস্পন্দ, মনে হয় ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু মৃতদেহের মতো ভয়াবহ অসাড় নয়। শুধু এখনি গুসেভ অনুভব করল লস তার কাছে কতো না প্রিয়।

ব্যাপারটা হয় এই: গুহায় নৌকোর কাছে বসে গুসেভ, ইখশ্‌কা ও চালক একটু হাসি তামাসা করছিল। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হল নিচে। তারপর আর্তনাদ। এক মিনিট পরে গিরিখাত থেকে বাজপাখির মতো উঠে এল জঙ্গী জাহাজ, চত্বরে লসের অসাড় দেহ ফেলে রেখে পাক খেয়ে ঘুরে দেখতে লাগল চারিদিক।

মুখ বাড়িয়ে থুথু ফেলল গুসেভ — মঙ্গলগ্রহে ঘেন্না ধরে গেছে তার। যদি জাহাজে একবার ফিরে গিয়ে লসকে কিছু সুরাসার খাওয়ানো যায়। তার শরীরে হাত রাখল একবার, এখনো গরম। চত্বর থেকে তুলে নেবার পর থেকে মৃত্যুর লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। 'ভগবানের দয়ায় হয়ত জেগে উঠবে।' মঙ্গলগ্রহবাসীদের গুলির দৌড় কতখানি গুসেভের জানা। 'কিন্তু বড্ডো বেশীক্ষণ অজ্ঞান হয়ে রয়েছে যে।' উৎকণ্ঠায় মুখ ফিরিয়ে সে তাকাল অস্তগামী সূর্যের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল শূন্য থেকে নেমে আসছে জঙ্গী জাহাজ।

তৎক্ষণাৎ উত্তরের দিকে ঘুরল গুসেভ, এড়াবার জন্য। জাহাজটাও মোড় নিল সে দিকে। থেকে থেকে গুলির হলদে ধোঁয়ার ঝিলিক। তখন উপরে উঠতে শুরু করল গুসেভ এই ভেবে যে নামার সময় গতিবেগ দ্বিগুণ বাড়িয়ে অনুসরণকারীকে এড়িয়ে যেতে পারবে।

কানে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপট, চোখে জল এসে জমে যাচ্ছে চোখের পাতার উপর। জঘন্য চেহারার এক ঝাঁক ইখি এলোমেলো ডানা ঝাপটে এল নৌকোর দিকে, কিন্তু টিপ ফস্‌কে পড়ে রইল পেছনে। অনেকক্ষণ হল গুসেভের কোনো হুঁস নেই পথের। রগ দপদপ করছে, গায়ে হুল ফোটাচ্ছে ধারালো হাওয়া। তখন সাঁ করে তীরবেগে নিচে নামল গুসেভ। জাহাজটা পিছনে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তের আড়ালে।

নিচে যতদূর চোখ যায় শুধু তামাটে-লাল মরুভূমি। গাছপালা নেই, নেই প্রাণের কোনো লক্ষণ। চেপটা পাহাড়ে, বালুর তরঙ্গে, কাঁচের মতন চকচকে পাথুরে মাটিতে শুধু ভেসে চলেছে নৌকোর ছায়া। কখনো কখনো টিলায় ভাঙা বাড়ির বিষণ্ন ছায়া। চারদিকে মরা খালের ফিতে আঁচড় কেটেছে মরুভূমিতে।

সূর্য হেলে পড়েছে বালুভূমির মসৃণ কিনারায়। সূর্যাস্তের তামাটে বিষণ্ন আলো, কিন্তু তখনো গুসেভের চোখে পড়ছে শুধু বালির ঢেউ, ছোট ছোট পাহাড়, মুমূর্ষু তুমার ভগ্নস্তূপ।

ক্ষিপ্র পায়ে নেমে এল রাত্রি। গুসেভ নামল একটি বালুময় সমভূমিতে। নৌকো থেকে বেরিয়ে লসের মুখের চাদর সরিয়ে চোখের পাতা তুলে ধরল, বুকে কান পেতে শুনল — লস না আছে বেঁচে, না গিয়েছে মরে। ওর কড়ে আঙুলে একটি আংটি, তা থেকে শিকলিতে ঝুলছে একটা খোলা শিশি।

'নিকুচি করেছে মরুভূমির!' নৌকো থেকে সরে যেতে যেতে বলে উঠল গুসেভ। অন্তহীন অন্ধকার মহাশূন্যে হিম তারাগুলো মিটমিট করছে। তারার আলোয় বালি ধূসর মনে হয়। চারদিক এতো নিঝুম যে পায়ের চাপে যে খাঁজ হয়ে যাচ্ছে তাতে সরসর করে বালু সরে যাওয়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়... তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মন। 'নিকুচি করেছে এই মরুভূমির!' নৌকোয় ফিরে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সামনে বসল গুসেভ। কোথায় যাওয়া যায়? উপরের তারার অদ্ভুত নকসা তো তার কাছে অজানা।

মোটর চালাল গুসেভ, কিন্তু প্রপেলার কয়েকবার অলস পাক খেয়ে থেমে গেল। আর কাজ করছে না, বিস্ফোরক পাউডারের কৌটো খালি।

'বেশ,' চাপা গলায় বলে উঠল গুসেভ। নৌকো থেকে আবার নেমে লাঠি পেছনে কোমরে গুঁজে, লসকে টেনে বার করল, 'যাওয়া যাক তাহলে, ম্‌স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ।' তাকে কাঁধে চাপিয়ে চলল। বালিতে পায়ের গাঁট পর্যন্ত বসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ যাবার পর একটি বালিতে ঢাকা সিঁড়িতে পৌঁছিয়ে

তার ধাপে শুইয়ে দিল লসকে। উপর দিকে তাকাতে চোখে পড়ল অনেক উঁচুতে তারার আলোয় উদ্ভাসিত একটি থাম একলা দাঁড়িয়ে আছে। গুসেভ উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ভীষণ অবসাদ ভাঁটার টানে ধ্বনিত হচ্ছে রক্তে।

কতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়ে ছিল গুসেভের খেয়াল নেই। বালিতে শরীর জমে যাচ্ছে, রক্ত হিম। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় উঠে বসে মুখ তুলে চাইল। মরুভূমির বেশী উপরে নয় একটি রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর তারা। বিরাট কোনো পাখির চোখের মতো। তারাটির দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল গুসেভের।

‘পৃথিবী!’ লসকে তুলে নিয়ে গুসেভ ছুটল তারার দিকে। এখন ও জানে তাদের জাহাজ কোথায়।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে, দরবিগলিত দেহে, বড়ো বড়ো লাফে গর্ত পেরিয়ে, প্রচণ্ড ক্রোধে চেঁচিয়ে, পাথরে হোঁচট খেয়ে গুসেভ চলেছে তো চলেছে, কাছের অন্ধকার দিগন্ত সামনে থেকে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। কয়েকবার ঠাণ্ডা বালুতে মুখ গুঁজে রইল গুসেভ, শুকনো ঠোঁটে লাগুক বালির ভাপ। তারপর আবার লসকে তুলে নিয়ে হাঁটা, থেকে থেকে পৃথিবীর লাল আলোর দিকে তাকানো। নিস্তব্ধ শবভূমিতে শুধু চলেছে গুসেভের বিরাট ছায়া।

ওল্লার বাঁকা কাস্তের কিনারা উঠল দিগন্তে। মাঝরাতে দেখা দিল গোল লিখ্‌তা স্নিগ্ধ রূপোলি আলো ছড়িয়ে। বালুর

ঢেউতে প্রসারিত হল দুটি ছায়া; আকাশে ভেসে চলেছে দুটি বিচিত্র চাঁদ—একটি উপরে, অন্যটি নিচে। তাদের আলোয় মিলিয়ে গেল তাল্‌ৎসেৎল। দূরে উদ্যত লিজিয়াজিরার তুষারাবৃত চূড়া।

মরুভূমি শেষ হল। ভোর হয়ে আসছে। ফনিমনসার ক্ষেতে এসে পড়েছে গুসেভ। একটা গাছকে লাথি মেরে ভেঙে রসালো চটচটে ত্বক লোভীর মতন খেল সে। তারাগুলো মিলিয়ে গেছে। বেগুনি আকাশে দেখা দিল গোলাপি পাড় মেঘ। হঠাৎ কানে এল একটা আওয়াজ, সকালের স্তব্ধতায় ধাতু দিয়ে ধাতুর উপরে হাতুড়ির একটানা স্পষ্ট আওয়াজ।

ব্যাপারটা কী ধরতে গুসেভের সময় লাগল না: ফনিমনসার ঝোপে ও দেখতে পেল সেই পিছু-ধাওয়া জঙ্গী জাহাজের তার-আঁটা তিনটি মাস্তুল। শব্দ আসছে সেখান থেকে। মঙ্গলগ্রহবাসীরা ভাঙছে লস ও গুসেভের জাহাজ।

ফনিমনসার আড়ালে দৌড়িয়ে গিয়ে গুসেভ দেখল গ্রহজাহাজের মরচে-ধরা বড়ো পিঠের দিকে গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গলগ্রহবাসীদের জাহাজটা। গোটা বিশেক মঙ্গলগ্রহবাসী গ্রহজাহাজের গজাল-আঁটা আবরণে ঘা মারছে বড়ো বড়ো হাতুড়ি দিয়ে। কাজটা বোধহয় সবে শুরু হয়েছে। লসকে বালির উপর শুইয়ে বেল্ট থেকে লাঠিটা বের করে নিল গুসেভ।

'এই, কুত্তাকা বাচ্চারা!' উচ্চকণ্ঠে হাঁকল গুসেভ।

ফনিমনসার ঝাড় থেকে ছুটে বেরিয়ে জাহাজটার কাছে গিয়ে লাঠির এক ঘায়ে ধাতুর ডানা ভেঙে ফেলে, মাস্তুল ছিঁড়ে পাগলের মতো জাহাজের গায়ে বাড়ি মারতে লাগল। জাহাজের ভিতর থেকে লাফিয়ে সৈন্যরা বেরিয়ে এসে অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মটরদানার মতো ডেক থেকে টুপ টুপ মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। যারা গ্রহজাহাজ ভাঙতে ব্যস্ত ছিল তারা ক্ষীণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে গুড়ি মেরে ঢুকল ঝোপে। এক মুহূর্তে জায়গাটা ফাঁকা। যমের অরুচি এই সর্বশক্তিমান আকাশ-সন্তানের সামনে পড়ে তাদের আতঙ্কের সীমা নেই।

পোর্টহোলের ঢাকনা খুলে লসকে ভিতরে টেনে নিল গুসেভ। আকাশ-সন্তানেরা দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডিমের ভিতরে। দড়াম করে বন্ধ হল পোর্টহোলের ঢাকনা। তখন ফনিমনসার পিছনে লুকোনো মঙ্গলগ্রহবাসীরা দেখল একটি অদ্ভুত অসাধারণ দৃশ্য।

মরচে-ধরা বিরাট ডিমটা গর্জে উঠল, তলা থেকে উঠল বাদামী ধূলো আর ধোঁয়ার মেঘ। ভয়ংকর বিস্ফোরণে থরথর করে কাঁপছে তুমা। কিচকিচিয়ে, গর্জে বিরাট ডিমটা ফনিমনসার ঝোপের উপর উঠল এক ঝটকায়, মুহূর্তখানেক ধূলোর মেঘে থমকে থেকে ধূমকেতুর মতো ছিটকে পড়ল আকাশে। দুর্দান্ত মাগাৎসিৎলরা ফিরে চলেছে নিজেদের দেশে।

বিস্মৃতি

'কী, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, আমরা এখনো জ্যান্ত আছি?'

মুখে গরম কী একটা। লসের সমস্ত শিরায় আর হাড়ে তরল আগুনের স্রোত ছুটল। চোখ মেলে তাকাল সে। উপরে, খুব কাছে, একটি ধূসর তারা দপদপ করে জ্বলছে। হলদে রঙের অদ্ভুত আকাশ, মনে হয় গায়ে তুলো আঁটা। কী একটা যেন ঘা মেরে চলেছে তালে তালে, কাঁপছে ধূসর তারাটি।

'কটা বেজেছে?'

'ঘড়ি তো বন্ধ হয়ে গেছে, আফসোস কি বাত্,' কে যেন জবাব দিল।

'আমরা অনেকক্ষণ উড়ছি?'

'অনেকক্ষণ, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ।'

'কোথায়?'

'শয়তান জানে। কিছু তো ঠাহর করতে পারছি না, শুধু অন্ধকার আর তারা, তারা আর অন্ধকার... মহাশূন্যে ছুটে চলেছি।'

ফের চোখ বুজল লস। মন একেবারে ফাঁকা, চেষ্টা করেও কিছু মনে পড়ল না। আবার অচেতন নিদ্রা আচ্ছন্ন করল তাকে।

তার গায়ে কম্বল গংজে দিয়ে গুসেভ ঘুলঘুলিগুলোর দিকে ফিরল। মঙ্গলগ্রহকে এখন দেখাচ্ছে চায়ের প্লেটের মতো ছোট। শুকনো সমুদ্রগর্ভ আর মরুভূমির চকচকে ছোপ গায়ে। বালুকা-কীর্ণ তুমার চাকতি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে— গ্রহজাহাজ ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে মিশমিশে অন্ধকারে। থেকে থেকে তারার তীক্ষ্ণ আলো গুসেভের চোখে বিঁধছে। কিন্তু যতোই সে দেখুক, সেই লাল নক্ষত্রটি কোথাও নেই।

হাই তুলে জোরে মুখ বুজল গুসেভ। একঘেয়ে শূন্যতায় ক্লান্তি ধরে গেছে। জল, খাবার জিনিস আর অক্সিজেন কতটা আছে দেখে নিয়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল লসের পাশে; মেঝের কাঁপুনির শেষ নেই।

কত সময় কেটে গেল হিসেব নেই। ক্ষিধের চোটে জেগে উঠে গুসেভ দেখল লস তাকিয়ে আছে, মুখটা বুড়োটে বিশীর্ণ, গাল বসে গেছে। অনুচ্চ কণ্ঠে শুধাল লস:

'এখন আমরা কোথায়?'

'সেই শূন্যে, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ।'

'আলেক্সেই ইভানভিচ, আমরা মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলাম?'

'আপনার সবকিছু গুলিয়ে গেছে দেখছি, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ।'

'হ্যাঁ, আমার কী একটা হয়েছে... ভাবছি তো ভাবছি, কিছু

একটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে খাপছাড়াভাবে। কী হয়েছে মনে আনা ভার—সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো। একটু জল দিন তো ...'

চোখ বুজে কিছুক্ষণ পরে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল:

'আর সে — সে-ও কি স্বপ্ন?'

'কার কথা বলছেন?'

জবাব দিল না লস। মাথা হেলে পড়ল, চোখ বুজল সে।

সমস্ত কটা ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দেখতে লাগল গুসেভ— অন্ধকার, নির্নিমেষ অন্ধকার। কম্বলটা কাঁধে টেনে বসে রইল কুঁজো হয়ে। কোনো ইচ্ছে নেই মনে, না ভাবার, না স্মৃতির, না অপেক্ষা করার। কী লাভ? একটানা গোঁ গোঁ শব্দে, নড়ে আর কেঁপে ধাতুর ডিমটা মাথা-ঘোরানো উদ্দাম বেগে চলেছে অন্তহীন মহাশূন্যে।

কেটে গেল অনেক, অনেক সময়, অপার্থিব সময়। কুঁজো হয়ে গুসেভ বসে আছে, মনে কোনো হুঁশ নেই। লস ঘুমোচ্ছে। অনন্ত কালের হিম জমছে অন্তরে, জমছে মনে অদৃশ্য ধূলিকণার মতো।

কর্ণবধির করা একটা আর্তনাদ। বিস্ফারিত চোখে লাফিয়ে উঠল গুসেভ। চেঁচাচ্ছে লস এলোমেলো কম্বলগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। মুখের ব্যাণ্ডেজ ঝুলে পড়েছে।

'ও বেঁচে আছে!'

হাড় বের-করা হাত তুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল চামড়া-আঁটা দেয়ালে, ঘা মারতে লাগল তাতে, আঁচড়াতে লাগল।

‘বেঁচে আছে ও! আমাকে ছেড়ে দিন ... দম বন্ধ হয়ে আসছে... হ্যাঁ, ও ছিল, ও ছিল!..’

অনেকক্ষণ হাতপা ছুঁড়ে চেঁচাল লস। তারপর অসাড় দেহে এলিয়ে পড়ল গুসেভের হাতে। আবার শান্ত হয়ে ঝিমোতে লাগল।

কম্বলে আবার গুটিসুটি হয়ে বসে রইল গুসেভ। সব ইচ্ছা অঙ্গারের মতো নিভে গেছে। কোনো বোধ নেই মনে। গ্রহজাহাজের ধাতব স্পন্দনে অভ্যস্ত কানে আর কোনো আওয়াজ প্রবেশ করছে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়বিড় করছে লস, কাতরাচ্ছে, মাঝে মাঝে সুখের হাসিতে আলো হয়ে উঠছে মুখ।

নিদ্রিত লসের দিকে তাকিয়ে গুসেভ ভাবল:

‘ঘুমিয়ে পার পেয়ে গেছ, বন্ধু। জাগার দরকার নেই, ঘুমোও, ঘুমোও শুধু ... জেগে উঠলে আমার মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকতে হবে কম্বলের নিচে, বরফ-জমা গাছের গুঁড়িতে ঠকঠক করে কাঁপা দাঁড়কাকের মতো। রাত্রির পার নেই। এই কী শেষ তাহলে?..’

এমন কি চোখ বোজার ইচ্ছে পর্যন্ত গুসেভের রইল না। বসে বসে চেয়ে রইল ঝকঝকে একটা পেরেকের দিকে ... অসীম ঔদাসীন্যের ভারে বিস্মৃতির অতলে সে তলিয়ে গেল...

এ ভাবে কাটল অনেক সময়, শূন্য পথের অসীম সময়।

হঠাৎ শোনা গেল একটি অদ্ভুত শব্দ। কী একটা জিনিস গ্রহজাহাজের লোহার গায়ে ঘা দিচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে।

চোখ খুলে তাকাল গুসেভ। চেতনা ফিরে এসেছে। কান পেতে শুনতে লাগল। মনে হল গ্রহজাহাজ চলেছে নুড়িপাথর আর ইটপাটকেলের গাদা ঠেলে। জাহাজের গায়ে কী একটা পড়ে পিছলে নামল। সরসর, খরখর আওয়াজ। অন্য দিকেও কী একটা যেন লাগল, কেঁপে উঠল গ্রহজাহাজ। লসকে জাগিয়ে দিল গুসেভ। দুজনে গুড়ি মেরে গেল ঘুলঘুলিগুলোতে; থ হয়ে গেল দুজনে।

অন্ধকারে চারিদিকে টুকরো টুকরো জিনিসের ভিড়, হীরের মতন ঝকঝকে সেগুলো। প্রকাণ্ড নুড়ি পাথর, স্ফটিকের প্রান্তদেশ তীক্ষ্ম আলোর দীর্ঘ রেখায় ঝলকাচ্ছে। হীরকক্ষেত্র ছাড়িয়ে অন্ধকার রাত্রে অনেক দূরে ভাসছে ঝাঁকড়া সূর্য।

'আমরা নিশ্চয় কোনো ধূমকেতুর মাথার মধ্য দিয়ে চলেছি,' ফিসফিসিয়ে বলে উঠল লস। 'রিওস্টাটটা টানুন। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে ধূমকেতু আমাদের টেনে নিয়ে যাবে সূর্যের দিকে।'

গুসেভ উপরের ঘুলঘুলিতে উঠে গেল। লস দাঁড়িয়ে রইল রিওস্টাটের কাছে। গ্রহজাহাজের গায়ে সেই আঘাত আর আঁচড় ক্রমশ বেড়ে গিয়ে জোরালো হয়ে উঠল। উপর থেকে হেঁকে বলল গুসেভ:

'আস্তে, ডাইনে একটা পাহাড়... এবার যত জোরে পারেন চালান... পাহাড়... পাহাড়টা এগিয়ে আসছে... যাক্, পেরিয়ে গেছি... চালান, ম্স্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ, জোরসে চালান!'

পৃথিবী

হীরের মতো টুকরো ছড়ানো জায়গাটা হল মহাশূন্যে ধাবমান একটি ধূমকেতুর পদচিহ্ন। ধূমকেতুর আকর্ষণে পড়ে গ্রহজাহাজ অনেকক্ষণ ধরে চলল তার উল্কামেঘের ভিতর দিয়ে। গতিবেগ অবিরত বেড়ে যাচ্ছে; গণিতের আইন তো অমোঘ — ক্রমশ গ্রহজাহাজ আর উল্কাপিণ্ডগুলির যাত্রাপথের রদবদল হল — দুটোর মধ্যের কোণাকুণি পার্থক্য বেড়ে চলল। অজানা ধূমকেতুর মাথার দিকের ঝাপসা সোনালি অন্ধকার আর লেজের দিকের উল্কাপিণ্ডগুলি ছুটে চলেছে পরাবৃত্তে, নিস্ফল বক্রগতিতে, যাতে সূর্যকে পাক খেয়ে মহাশূন্যে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। গ্রহজাহাজের যাত্রাপথের বাঁক এবার উপবৃত্তের মতো।

পৃথিবীতে ফিরে যাবার বন্য আশা লস ও গুসেভের জীবনীশক্তি জাগিয়ে তুলেছে। ঘুলঘুলি থেকে চোখ না সরিয়ে দুজনে চেয়ে আছে আকাশ পানে। গ্রহজাহাজের একটি দিক সূর্যের তাপে দারুণ তেতে উঠল। কাপড়চোপড় খুলে ফেলল দুজন।

হীরের ক্ষেত্রগুলো এখন অনেক, অনেক নিচে—স্ফুলিঙ্গের মতো দেখতে; তারপর ধূসর-ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর দেখা দিল দূরে উপলমণির মতো শনিগ্রহ, পারিষদ পরিবেষ্টিত।

ধূমকেতুর টান-খাওয়া গ্রহজাহাজ ফিরে আসছে সৌর জগতে।

কিছুক্ষণ পরে জ্বলন্ত একটি রেখা অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে, তারপর ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল। সেটা হল গ্রহাণুপুঞ্জ, সূর্যের চারিপাশে পাক খাওয়া ছোট ছোট উপগ্রহ। গ্রহজাহাজের গতি বাঁক বেড়ে গেল তাদের টানে। উপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে তখন লসের চোখে পড়ল অদ্ভুত, সরু ঝকঝকে একটি কাস্তে: শুক্রগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, অন্য ঘুলঘুলি থেকে ঘর্মাক্ত লাল মুখ ফিরিয়ে গুসেভ বলে উঠল রুদ্ধ শ্বাসে:

'দেখুন, দেখুন, এ হল!..'

ঘুটঘুটে অন্ধকারে রুপোলি-নীল একটা গোলকের কবোষ্ণ দীপ্তি। একপাশে আরো ছোট একটা গোলক, মনক্কার চেয়ে বড়ো নয় আকারে, আরো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। দুটি গোলক থেকে একটু পাশে গ্রহজাহাজের পথ। তখন একটি বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করল লস—গ্রহজাহাজের মুখটা ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে বিস্ফোরণের অংক গতিবেগের বিক্ষেপ মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়। কাজ দিল সেটা। গতিপথ গেল বদলে। উষ্ণ ছোট গোলকটি ক্রমশ উঠে গেল মধ্যাকাশে।

স্থান ও কাল ভেসে চলেছে তো চলেছে। লস ও গুসেভ ঘুলঘুলিগুলোতে যেন লেপটে আছে, কখনো বা টলে পড়ে যাচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পশমের কম্বলে আর চাদরে। শরীরে শক্তি নেই আর। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক ফোঁটা জল নেই।

হঠাৎ আধো অচৈতন্যের ঘোরে লস দেখল পশম, কম্বল আর থলেগুলো ভেসে চলেছে দেয়ালের গায়ে। শূন্যে ঝুলে আছে গুসেভের অর্ধ-নগ্ন দেহ। গোটা ব্যাপারটা প্রলাপের মতো। ঘুলঘুলির কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল গুসেভ। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে, বুক চেপে ধরে, কোঁকড়া চুলওয়ালা মাথা নাড়াতে নাড়াতে দাঁড়িয়ে উঠল সে। মুখ বেয়ে নামল জলের ধারা, ঝুলে পড়ল গোঁফ জোড়া।

'পৃথিবী, আমাদের আপন পৃথিবী!'

চেতনার অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করে উপলব্ধি হল লসের যে পৃথিবীর টানে মুখ নামিয়ে চলেছে গ্রহজাহাজ। রিওস্টাটের কাছে গিয়ে টান দিল জোরে— কেঁপে গর্জে উঠল গ্রহজাহাজ। একটা ঘুলঘুলিতে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে দেখল লস।

অন্ধকারে ঝুলে রয়েছে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সজল বিরাট গোলকটি। সাগর সমুদ্র নীল, দ্বীপের রেখাগুলি সবুজ। কী একটা মহাদেশের উপরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে আর্দ্র গোলকটি। চোখের জলের দরুন কিছু ভালো করে দেখা ভার। অনুরাগে কেঁদে উঠে হৃদয় ছুটে চলেছে সেই

নীলাভ আর্দ্র আলোর রেখাটির সঙ্গে মিলবার জন্য। মানুষের সেই জন্মভূমি! মূর্তিমান জীবন! বিশ্বের হৃৎপিণ্ড!

পৃথিবীর গোলকে ঢাকা পড়েছে অর্ধেক আকাশ। রিওস্টাট যতখানি পারা যায় ততখানি টানল লস। তবু তো অতি বেগে চলেছে গ্রহজাহাজ, তপ্ত হয়ে উঠেছে আবরণ, ভিতরের রবার আস্তরণ আর চামড়ার দেয়াল যেন আগুনে ধিকিধিকি করছে। শরীরের শেষ শক্তি খাটিয়ে গুসেভ পোর্টহোলের ঢাকনাটা ঘুরিয়ে দিল। ফাঁক দিয়ে এল এক ঝলক ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। হাত বাড়িয়ে পৃথিবী আবার নিজের বুকে গ্রহণ করল পলাতক সন্তানদুটিকে।

বিরাট একটা ধাক্কা। চিড় খেয়ে গেল গ্রহজাহাজের আবরণ। গলা বাড়িয়ে জাহাজটি বোঁ করে পড়ল একটি ঘাসে ঢাকা ঢিবিতে।

তখন দুপুর বেলা। রবিবার, ৩রা জুন। গ্রহজাহাজটি যেখানে পড়ে সেখান থেকে অনেক দূরে মিচিগান হ্রদের তীরে বেশ ভিড়। লোকে নৌকোয় চেপে বেড়াচ্ছে, খোলামেলা রেস্তরাঁ ও কাফের বারান্দায় বসে আছে, কেউ বা টেনিস খেলছে, কেউ বা গল্‌ফ্ বা ফুটবল, কেউ বা নির্মেঘ আকাশে ঘুঁড়ি ওড়াচ্ছে। জুনের মর্মরিত পত্রপুঞ্জের মধ্যে, হ্রদের মধুর সবুজ তীরে রবিবারের ছুটি কাটাতে আসা ভিড়ের সবাইকার কানে এল

অদ্ভুত গোঁ গোঁ একটা গুনগুনানি। পুরো পাঁচ মিনিট ধরে চলল সে আওয়াজ।

মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা যাদের তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল এতো হুবহু ভারি শেল পড়ার আওয়াজ। তারপর অনেকে দেখল ডিমের মতো একটা ছায়া ক্ষিপ্র গতিতে ভেসে চলে গেল মাটির উপর দিয়ে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মাটিতে পড়া গ্রহজাহাজের চারপাশে বেজায় ভিড় জমে গেল। কৌতূহলীরা এল দলে দলে সব দিক থেকে, বেড়া ডিঙিয়ে, মোটরে চেপে, নীলাভ হ্রদের বুকে নৌকো বেয়ে। কালিঝুলমাখা, টোল-পড়া, চিড়-ধরা ডিমটা ঢিবির উপর একপাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে। জল্পনা কল্পনার শেষ নেই, একটা অন্যটার চেয়ে বিদকুটে। পোর্টহোলের আধ-খোলা ঢাকনায় চিজ্‌ল্‌ দিয়ে কাটা: 'র.স.ফ.স.র। পেত্রগ্রাদ থেকে যাত্রা ১৮ই অগস্ট, ১৯২...' এটা পড়ে লোকের উত্তেজনা চরমে উঠল। অবাক কাণ্ড বটে! আজকে তো ৩রা জুন, ১৯... এক কথায়, তাহলে লেখাটা হয় সাড়ে তিন বছর আগে।

রহস্যময় যন্ত্রটির ভিতরে অস্ফুট গোঙানির শব্দ। সবাই ভয়ে পিছিয়ে চুপ করে গেল। এল একদল পুলিস, একটি ডাক্তার আর ক্যামেরা হাতে বারো জন সাংবাদিক। ঢাকনা তুলে অত্যন্ত সাবধানে যন্ত্রটির ভিতর থেকে তারা দুটি অর্ধ-নগ্ন লোককে বের করল। এক জন বুড়ো, কঙ্কালের মতো শীর্ণ, মাথার চুল পাকা, জ্ঞানহীন। অন্যটির মুখ রক্তাপ্লুত, হাত

ভাঙা, কাতরাচ্ছে করুণভাবে। সহানুভূতির গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে, মেয়েরা কাঁদতে লাগল। আকাশলোকের যাত্রীদের মোটরে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

খোলা জানলার বাইরে একটি পাখি গাইছে আনন্দের স্ফটিক ধারায়। সূর্যালোক ও নীল আকাশের গান তার কণ্ঠে। বালিশে নিশ্চল শুয়ে কান পেতে শুনছে লস। বিশীর্ণ মুখে নেমেছে জলের ধারা। কোথায় যেন একবার শুনেছিল এই স্ফটিক কণ্ঠ। কিন্তু কোথায়, কবে?

জানলার পর্দা সকালের হাওয়ায় অল্প দুলছে। ঘাসে ঝকঝকে শিশির বিন্দু। পর্দায় ভিজে পাতার ছায়ার খেলা। পাখিটা গেয়ে চলেছে। দূরে বনের উপরে উঠছে সাদা মেঘ।

কার হৃদয় যেন ব্যাকুল হয়েছে এই পৃথিবীর জন্য, এই মেঘ, এই মর্মরিত বৃষ্টি আর ঝকঝকে শিশির বিন্দুর জন্য, নীল পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো বিরাট মানুষের জন্য... মনে পড়ে গেল, ঠিক এভাবে রোদে-ভরা সকালে একটি পাখি গেয়েছিল আএলিতার স্বপ্নের কথা। এখানে নয়, অন্য লোকে। ... আএলিতা ... সে কি ছিল সত্যি না শুধু দিবাস্বপ্ন সে? না, কাঁচের মতন স্বচ্ছ গলায় আজকের পাখিটি বলে চলেছে যে, একদিন গোধূলির মতো গভীর নীল একটি মেয়ে, সরু বিষণ্ণ

যার মুখ রাত্রে আগুনের পাশে বসে গেয়েছিল প্রেমের প্রাচীন গান।

তাই আজ লসের বিশীর্ণ গালে নেমেছে অশ্রু ধারা। পাখি গাইছে সে জনের কথা যে রয়ে গেছে নক্ষত্রগুলির ওপারে আর গাইছে সেই পাকাচুল বিশীর্ণ বৃদ্ধ স্বপ্নবিলাসীর কথা যে পাড়ি দিয়েছিল আকাশে।

জানলার পর্দা হাওয়ায় আরো বেশি কেঁপে উঠল, পর্দার নিচের প্রান্তদেশটা নরমভাবে দুলে উঠল। ঘরে মধু, মাটি আর আর্দ্রতার গন্ধ।

হাসপাতালে একদিন সকালে স্কাইল্‌স্‌ এসে হাজির। লসের হাত সজোরে নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বিছানার ধারে একটা টুলে বসে পড়ে টুপিটা মাথার পিছনে হেলিয়ে দিল।

'যাত্রাটা বেশ আরামের হয়নি, কী বলুন মশাই?' স্কাইল্‌স্‌ বলল। 'এইমাত্র গুসেভের কাছে গিয়েছিলাম, বাহাদুর লোক বটে! হাতে ব্যাণ্ডেজ, চোয়াল ভাঙা, তবু মুখে হাসি লেগে আছে সব সময়। ফিরে এসেছে বলে মহা খুশি। পেত্রগ্রাদে ওর স্ত্রীকে একটা টেলিগ্রাম আর পাঁচ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার কথাও টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছি আমার কাগজে। আপনার "ভ্রমণ পঞ্জিকার" জন্য মোটা টাকা পাবেন। কিন্তু মশাই, যন্ত্রটা আরো ভালো করা উচিত

আপনার, নামার ধরনটা বড্ডো খারাপ। যাক গে। পেত্রগ্রাদে সেই পাগল সন্ধ্যেটার পর প্রায় চার বছর কেটে গেছে, ভাবলে অবাক লাগে! কথা শুনুন, এক গেলাস ব্র্যান্ডি খেয়ে নিন, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন তাহলে।'

রোগীর দিকে সানন্দে ও দরদ-ভরে চেয়ে বকবক করে চলল স্কাইল্‌স্‌। রোদে-পোড়া মুখে বেশ সদয় ভাব, অসম্ভব কৌতূহল উপচে পড়ছে চোখে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে লস বলল :

'আপনি আসাতে খুশি হয়েছি, স্কাইল্‌স্‌।'

প্রেমের ডাক

জ্‌দানভ্‌স্কায়া বাঁধের উপর তুষার মেঘ উড়ে চলেছে, হাওয়ার টানে মাটিতে নেমে আসছে, দুলন্ত বাতিগুলোকে ঘিরে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রবেশপথ ও জানলাগুলো বরফে ঢাকা, নদীর ওপারে পার্কে তুষার ঝড়ের হুঙ্কার আর আর্তনাদ।

হাওয়ায় কলার তুলে বাঁধ হয়ে চলেছে লস। গরম স্কার্ফ পেছনে ফৎফৎ করছে, পা যাচ্ছে টলে, বরফ-কণা বিঁধছে মুখে। রোজকার মতো লস কারখানা থেকে ফিরছে তার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে। চওড়া কানাত টুপি মাথায়, মুখের নিচে বাঁধা স্কার্ফ,

কুঁজো কাঁধ এই লোকটি খুব চেনা পাড়ার মানুষের কাছে, যখন ও এমন কি নমস্কার জানায় আর হাওয়ায় তার পাকা চুল ওড়ে তখনো কেউ আর বিস্মিত হয় না তার চোখের অদ্ভুত দৃষ্টিতে, যে চোখ একদা এমন কিছু দেখেছিল যা অন্য লোকে কখনো দেখেনি।

তুষার-ঝড় ভেদ করে চলেছে লোকটি, হাওয়ায় উড়ছে স্কার্ফ — অন্য সময় হয়ত কোনো নবীন কবিকে প্রেরণা জোগাত এই অদ্ভুত মূর্তি। কিন্তু দিনকাল তো বদলে গেছে: কবিদের এখন প্রেরণা জোগায় তুষার-ঝড় নয়, তারা নয়, মেঘলোক নয় — প্রেরণা জোগায় দেশ জোড়া হাতুড়ির শব্দ, করাতের খসখস, কাস্তের হিস্‌হিস্‌, সেগুলো হল পৃথিবীর আনন্দ গান।

পৃথিবীতে লস ফিরে আসার পর ছ মাস কেটে গেছে। মঙ্গলগ্রহে দুটি মানুষের সফল যাত্রার প্রথম সংবাদ টেলিগ্রামে পেয়ে সারা পৃথিবীতে যে চাঞ্চল্য এসেছিল তার উপশম হয়েছে। লস ও গুসেভ ইতিমধ্যে প্রায় শ'দেড়েক ভোজসভায়, সাপারে ও বিজ্ঞানী সম্মেলনে যথোচিত খানাপিনা করেছে। গুসেভ পেত্রগ্রাদ থেকে মাশাকে আনিয়ে পটের বিবির মতো সাজিয়েছে, ইণ্টারভিয়ু দিয়েছে প্রায় শ'খানেক, মোটর সাইকেল কিনেছে একটা, চোখে চাপিয়েছে গগল্‌স্‌, ইউরোপ ও আমেরিকায় সফরে গিয়ে ছ মাস গল্প করেছে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সঙ্গে নিজের লড়াই-এর, গল্প করেছে মাকড়সার ও ধূমকেতুর,

গল্প করেছে কেমন করে লস ও সে নিজে আর একটু হলে সপ্তর্ষিতে গিয়ে পড়ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাবর্তনের পর 'মঙ্গলগ্রহে এখনো টিকে আছে যারা সেই মেহনতী মানুষদের সাহায্যার্থে ফৌজি বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ সমিতি' স্থাপন করেছে সে।

পেত্রগ্রাদের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় লস মঙ্গলগ্রহের ধাঁচের একটা পাঁচমিশেলী মোটর বানাচ্ছে।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে একলা খেয়ে নিয়ে শোবার আগে একটা বই হাতে নিয়ে বসত সে। কিন্তু কবির কথা আর উপন্যাস-লিখিয়ের আকাশ পাতাল সব কল্পনা তার কাছে ঠেকত শিশুর বকবকানির মতো। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত অন্ধকারে চোখ মেলে — মাথায় ঘুরপাক খেত নিঃসঙ্গ কয়েকটি চিন্তা শুধু।

আজ অন্য দিনকার মত্নে বাঁধ হয়ে চলেছে সে। বরফের রাশি ঝটকায় ঝটকায় অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে উদ্দাম তুষার-ঝড়ে। কার্ণিস আর ছাদ বেয়ে বরফ ঝরছে। রাস্তার বাতিগুলো দুলছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

থেমে পড়ে মুখ তুলে তাকাল লস। হাওয়ায় ঝোড়ো মেঘ ছিন্নভিন্ন। অন্ধকার অতল আকাশে একটি মিটমিটে তারা। অন্ধ আবেগে তারাটির দিকে চেয়ে রইল লস — তার আলোয় দীর্ণ হল অন্তর... 'তুমা, বিষাদের নক্ষত্র তুমা...' উড়ো মেঘের

কিনারায় আবার ঢেকে গেল অন্ধকার গহ্বর, তারাটি আর চোখে পড়ে না। এই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে লসের মনে একটি ছবি ভয়াবহ স্বচ্ছতায় ঝলক খেয়ে গেল; এতদিন সে ছবির নাগাল পেয়েও পায়নি সে...

. . . .

ঘুমের মধ্যে কীসের আওয়াজ, যেন মৌমাছির ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। তারপর দরজায় ঠকঠকানি। ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল আএলিতা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জেগে উঠে কেঁপে উঠল থরথর করে। গুহার অন্ধকারে তাকে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায় তার হৃৎস্পন্দন। আবার দরজায় ঠকঠকানি। শোনা গেল তুস্কুবের কণ্ঠস্বর, 'ওদের পাকড়াও।' আএলিতাকে জড়িয়ে ধরল লস। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় আএলিতা বলল:

'আমার স্বামী! বিদায়, আকাশ-সন্তান!'

লসের মুখে একবার দ্রুত আঙুল বুলোল সে। তখন লস হাতড়ে তার হাত ধরে বিষের শিশিটা নিয়ে নিল। আএলিতা কানে কানে এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল:

'এ সব আমার মানা ছিল, আমি রাণী মাগ্‌রের কাছে উৎসর্গীকৃতা... মাগ্‌রের ভয়ংকর নিয়মানুযায়ী, প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সেবার নিয়ম যে কুমারী ভঙ্গ করে তাকে ফেলে দেওয়া হয় গোলকধাঁধার কুয়োয়। কুয়োটা তুমি তো দেখেছ... কিন্তু আকাশ-সন্তানের প্রেম রুখতে আমি পারিনি। আমি সুখী। আমাকে জীবন দিয়েছ, ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি

আমাকে নিয়ে গেছ খাও-এর কালে। ধন্যবাদ তোমাকে, স্বামী আমার ...’

তাকে চুম্বন করল আএলিতা। ঠোঁটে তার বিষের ঝাঁঝ। তখন লস কালো তরল বিষের বাকিটুকু খেয়ে ফেলল — শিশিতে তখনো অনেকটা ছিল, সবেমাত্র তাতে মুখ ঠেকিয়েছিল আএলিতা। দরজায় ঠকঠকানিতে লস উঠে দাঁড়াল, কিন্তু চেতনা ঝাপসা হয়ে গেছে, হাত পা চলছে না আর। বিছানায় ফিরে এসে পড়ে গেল আএলিতার উপর, জড়িয়ে ধরল তাকে। গুহায় সৈন্যরা যখন ঢুকল তখন নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই তার। আএলিতাকে ছিনিয়ে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে চলল। শরীরের শেষ শক্তি খাটিয়ে লস টলতে টলতে চলল তার কালো কেপের পাড়ের পিছনে; গুলির স্ফুলিঙ্গ, বুকে কীসের একটা ঘা। টলতে টলতে লস গিয়ে পড়ল গুহার ছোট সোনালি দোরের কাছে ...

. . . .

হাওয়ায় কুঁজো হয়ে বাঁধ বরাবর তাড়াতাড়ি চলেছে লস। বরফের ঘূর্ণিমেঘে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার অন্ধকার অনন্ত শূন্যে সেবারকার মতো চেঁচিয়ে উঠল:

‘ও বেঁচে আছে, বেঁচে আছে ও ... আএলিতা, আএলিতা ...’

পৃথিবীতে এই প্রথম উচ্চারিত নামটি এক ঝটকায় পাগলের মতো কুড়িয়ে নিয়ে হাওয়া ছড়িয়ে দিল ঘূর্ণিপাক খাওয়া তুষার-কণার মধ্যে। স্কার্ফে মুখ গুঁজে, পকেটে হাত

অনেকখানি ঢুকিয়ে হোঁচট খেতে খেতে লস চলল বাড়িমুখো।

প্রবেশপথের কাছে একটি মোটর গাড়ি। হেডলাইটের অস্পষ্ট আলোর রেখায় সাদা মাছির মতো বরফ-কণার সঞ্চরণ। ঝাঁকড়া পশমের কোট গায়ে একটি লোক কনকনে বুট ঠুকছে ফুটপাথে।

'আপনাকে নিতে এসেছি, মস্তিস্লাভ সের্গেয়েভিচ,' ফূর্তিমাখা গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটি। 'গাড়িতে ঢুকুন, যাওয়া যাক।'

লোকটি গুসেভ। তাড়াতাড়ি ও বুঝিয়ে বলল, রেডিও-টেলিফোন কেন্দ্রের লোকেরা আশা করছে আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় অত্যন্ত শক্তিশালী অজানা কোনো সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধরা পড়বে। গোটা সপ্তাহ ধরে আশা করে আছে তারা। সঙ্কেত ধ্বনির মানে এখনো বোঝা যায়নি। পুরো এক সপ্তাহ ধরে পৃথিবীর সব কাগজপত্রে এর অর্থ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলেছে—এমন কথা উঠেছে যে সঙ্কেত ধ্বনিগুলো আসছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। আজ সন্ধ্যায় হেঁয়ালি-ধ্বনি শোনার জন্য লসকে নিমন্ত্রণ করেছে বেতার কেন্দ্রটি।

কোনো কথা না বলে গাড়িতে চাপল লস। আলোর রেখায় পাগলের মতো নেচে চলেছে তুষার-কণা। মুখে কনকনে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপট। নেভা নদীর জমাট রিক্ত বুকে পড়েছে সহরের

বেগুনে আলো, বাঁধের উপরকার ঝকঝকে আলো — আলো, শুধু আলো... দূরে কোথায় একটা বরফ-ভাঙা জাহাজের কর্কশ ধ্বনি।

গাড়ি থামল ক্রাস্নিয়ে জরি স্ট্রীটের শেষে বরফ-ঢাকা জমিখণ্ডে হিসহিসানো গাছের নিচে একটি গোল-ছাদ ছোট বাড়ির সামনে। তুষার-ঝড়ে উদ্যত শিক-দেওয়া গম্বুজ আর তারের জালে হাওয়ার অর্তনাদ। বরফ-জমাট দরজা খুলে ছোট গরম বাড়িটাতে ঢুকে লস টুপি আর স্কার্ফ খুলে ফেলল। গোলগাল গোলাপি মুখ একটি লোক গরম ফুলো হাতে তার ঠাণ্ডা হাত চেপে কী যেন একটা বোঝাতে শুরু করেছে। ঘড়ির কাঁটা চলেছে সাতটার দিকে।

বেতারের কাছে বসে পড়ে লস ইয়ার-ফোনদুটো পরে নিল। ঘড়ির কাঁটা চলেছে মন্থরগতিতে। হায় মহাকাল, হায়রে বুকের অস্থির স্পন্দন, হায়রে মহাশূন্যের অসীম হিম মরুভূমি!..

কানে এল মন্থর ফিসফিসানি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল লস। আবার ভেসে এল সুদূর, ব্যাকুল, বিলম্বিত সেই ফিসফিসানি। অদ্ভুত একটি শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে বারবার। কান পেতে রইল লস। স্থির বিদ্যুতের মতো লসের বক্ষ চিড়ে সেই সুদূর কণ্ঠস্বর অপার্থিব বিষণ্ণ সুরে বলে চলেছে:

‘কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, আকাশ-সন্তান?’

স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। বিস্ফারিত পাণ্ডুর মুখে সামনে তাকিয়ে রইল লস ... আএলিতার কণ্ঠস্বর, প্রেম আর মহাকালের কণ্ঠস্বর, ব্যাকুল বিরহের কণ্ঠস্বর মহাশূন্য পার হয়ে এসেছে তার কাছে, ডাকছে তাকে, অনুনয় করছে, মিনতি করে বলছে, 'কোথায় তুমি, তুমি কোথায়, প্রিয়তম ...'

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

২১, জুবভ্স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union